উপনিষদে বিপরীতের দ্বন্দ্ব

রাসবিহারী দত্ত

ক্যালকাটা স্কুল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ
কলিকাতা

প্রাক্‌কথন

আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মাঝে এমন কি বিদগ্ধ সমাজের কোন কোন অংশে ও প্রচলিত একটা ধারণা আছে যে ভারতবর্ষ বেদ-বেদান্তের দেশ—এখানে জড়বাদ কিংবা বস্তুবাদের কোন স্থান নেই। মৌলবাদীরা আবার এই প্রচলিত ধারণাকে ইদানিংকালে একটা যৌক্তিক আকার দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। নিঃসন্দেহে বেদ প্রাচীন ভারতীয় মণীষার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। উপনিষদ বেদের অন্তভাগ এবং দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ সেখানে কথোপকথন বা প্রাচীন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে মীমাংসার জন্য উত্থাপিত। ব্রহ্মবাদীরা এতাবৎকাল দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ব্রহ্মন ও আত্মা পরকালই যেন উপনিষদের আলোচ্য বিষয়, যেন সমস্ত উপনিষদে ভাববাদকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অধ্যাপক কোশাম্বী, আচার্য দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যাকাররা তাঁদের অক্লান্ত ও অমূল্য গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ভাববাদই একমাত্র মতবাদ ছিল না, বস্তুবাদও বিরোধী ধারা হিসেবে অত্যন্ত জোরালো ভাবেই উপস্থিত ছিল। তাঁরা দেখিয়েছেন যে প্রাচীন গ্রীসে যেভাবে ভাববাদী দর্শনের পূর্বেই বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছিল এখানে ভারতবর্ষে ও বস্তুবাদী দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল ভাববাদী দর্শনের পূর্বে। বস্তুতপক্ষে সমাজে কায়িকশ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাজন ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের বিভাজনের ভিত্তি এ কথা স্বীকার করলে প্রাচীন সভ্যতার প্রথমেই যে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব তা সার্বিকভাবে স্বীকার করতে হয়।

উপনিষদমাত্রই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, এ রকম একটা অভিমত ও প্রচলিত আছে। উপনিষদের লক্ষ্য যেন শুধুমাত্র ব্রহ্মের অদ্বৈত, আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি তত্ত্ব প্রমাণ করা। অর্থাৎ ভাববাদী দর্শনের রূপরেখা তৈরী করা। অধ্যাপক রাসবিহারী দত্ত উপনিষদে বিপরীতের দ্বন্দ্ব পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে উপনিষদমাত্রেরই পরিণতি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় শেষ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদ ও ভাববাদ পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করেছে। এর ফলে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের আলোচনা আরো সমৃদ্ধ ও পূর্ণতর হল।

ক্যালকাটা স্কুল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি।

মুখবন্ধ

আজ থেকে অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের মাটিতে সৃষ্টি হয়েছিল এক অমূল্য সাহিত্যের যার নাম উপনিষদ। সেই সুপ্রাচীন কালে যখন বিশ্বের অনেক দেশেই সভ্যতার আলো ফুটে উঠেনি তখন এই ভারতভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল প্রজ্ঞাশীল মননের আলোকচ্ছটায়। সুদূর অতীতের চিন্তাবিদ ঋষিরা তাদের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের অবিস্মরণীয় বিবরণী রেখে গেছেন এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে। এর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রত্যেকটি ভারতীয় অবশ্যই সঙ্গতভাবে গর্বিত হতে পারে।

উপনিষদগুলির রচনাকাল সম্পর্কে অবশ্য সুনির্দিষ্ট বা একেবারে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপনিষদের রচনার কালও বিভিন্ন, সব উপনিষদ একই সময়ে রচিত হয়েছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবু পণ্ডিতরা একটি বিষয়ে মোটামুটি একমত। প্রধান প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদগুলি প্রাক্-বুদ্ধ যুগের রচনা। অর্থাৎ সাধারণভাবে এদের রচনাকাল হল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক।

ঐতিহ্য অনুসারে বেদ বা বৈদিক সাহিত্য বলতে বোঝায় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। অর্থাৎ উপনিষদও এই দৃষ্টিতে বেদই। তাই একেকটি উপনিষদকে একেকটি সংহিতা বা বেদের অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। যেমন ঐতরেয় উপনিষদের সম্পর্ক ঋগ্‌বেদের সঙ্গে, ছান্দোগ্য উপনিষদের সম্পর্ক সামবেদের সঙ্গে, কঠ উপনিষদের সম্পর্ক কৃষ্ণযজুর্বেদের সঙ্গে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের সম্পর্ক শুক্ল-যজুর্বেদের সঙ্গে এবং মুণ্ডক উপনিষদের সম্পর্ক অথর্ববেদের সঙ্গে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরে উপনিষদকে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। ফলে যথেষ্ট পরবর্তী যুগেও অনেক ধর্ম সম্প্রদায় ও দর্শন সম্প্রদায়ের প্রচারকরা নিজেদের মতবাদের মর্যাদা বাড়াবার উৎসাহে উপনিষদ নাম দিয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি শোনা যায় আকবরের আমলে আল্লা উপনিষদ নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। শৈব, শাক্ত ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের সমর্থকরাও নিজেদের মত অনুসারে শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু উপনিষদ রচনা করেছেন। সেগুলির সংখ্যা আড়াইশ'রও বেশি। তবে উপনিষদ নামে ব্যবহৃত হলেও স্বাভাবিকভাবেই এইসব গ্রন্থকে প্রকৃত অর্থে উপনিষদ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। উপনিষদ সাহিত্য বলতে প্রাচীন বৈদিক উপনিষদ-গুলিকেই গ্রহণ করতে হবে এবং এগুলি সংখ্যায় তেরোটি বলেই সাধারণতঃ স্বীকার করা হয়।

বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে উপনিষদ হল ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এবিষয়ে

সন্দেহ নেই যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ আধুনিক পাঠকের চোখে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের প্রধান বিষয়বস্তুতে মৌলিক পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিজস্ব আলোচ্য বিষয়ের বৈশিষ্ট্যে উপনিষদ বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। একটি বিষয়ে পণ্ডিতরা মোটামুটি একমত। তা' হল উপনিষদেই দার্শনিক চিন্তার বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নানা জটিল যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে বিভিন্ন সম্প্রদায় অজস্র রকমের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছে। ফলে গড়ে উঠেছে ভারতীয় দর্শনের বিশাল সাহিত্যসম্ভার। সে সব জটিলতা উপনিষদে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু বিভিন্ন উপনিষদে ঋষিরা এমন বহু প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন যা' নিঃসন্দেহে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উন্মেষের স্পষ্ট সূচনা করে। পূর্ববর্তী যুগের ক্লান্তিকর যজ্ঞীয় জটিলতা, কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত অবান্তর চুলচেরা বিচার, এসব থেকে মুক্তির কিছুটা আভাস, চিন্তার জগতে এক নতুন পরিমণ্ডলের ইঙ্গিত উপনিষদের মধ্যে লক্ষ্য না করে উপায় নেই।

তবে এখানে একটি ভ্রান্তির সম্ভাবনাও সযত্নে পরিহার করা দরকার। এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে উপনিষদে যাগযজ্ঞ বা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অর্বাচীন জ্ঞানকাণ্ড প্রাচীন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেন সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তা' নয়। উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও যাগযজ্ঞের ব্যাপারে নিঃস্পৃহতা বা ঔদাসীন্য সৃষ্টি হয়েছিল এমন নয়। উপনিষদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই একথা প্রমাণ করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা রাজারাজড়াদের হয়ে যজ্ঞ করছেন এবং দক্ষিণা হিসেবে প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করছেন এমন উপাখ্যান অনেক উপনিষদেই আছে।

উপনিষদের আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে আমাদের আরো দু'একটি কথা বোধহয় মনে রাখা দরকার। দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু লক্ষণীয় বিষয়ের ইঙ্গিত উপনিষদে পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে আপদ্ধর্ম নামে একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তব্য অকর্তব্য, আচার-আচরণ ইত্যাদি নিয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত নিয়ম-কানুন ব্রাহ্মণ অনুসরণ না করলে নিন্দাই হবে, পাপের ভাগী হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। এই সব বিধি নিষেধ সাধারণ বা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। কিন্তু আপৎকালে, অর্থাৎ প্রাণসংশয় দেখা দিচ্ছে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, নিষিদ্ধ আচরণও দোষাবহ হবে না। আকাশে যেমন কর্দমের স্পর্শ লাগে না তেমনি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বর্জনীয় কর্মও পাপ জন্মায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদের (১/১০/১—১/১১/৩) একটি উপাখ্যানে ব্যাপারটা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। একবার কুরুদেশে শিলাবৃষ্টির ফলে শস্য নষ্ট হয়ে যায়, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যের অভাবে, অনাহারে উষস্তি নামে এক

ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক খুবই দুর্দশায় পড়ে। অন্নের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তা'র দেখা হয় এক মাহুতের সঙ্গে। সে একটি পাত্রে করে মাষকলাই খাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ উষস্তি তা'র কাছে ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু ঐ পাত্রের সব মাষকলাই তো উচ্ছিষ্ট। উষস্তি কোন বিধিনিষেধ মানল না। প্রাণরক্ষার জন্য সে মাহুতের উচ্ছিষ্ট খাদ্যই খেল। তখন মাহুত তা'কে অনুরোধ জানাল নিজের থেকে জল পান করতে। কিন্তু উষস্তি জল পান করল না। কেন? যেহেতু জল উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট মাষকলাই খেয়েছিল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে, উপায়ান্তর না থাকায়, বাধ্য হয়ে। কিন্তু উচ্ছিষ্ট নয় এমন জল সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে বিধি মানতে হবে। শুদ্ধ জল দিয়েই তৃষ্ণা নিবারণ সে করবে।

তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোলামেলা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় কিছু উপাখ্যানে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীকালের গোঁড়া ব্যাখ্যাকাররা নিজস্ব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ঐ সব ক্ষেত্রে ভিন্নতর তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়ে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪/১/১—৪/২/৫) আমরা পাই জানশ্রুতি ও রৈক্কর উপাখ্যান। রৈক্ক ছিলেন মহাজ্ঞানী, সর্ব জ্ঞানের আকর। প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং শেষে নিজের কন্যাকে দান করে তা'কে সন্তুষ্ট করে জানশ্রুতি তা'র কাছ থেকে উপদেশ লাভ করেন। জানশ্রুতিকে রৈক্ক সম্বোধন করেছিলেন 'শূদ্র' বলে। এই সম্বোধনের কারণ কী? জানশ্রুতি কি জাতিতে শূদ্র ছিলেন? ব্রাহ্মণ রৈক্ক তা'কে উপদেশ দিয়েছিল। তবে কি শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার ছিল? শঙ্করাচার্য তা'র ভাষ্যে প্রশ্নটি তুলেছেন এবং প্রাণপণে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ওখানে শূদ্র শব্দটি জাতিবাচক নয়, ভিন্নতর বিশিষ্ট অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। ঐ উপনিষদেই (৪।৪।১-৪।৪।৫) রয়েছে জাবাল সত্যকামের কাহিনী। সত্যকাম ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। গুরুগৃহে যাবার আগে জননী জবালার কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন নিজের গোত্র। কিন্তু জবালা তা' বলতে পারেন নি। তিনি জানতেন না তা'র সন্তানের পিতা কে। যৌবনে তা'কে অনেক প্রভুর সেবা করতে হয়েছিল, তখনি তিনি সত্যকামকে পেয়েছিলেন। তা'র একমাত্র পরিচয় 'জাবাল', অর্থাৎ জবালার পুত্র। সঙ্গতভাবেই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ব্যাপারটা সাধারণভাবে নিতে পারেন নি সত্যকামের মতো ঋষির জন্ম নিয়ে কোন সন্দেহ বা বিতর্ক উঠতে পারে এমন সম্ভাবনা তা'র স্বপ্নেরও অগোচর। ফলে তিনি জবালার অজ্ঞতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষ যুক্তি আবিষ্কার করে। মূলের বক্তব্যের সঙ্গে এই ব্যাখ্যা কতোটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা' পাঠক নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন।

এমন কি এ কথাও অনেকে বলেছেন যে উপনিষদকে ভিত্তি করেই পরবর্তী-কালের পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক উপাসনার উদ্ভব ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ না করা বোধ হয় অন্যায়ের পর্যায়ে

পড়বে। ভারতীয়দের বিজ্ঞান চেতনার সর্বপ্রথম উন্মেষের পরিচয় আমরা পাই একটি উপনিষদে, ছান্দোগ্য উপনিষদে। এই উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা পরিচিত হই উদ্দালক আরুণি নামে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। সেই অতি-প্রাচীনকালে পুত্র শ্বেতকেতুর সঙ্গে নানা বিষয়ে তা'র আলোচনার যে বিবরণ আমরা পাই তা' মনোযোগ দিয়ে পড়লে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। এই রকম অনুসন্ধিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সেই সুপ্রাচীন কালে শুধু ভারতবর্ষে কেন সারা বিশ্বেও আর কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব। প্রয়াত অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন বিশ্বের 'প্রথম বিজ্ঞানী' হিসেবে অভিনন্দিত হবার যোগ্য একমাত্র ব্যক্তি হলেন উদ্দালক আরুণি। বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি মূলতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখা। তারা প্রথম বিজ্ঞানীর সম্মানিত আসনটি দেন গ্রীসদেশের অধিবাসী থেলিসকে। কিন্তু অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় থেলিস এবং আরুণির মতবাদ বিশদ আলোচনা করে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে, তথ্য ও যুক্তির সাহায্য দেখাতে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিক চিন্তা, অনুসন্ধান পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের দিক থেকে বিচার করলে আরুণি থেলিসের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে ছিলেন। (দ্রষ্টব্য 'হিস্ট্রি অফ সায়ান্স এ্যাণ্ড টেকনোলজি ইন অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া', দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়।)

সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে শুধুমাত্র আমাদের দার্শনিক চিন্তাভাবনার প্রথম প্রাচীন বিবরণ হিসেবেই উপনিষদের গুরুত্ব তা' নয়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত ও উপনিষদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্যায়নের জন্য উপনিষদের ব্যাখা ও আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

এপর্যন্ত উপনিষদের মতবাদের ব্যাখ্যা বা আলোচনা হয়েছে কীভাবে? উপনিষদে লব্ধ তত্ত্বের মূল্যায়ন করা হয়েছে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে? সন্দেহ নেই পণ্ডিতরা মোটামুটি সকলেই এই সাহিত্যকে দার্শনিক চিন্তাভাবনার আকর হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, সমস্ত উপনিষদগুলির মধ্যেই কি আগাগোড়া কোন একটি বিশেষ মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে? কোন একটি দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই কি ধাপে ধাপে যুক্তিসঙ্গতভাবে নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছে সমস্ত উপনিষদবাক্য? প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী ব্যাখ্যা এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরে বিশ্বাসী এমনকি কোন কোন পণ্ডিত উপনিষদকে একেবারেই নতুন ধরনের সাহিত্য বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাদের মতে উপনিষদ মূল বেদেরই অখণ্ড ধারাবাহিকতা, কী বিষয়বস্তু, কী মানসিকতা, কী চিন্তার পরিমণ্ডল, কোন দিক দিয়েই এতে কোন অভিনবত্ব বা নতুন দিকে মোড় নেবার ইঙ্গিত নেই। বড়জোর এটুকু হতে পারে, বেদে যা' ছিল বীজাকারে, অপরিস্ফুট, উপনিষদে তা' হয়ে উঠেছে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পরিস্ফুট।

অন্তরা এতোটা উগ্র না হলেও এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে উপনিষদে একটিমাত্র মূল দর্শনই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হয়তো এমন কিছু কিছু উপনিষদবাক্য থাকতে পারে যা' থেকে মনে হতে পারে যেন কোনবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু তা' আসলে আপাতবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নয়। অর্থাৎ কিছু কিছু শব্দের একটু ঘুরিয়ে ব্যাখা করে তারা দেখিয়ে দেন কোন অসঙ্গতি নেই, সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাৎপর্য বেরিয়ে আসছে। এর সহজ উদাহরণ হল শঙ্করাচার্যর ভাষ্য। তিনি উপনিষদকে একান্তভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাহিত্য বলে গণ্য করেছেন এবং তাঁর মতে একমাত্র অদ্বৈতবাদেই সমস্ত উপনিষদ্‌বাক্যের পর্যবসান। অথচ দেখুন, ভারতীয় দর্শনে মোট ছ'টি দার্শনিক সম্প্রদায় আস্তিক বলে চিহ্নিত, অর্থাৎ এরা সকলেই বেদের তথা উপনিষদের প্রামাণ্যে একান্ত আস্থাশীল, বেদান্তবিরোধী সম্প্রদায়গুলিরও দাবি আছে উপনিষদের উপর, নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তারাও উপনিষদের অনুকূল বাক্য উদ্ধৃত করতে পারেন এবং করেছেনও। কিন্তু শঙ্করাচার্য সেই চেষ্টা একেবারেই বরদাস্ত করেননি। অন্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের এই ধরনের প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করে অভিনব ব্যাখ্যাকৌশলে তিনি যেন-তেন-প্রকারেণ দেখাতে চেয়েছেন মোটেই কোন উপনিষদ্‌বাক্যে অদ্বৈতবাদ-বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যমত খণ্ডনে তা'র বিস্তৃত আয়োজনে সহজেই ব্যাপারটা চোখে পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিক পণ্ডিতও একই পথের পথিক। সমগ্র উপনিষদের মৌলিক মতবাদ আবর্তিত হয়েছে শুধু দু'টি তত্ত্বকে ঘিরে, আত্মা এবং ব্রহ্ম।

কিন্তু সৌভাগ্যই বলুন বা দুর্ভাগ্যই বলুন কিছু বিরোধী কণ্ঠস্বরও আছে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা'রা প্রমাণ করতে চেয়েছেন উপনিষদের মধ্যে আগাগোড়া সুসংহত সুশৃঙ্খল যুক্তিসহ কোন একটিমাত্র বিশেষ মতবাদ স্থাপনের প্রয়াস চোখে পড়ে না। বরং বাস্তব ঘটনা বিপরীতই। এমনকি একই উপনিষদের মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায়ে পরস্পরবিরোধী উক্তি খুঁজে পাওয়াও বিচিত্র নয়। হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গবহির্ভূত বিষয়ের অবতারণা, আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য পূর্বাপর ক্রমের অভাব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে একথাই বোধহয় প্রমাণিত হয় যে এখানে একটি বিশুদ্ধ মত স্থাপন করা হয়নি। অনেক সময় আবার ব্যবহার করা হয়েছে রূপক, রূপকের তাৎপর্য উদ্ধার করে উপনিষদের প্রকৃত ব্যক্তব্য বুঝে ওঠা যথেষ্ট কঠিন। আসলে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। সংশয় বা জিজ্ঞাসা থেকেই দর্শনের শুরু। উপনিষদের যুগে দর্শনচিন্তার উষালগ্নে ঋষিরা একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে অবিচলভাবে অগ্রসর হবেন এমন কল্পনা বোধহয় ঠিক নয়। বরং তাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা নানা বিকল্প বা বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এমন কল্পনাই হয়তো সঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও মনে রাখা যেতে পারে। ইতিহাসের সাক্ষ্যও

বোধহয় নানা মতবাদ প্রকাশের পরিস্থিতিকেই সমর্থন করে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যুগ বিভাগের প্রসঙ্গে দু'টি নগরায়ণের (urbanisation) কথা বলা হয়। প্রথম নগরায়ণের কাল সাধারণতঃ ধরা হয় খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দ থেকে ১৭৫০ অব্দ। অন্যদিকে দ্বিতীয় নগরায়ণের সময় বলা যেতে পারে মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক, অর্থাৎ উপনিষদের যুগ। সমাজতত্ত্ব সচেতন ঐতিহাসিকরা মনে করেন অন্যান্য দিক ছাড়াও চিন্তাজগতের ক্ষেত্রে এই দুই নগরায়ণের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রথম নগরায়ণে সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক প্রভুদের কৌশল এমনি ছিল যে তখন নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, সয়কারী মতবাদের বিরোধী মতবাদ উত্থাপন ইত্যাদির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় নগরায়ণে পরিস্থিতি ছিল বিপরীত। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রভাবে তখন চিন্তা জগতে একটা টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নানা মতবাদ, নানা সংশয়, নানা বিতর্কের আলোড়নে সমাজ হয়ে উঠেছিল উত্তাল। সুতরাং যুগধর্ম অনুসারে উপনিষদে একটিমাত্র মত প্রতিফলিত হতে পারে না।

এসব কথা বলা হচ্ছে কিন্তু একটি সত্যকে সামনে রেখে। সত্যটি হল এখনো পর্যন্ত উপনিষদের ব্যাখ্যায় বেদান্তবাদীদের প্রতাপ একচ্ছত্র না হলেও যথেষ্ট প্রবল। নিরপেক্ষ দৃষ্টি অনুসারে উপনিষদ বিচারের অবকাশ নেই এমন কথা অবশ্যই বলা যায় না। সংক্ষেপে একটা দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। অদ্বৈতবেদান্তের মূল কথাটা অনেকেই জানেন, পরমাত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তীরা দাবী করেন সমগ্র উপনিষদের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বেদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপনিষদ পর্যালোচনা করলে এই তত্ত্বের প্রতিপাদক বাক্য বহু পাওয়া যায়। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধক শ্রুতিবাক্যকে বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে 'মহাবাক্য'। মহাবাক্য বহু থাকলেও প্রসিদ্ধ হল চারটি—তৎ ত্বমসি (সামবেদ), অহং ব্রহ্মাস্মি (যজুর্বেদ), প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঋগ্‌বেদ) এবং অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ববেদ)। তা'হলে বলা যেতে পারে 'তৎ ত্বমসি' বাক্যটি অদ্বৈতবেদান্তের একটি মূলমন্ত্র। বেদান্ত-দর্শনের অনেক গ্রন্থেই এই বাক্যটির অর্থবোধ নিয়ে বিশদ বিচার দেখা যায়। তৎ-পদের অর্থ কী, ত্বম্-পদের অর্থ কী, ঠিক কীভাবে এই বাক্য থেকে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গ্রন্থকাররা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

কিন্তু যদি কেউ (তর্কের খাতিরেই না হয়) প্রশ্ন তোলে, এই দৃষ্টিভঙ্গী কতোটা বাস্তব? তা'হলে মূলের ভিত্তিতে ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হবে বোধ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক আরুণি এবং তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর কথোপকথন বিস্তৃতভাবে বিধৃত হয়েছে। পুত্রকে তত্ত্ব উপদেশ করার সময় পিতা 'তৎ ত্বমসি' এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। পুত্র ব্যাপারটা সহজে

বোঝেন নি, বারবার পিতাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আরো প্রাঞ্জল করে বিষয়টি বলতে। উদ্দালক তাই তা'র বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছিলেন অনেকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্যে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যটির তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে প্রসঙ্গ এবং বক্তার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে নয়। এই ছোট মুখবন্ধে স্বাভাবিকভাবেই বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। তবে দু' একটি বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

'তৎ ত্বমসি' বাক্যটি উচ্চারণ করে উদ্দালক জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বোঝাতে চেয়েছেন এই মত মানতে হলে এ কথাও মানতে হবে যে তিনি ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক, অর্থাৎ এমন এক দার্শনিক যিনি জগতের বাস্তব সত্তা মানেন না। অদ্বৈতবেদান্তীরাও তা'ই, তারা জগতকে অলীক বলেই গণ্য করেন। কিন্তু উদ্দালকের মতবাদ আলোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে এমন কোন সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় অসম্ভব। তিনি যেভাবে বিভিন্ন সমস্যা তুলেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা'তে বরং এই অনুমানই সঙ্গত মনে হয় যে তার মতে এই জগত অবশ্যই সৎ বা বাস্তব। এ জন্যই বোধ হয় নিতান্তই ঐতিহ্য বিরুদ্ধ বলে মনে হবার আশঙ্কা থাকলেও, সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও কিছু কিছু পণ্ডিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন উদ্দালক আরুণির মতবাদের মধ্যেই ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। জার্মান পণ্ডিত জেকবি এমন কি মন্তব্য করেছেন উদ্দালকের দর্শনে ব্রহ্মের কোন উল্লেখই নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এক ধরণের প্রাচীন বস্তুবাদী (hylozoist) এবং এদিক দিয়ে সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন তা'রই সমসাময়িক গ্রীক দার্শনিক থেলিসের সমগোত্র। এই যদি হয় পরিস্থিতি তবু কি আমরা উদ্দালককে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী বলে মেনে নেব ?

আরো দেখুন। আগেই বলেছি 'তৎ ত্বমসি' বাক্যটির তত্ত্বার্থ বোঝাতে গিয়ে উদ্দালক অনেকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি হল ন্যাগ্রোধবৃক্ষের দৃষ্টান্ত। ঐ অনুচ্ছেদটি আলোচনা করলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে উদ্দালকই ছিলেন ভারতীয় দর্শনে পরমাণুকারণবাদের প্রথম প্রবক্তা (যদিও সাধারণতঃ বৈশেষিক দর্শনের প্রথম ঋষি কণাদকে এই মতের আদি প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পরবর্তীকালে এই মতবাদ মূলতঃ ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে পরিগণিত)। কিন্তু উদ্দালক যদি পরমাণুকারণবাদের প্রচারক হন তবে তিনি অদ্বৈতবাদের সমর্থক হন কীভাবে? পরমাণুকারণবাদ ব্রহ্মকারণবাদের প্রতিপক্ষভূত, বেদান্তসূত্রে এবং শাঙ্করভাষ্যে এই মতবাদ প্রবল উৎসাহে খণ্ডিতই হয়েছে। সংক্ষেপে তা'হলে দাঁড়াচ্ছে বিনা বিচারে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা চলবে না। অবশ্য পূর্বসূরীরা কেউ কেউ পথনির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ওয়ালটার রুবেন একটি প্রবন্ধে একেকটি বিষয় ধরে ধরে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদের প্রতিনিধি ছিলেন ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক আরুণি এবং বেদান্ত বা ভাববাদের প্রতিনিধি ছিলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য। অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তার দিক দিয়ে দুই ঋষি ছিলেন দুই মেরুর অধিবাসী।

কথাটা হল মহামূল্য উপনিষদ সাহিত্য আমাদের পড়তে হবে, জানতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, আলোচনা করতে হবে। কিন্তু তা' করতে হবে তথ্যনিষ্ঠভাবে, নিরপেক্ষভাবে। শ্রীমান রাসবিহারী দত্তর বর্তমান গ্রন্থটির মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা বোধহয় এইখানেই। তিনি ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উপনিষদ-গুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তা'র লেখায় নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট। মূল উপনিষদ সাহিত্যের সঙ্গে তা'র গভীর পরিচয়ও সহজেই চোখে পড়ে। তা'র প্রয়াস সার্থক কি ব্যর্থ এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত পাঠকের উপর চাপাতে চাই না। তবে অনুরোধ একে গ্রহণই করুন বা বর্জনই করুন ধৈর্যসহকারে পড়ার পরই তা' করবেন। কালিদাসের একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে পারি বোধহয়, বিদগ্ধ ব্যক্তিরা পরীক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নেন ভাল কি মন্দ, মূর্খরাই পরিচালিত হয় অন্যের বুদ্ধি অনুসারে (সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ)। অলমতিবিস্তরেণ।

সূচী

উপনিষদ ঃ দর্শনের সূচনালগ্ন

বৈদিক যুগের শেষভাগে উপনিষদ, বৈদিক ধারাস্রোতে এক অনন্য উত্তরণ বলে চিহ্নিত। অবশ্য একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে উপনিষদ পারম্পর্য রহিত অকস্মাৎ এক স্বয়ম্ভু চিন্তার প্রকাশ। বরং একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের জমিতে যে দার্শনিক চিন্তার বীজ ছড়ানো ছিটানো ছিল উপনিষদে তাকেই সযত্ন প্রয়াসে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করানো হয়েছে। এক কথায় বলা যায় ভারতবর্ষের চিন্তা পদ্ধতির ইতিহাসে উপনিষদই হলো প্রথম স্বীকৃত সাহিত্য যেখানে দর্শনচিন্তার সমন্বিত উন্মেষ ঘটেছে।

উপনিষদে দর্শনচিন্তা উন্মুখর হলেও বেদ কথাটির মধ্যেই দার্শনিক উপলব্ধি নিহিত। বেদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিই বিশ্বরহস্য অনুসন্ধিৎসার নির্দেশিকা। বিশ্ব-রহস্য অনুধাবন করার যে আকুতি সেই সময়ের সমাজ-মানুষের চিন্তা চেতনায় ছড়িয়েছিল তার সংগ্রহই হলো বেদ। ঋগ্‌বেদের বিখ্যাত মন্ত্র[১] যা সৃষ্টির গান বলে চিহ্নিত, তাহলো—কে বা কারা বলতে পারে, কখন কিভাবে এই সৃষ্টি সম্ভব হলো? এমনকি কোন ঈশ্বরেরও তখন আবির্ভাব হয় নি, তাহলে কে এই সৃষ্টি সম্পর্কিত সত্য ব্যাখ্যা করতে পারে? কখন এই পৃথিবীর সৃষ্টি হলো, কিংবা এই সৃষ্টির পেছনে কার অদৃশ্য হাত বর্তমান 'ঈশ্বরের না প্রকৃতির'?

সমগ্র বৈদিক যুগ কোন না কোন ভাবে এই মূল প্রশ্নেই আলোড়িত। এখন প্রশ্ন বেদ কি? কিভাবেই বা তার আবির্ভাব হলো? কিভাবেই বা তার বিকাশ? এই নিয়ে নানা বিতর্ক আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে প্রচলিত। আমরা তার সূত্রগুলির ইংগিতবহ দিকগুলিই কেবল এখানে উল্লেখ করব।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বেদই হলো প্রথম লিখিত সংগ্রহ।[২] সঙ্কলিত হওয়ার পূর্বে বৈদিক সাহিত্য গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। যখন লিপি আবিষ্কার হলো, সমাজ বিকাশের ধারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটল তখনই এই সঙ্কলনের আয়োজন। বিশেষ পরিবর্তন বলতে তখন সমাজ পরিকাঠামোয় একছত্রাধিপতি রাজার ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনার্য বলে কথিত আদি অধিবাসীরা পর্যুদস্ত হয়েছে। সুসংগঠিত আদি অধিবাসীরা পর্যুদস্ত হয়েছে বটে

কিন্তু প্রশাসনের ক্ষেত্রে রীতিমত ভীতির কারণ হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে তাদের সংগঠিত সংস্কৃতি প্রতিমুহূর্তে প্রশাসনকে 'যুদ্ধং দেহি' তড়পানিতে শাসাচ্ছিল। সেই সময়ের কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই তথ্য লেখক-এর কল্পনাপ্রসূত না এর কোন বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। এর উত্তরে বলা যায় যে সেই সময়ের প্রশাসকগণ তাঁদের শাসন কর্তৃত্ব অটুট রাখার কারণেই যে বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলনে সচেষ্ট হয়েছিলেন একথার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেই রয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেই[৩] স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করা আছে যে, (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ থেকে তুলে ধরলাম) "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ—দেবাঃ চ, অসুরাঃ চ। ততঃ কানীয়সাঃ এব দেবাঃ জ্যায়সাঃ অসুরাঃ। তে এষু লোকেষু অস্পর্ধন্ত, তে হ দেবাঃ উচুঃ, হন্ত, অসুরান যজ্ঞে উদ্গীথেন অত্যয়াম ইতি। প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান—দেবগণ ও অসুরগণ। সুতরাং দেবগণ অল্পসংখ্যক ও অসুরগণ বহুসংখ্যক। তাঁহারা এই সকল লোকে (আধিপত্য লাভের জন্য) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। (বহু সংখ্যক অসুর কর্তৃক আপনা-দিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া) উক্ত দেবগণ বলিলেন, "আমরা যজ্ঞে উদ্গীথের" দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিব।"

উপরের উদ্ধৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আর্য ও অনার্যকে একই পিতার দুই সন্তান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যত্র আবার কেউ কেউ শম-দম-তিতিক্ষার যারা অনুসারী তারা আর্য, বিপরীতকামিগণ অনার্য বলে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করার প্রচেষ্টা পেলে ও এর থেকে অন্তত এটুকু পরিষ্কার যে দেবতা ও অসুর পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। কিন্তু দেবতারা সংখ্যায় অল্প ও অসুররা সংখ্যায় অধিক। শুধু ক্ষাত্র শক্তির পক্ষে আধুনিক পরিভাষায় পুলিশ-মিলিটারী-প্রশাসন দিয়ে শাসনকর্তৃত্ব চিরকাল দখল রাখা সম্ভব নয়। কারণ সংখ্যাধিক্যজন কখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করলে পশুশক্তি তৃণখণ্ডের মতো উড়ে যাবে। তাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে শুধু বস্তুলোক অধিকার নয় ভাবলোক অধিকার সমান জরুরী। অসুরেরা এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। কেননা স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্য, দর্শন তাদেরই করায়ত্ব। লোক-সাধারণে পরিব্যাপ্ত স্বাভাবিক কারণেই। এই ভাবজগতকে প্রভাবিত করতে হবে। তাই তাঁদের সঙ্কল্প এবার উদ্গীথ দিয়েও অসুরদের অতিক্রম করব। আর এর পর থেকেই যে সুপরিকল্পিত প্রচার শুরু হয় তা হলো পঞ্চইন্দ্রিয় লব্ধ

যাকিছু ভালো তাহলো দেবতাদের যাকিছু মন্দ তা অসুরদের। পরবর্তী উদ্ধৃতিতেই তা ধরা পড়ছে

"তে হ বাচম্ উচুঃ ত্বম্ নঃ উদ্গায় ইতি। তথা ইতি। বাক্ উৎগায়ৎ। যঃ বাচি ভোগঃ, তম্ দেবেভ্যঃ আগায়দ, তৎ কল্যাণম্ বদতি তৎ আত্মনে। তে বিদুঃ অনেন উদ্গাত্রা বৈ নঃ অভি+এষ্যন্তি ইতি। যম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিধ্যন্। সঃ যঃ সঃ পাপ্মা, যৎ এব ইদম অপ্রতিরূপম্ বদতি, সঃ এব সঃ পাপ্মা।[৪]

তাঁহারা বাগিন্দ্রিয়কে বলিলেন—'তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর'। বাক্ বলিলেন 'তাহাই হউক'। তখন বাক্ তাঁহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিলেন। 'বাক্যের দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, তাহা সর্ব দেবতা (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়গণ) ভোগ লাভ করুক, কিন্তু বাক্যের দ্বারা যে কল্যাণ লাভ হয় তাহা নিজের হউক'—(এইভাবে বাক্ উদ্গান করিয়াছিলেন)। অসুরগণ জানিতে পারিল যে দেবতাগণ এই উদ্গাতা দ্বারা তাহাদের পরাজিত করিবে। এইজন্য তাহারা বাগিন্দ্রিয়কে আক্রমণ কবিয়া তাহাকে পাপবিদ্ধ করিল। লোকে যে অনুচিত বাক্য বলে ইহাই সেই পাপ।"

এইভাবে দেখা যায় সম্পূর্ণ অভিনব ভঙ্গীতে এক নতুন ভাবলোক তৈরী করতে, যে লোক স্বর্গ বলে আখ্যাত, যে লোক অমৃত, অজর, অমর চিরবসন্তের পারিজাত লোক। দুঃখ-শোক-পাপ-তাপ রহিত অনাবিল আনন্দের আবাস স্থল। ঐ গ্রহ-তারা-চন্দ্র-সূর্যলোক ছাড়িয়ে এক অনাস্বাদিত অভূতপূর্ব কল্পলোক। যার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র চিন্ময় সত্বা, পরমাত্মা, পরমেশ্বর। শাসক সম্প্রদায় তাঁরই প্রতিনিধি। প্রজাপালন নিমিত্তই ধরাধামে আগমন। কিন্তু এই অভিনব তত্ত্ব প্রচার করতে গেলে সাধারণে পরিব্যাপ্ত যে ভাবজগত তার আনুপূর্বীক অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ সমাজে সম্পৃক্ত ভাবধারাকে অবলম্বন করেই তা করা প্রয়োজন তা না হলে এই নতুন তত্ত্ব অপাঙক্তেয় নিরালম্বন হয়ে অচিরেই বিলুপ্ত হবে। এই সঙ্কল্পই সেই সময়ের শাসক সম্প্রদায়কে বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখন প্রশ্ন, বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলন কি তাহলে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ভাবধারায় হুবহু সংগ্রহ। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক রয়েছে বিদ্বৎ-মহলে।

বিতর্ক যাই থাকুক না কেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃতিই প্রমাণ করছে যে এই সঙ্কলন উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আর যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত তার নিরপেক্ষতার প্রশ্ন আসে না। আর তা ছাড়া ধরে নিলেও যে সমাজে যা কিছু প্রচলিত তা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই, তবুও হলফ করে বলা যায় না

যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের[৫] মত অবস্থান ভারতবর্ষের সব কয়টি এলাকাই সংগ্রহের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অন্তত সেই যুগে এসব ভাবা অন্ধ আবেগ মিশ্রিত কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে সেই সময়ে লোকায়তে প্রচলিত সবটুকুকেই সংগ্রহ করা গেছে কোনমতেই বলা যায় না। আর সংগৃহীত সবটুকুকেই অক্ষুন্ন অবস্থায় নির্বিচারে সঙ্কলনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে এটুকু ভাবার অবকাশও বৃহদারণ্যকের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় না। কারণ বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ উভয় জগতেই তখন যে দ্বন্দ্ব প্রচলিত ছিল এই উদ্ধৃতিই তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাই আশা করার কোনই কারণ নেই যে নির্বিচার সংগ্রহ হয়েছে। তবে এখান থেকে একথাও ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি সংগ্রহের বাইরে রাখা গেছে। সেই সময়ের বেদের সংগ্রাহকগণও তো সামাজিক মানুষ ছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যা কিছু সংগ্রহ করা গেছে, তা কি নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা গেছে কে বা কারা, কখন, কিভাবে এই সকল সাহিত্য রচনা করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরও নঙর্থক। বৈদিক সমাজে গুরুগৃহই ছিল শিক্ষাকেন্দ্র। গুরু মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন শিষ্যকে কানে শুনে শ্রুতিশিক্ষার মাধ্যমে তা রপ্ত করতে হত। তাছাড়া তখনকার প্রচলিত প্রথা ছিল প্রচার বিমুখতা। বড়জোর গোত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হোত। ফলে সংগৃহীত সূত্রগুলির কে উদ্‌গাতা, কবে থেকে কিভাবে শুরু তার কোনরূপ নিশ্চিতি না থাকায় বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলনের পূর্বে ও পরে কোন মনীষাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। তাই বেদের সংগ্রহ কোন একজন ব্যক্তির রচনা সংগ্রহ নয়। এ হলো সেই সময়ের সমাজ মনীষার সমষ্টি সৃষ্টির অপূর্ব সঙ্কলন।

ফলে বেদকে ঘিরে যে বিদ্বৎমহলে নানা প্রকার বিতর্ক থাকবে এ বিষয়ে বলার অবকাশ রাখে না। বৈদিক সাহিত্য নিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের কেউ কেউ তো এমন মন্তব্যও করেছেন যে[৬] প্রাচীন ভারতীয়দের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই এই সকল মন্তব্যের উৎস। কারণ ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৭] ইতিহাস চেতনা রহিত হলে এই প্রকার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয় না। সত্য যা তা হলো ভারতীয় মনীষা কখনো ব্যক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করত না। কেননা তা পরিণামে ব্যক্তিতান্ত্রিক লোভ লালসাকে উৎসাহিত করতে পারে। তাছাড়া সাহিত্য-সংস্কৃতি কখনোই ব্যক্তি-মানুষের নয়। সমাজে প্রচলিত শিক্ষা থেকেই গড়ে

উঠেছে যদিও কোন ব্যক্তি তাকে আত্মস্থ করে প্রকাশ করেন। ফলে ব্যক্তিসৃষ্ট সংস্কৃতি বস্তুত সামাজিক সংস্কৃতিই। সাহিত্য-সংস্কৃতি মাত্রেই সামাজিক সম্পদ, ব্যক্তি-সম্পদ নয। ব্যক্তি সম্পদের ভাবনা কার্যত ব্যক্তি মালিকানাকেই প্রশ্রয় দেয়। প্রাচীন ভারতীয় মানীষা স্পষ্টতই ব্যক্তি প্রবণতা বিরোধী। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সঠিক মূল্যায়ন না করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এমনকি প্রাচ্য চিন্তাবিদগণের কেউ কেউ নানান মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় হেরোডোটাস যেভাবে ইতিহাস গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে লিখেছিলেন তেমন নজির প্রাচ্যে নেই। এটুকু অন্তত সবিনয়ে উল্লেখ করা দরকার অবশ্য একথা উল্লেখযোগ্য যে আমরা যা মন্তব্য করছি সবই প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে। বৈদিক সাহিত্যের বহুকিছুই আমাদের হস্তগত হয় নি। ঋগবেদের নাকি একুশটি শাখা ছিল, সামবেদের এক হাজারটি, যজুর্বেদের একশটি ও অথর্ব বেদের নয়টি শাখা ছিল। আমরা আজও আবিষ্কারই করতে পারিনি। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ও মহাভাষ্যে এসব কথা পাওয়া যায়।

এই আলোচনা দুটি বিষয়কে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলে, প্রথমত ভারতীয় মাত্রই যা নিয়ে গর্ব করতে পারেন তা হলো ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতির উৎস লোকায়ত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি লিপি আবিষ্কারের পূর্বে গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই সংস্কৃতি মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। আর লোক সাধারণই একে চর্চা মননের মধ্য দিয়ে বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। লোকায়ত বলতে বোঝায় যা লোকসাধারণে পরিব্যাপ্ত। লোকেষু আয়তঃ। দ্বিতীয়ত আশঙ্কার বিষয় যা তা হলো সংগৃহীত সংস্কৃতি আংশিক ও অসম্পূর্ণ। কারণ যা লোকমুখে সর্বত্র প্রচারিত ছিল তার সকল কিছু হুবহু সংগ্রহ করা বাস্তব কারণে অসম্ভব। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতবর্ষের ভৌগলিক অবস্থান, মানসিকতার তারতম্য, সংগ্রহকর্তার সীমাবদ্ধতা এসবই এজন্য দায়ী। এমনকি সংগৃহীত সংস্কৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ প্রয়োজনে এই সঙ্কলনে পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত পণ্ডিতরা কর্তৃপক্ষের ভাবাদর্শকে স্বভাবতই অটুট রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস করেছেন। ফলে যে সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়েছে তা নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের সংস্কৃতি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সংস্কৃতির আবার কর্তৃগত, লোকায়ত কী? সংস্কৃতি সংস্কৃতিই। এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায়, আকাশ আকাশই, সমুদ্র সমুদ্রই। কিন্তু মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আকাশ, সমুদ্রকে ভাগাভাগি করেছে। শীতের সকালে নরম রেশমী রোদ্দুর পেতে আমরা বলি 'এই এখান থেকে ওঠ, এখানকার

এই সূর্যালোক আমার অধিকারে।' তেমনি সংস্কৃতি, সংস্কৃতিই ছিল। স্বতঃ উৎসারিত লোকায়ত সংস্কৃতি। কিন্তু প্রভুশক্তি সেই সংস্কৃতিকে ভাগ করেছে। কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে। আর সেই থেকেই সংস্কৃতির বিভাজিকা সমাজে চালু—লোকায়ত সংস্কৃতি বনাম কর্তৃগত সংস্কৃতি। কিভাবেই বা তা ঘটল, তা আলোচনার বিষয়।

আর তা আলোচনা করতে গেলে বলা যায় সংরক্ষিত বৈদিক সাহিত্যই তার প্রমাণ। বৈদিকযুগের সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে ঋগ্বেদের আদি পর্যায়ে আধুনিক অর্থে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির যুগ থেকে বলতে গেলে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম-ষষ্ঠ শতক থেকে তা গড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু প্রাচীন ঋক্ মন্ত্রে রাজন্ বা রাজা শব্দটির ব্যবহার থেকেই অনেকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে ঋগ্বেদপূর্ব যুগে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে[৮] যে রাজা শব্দটির উল্লেখ আছে তা গণের সেনানী ও ব্রাতের প্রথম হিসেবে উল্লেখিত। গণ ও ব্রাত ট্রাইব শব্দের প্রতীক। ফলে রাজা বলতে ট্রাইবের প্রথম ব্যক্তি, যুদ্ধনেতা বা ট্রাইব প্রধানকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া বৈদিক সাহিত্যের বহু জায়গায় সভা সমিতিতে রাজাদের আগমন বা উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এখানে এই রাজা শব্দ রাজতন্ত্রের দ্যোতক নয়। রাজতন্ত্রের মূল কথা একত্ব বা অনন্যত্ব। তা সেখানে অনুপস্থিত। যা পরবর্তী পর্যায়ে বৈদিক যুগের শেষভাগে সুস্পষ্ট চেহারায় দেখা যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের যুগে রাজতন্ত্রের পথ প্রস্তুতির ইঙ্গিত অবশ্যই বর্তমান। ঋগ্‌বৈদিক যুগের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হলো[৯] 'দাশরাজ্ঞ'। দশ রাজার যুদ্ধ বলে চিন্তাবিদ্‌গণ ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে এ ছিল ট্রাইবদের লড়াই। তৃৎসু ভরতদের সঙ্গে পুরু, যদু তুর্বশ, অনু ও দ্রুহ্য অলিন, পক্থ, ভলানঃ, শিব ও বিষাণী প্রভৃতির যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তৃৎসু-ভরতরাই জয়ী হয়েছিল। এদের নেতা ছিলেন সুদাস। সুদাসের পূর্ববর্তী নেতৃত্বেরও উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। যথাক্রমে দিবোদাস ও পিজবন। দিবোদাস পুরু যদু ও পুরু তুর্বশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর অনন্য কীর্তি বলে চিহ্নিত অবৈদিক দাস দলপতি শম্বরও পণিদের[১০] শত সংখ্যক প্রস্তরনির্মিত নগর ধ্বংশ। তবে দশরাজার যুদ্ধের কাহিনীর উৎস হিসেবে যা উল্লেখ আছে তা হলো সপ্তসিন্ধুর তীরে প্রতিষ্ঠিত ভরত উপজাতির রাজা সুদাস তাঁর প্রধান পুরোহিত বিশ্বামিত্রের পরিবর্তে বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অপমানিত বিশ্বামিত্র দশটি উপজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সুদাসকে আক্রমণ করেছিলেন। ইংগিতময় ঘটনা হলো

আর্যদের এই পারস্পরিক সংঘর্ষে অনার্য উপজাতি যোগ দিয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় যে ঋগ্বেদের ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখনও আর্যসম্প্রদায় আদিম অধিবাসিগণের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশ বাধা সৃষ্টি করলে ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও আর্যগণ ধর্মীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ঋগ্বেদে পরস্পর বিপরীত যে মানবজাতির উল্লেখ আছে তার থেকে জানা যায় আর্যরা আদিম অধিবাসী অনার্যদের থেকে সমস্ত দিক দিয়ে পৃথক। আর্যদের চিহ্নিত করা হয়েছে বৈদিক ও আদিম অধিবাসীদের অবৈদিক। এই আদিম অধিবাসীদের মনুষ্যেতর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যথাক্রমে পণি, দাস, দস্যু হিসাবে। এদের কোন ভৌগলিক অবস্থান এর উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। তাদের বিষয়ে যে তথ্য দেওয়া আছে তা হলো এরা বাণিজ্য ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। এরা কৃষ্ণত্বক, অনাস ও মৃধ্রবাক অর্থাৎ কালোচামড়া, অনুন্নত নাক ও দুর্বোধ্য ভাষী। এদের নগর কেন্দ্রিক ও দুর্গ প্রধান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় এদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় এদের ধর্মীয় আচার আচরণ নিয়েও কটাক্ষ করা হয়েছে। এরা অকর্মণ্য, ক্রিয়াহীন। অদেবয়ু, দেবগণের প্রতি বিমুখ। অব্রাহ্মণ, ভক্তিহীন। অযজ্বন, যাগযজ্ঞবিহীন। অব্রত, ব্রতবিহীন. অন্যব্রত, ভিন্ন ব্রত বা রীতি অনুসারী। চিত্তাকর্ষক বিষয় যা তা হলো এই ভিন্নব্রত কী সে সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখ নেই। এখান থেকে আমাদের যে অনুভূতি তা বর্তমানে নৃতাত্ত্বিক তথ্যে অনেকটা প্রশমিত। কোন কোন চিন্তাবিদ মনে করেছেন হরপ্পা সংস্কৃতির ধ্বংসের পর ও যারা কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল তাদের এবং তাদের সমসাময়িক পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আদিম অধিবাসীদেরই দাস, দস্যু, পণি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এদের বাস-ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে আর্যরা জড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিকাঠামোর সংঘর্ষ উপরিকাঠামোর সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল তার স্বীকারোক্তি আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখান থেকেই জন্ম নেয় শ্রেণী বৈষম্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ঋগ্বেদে উপজাতি প্রধান পর্বে কোন বর্ণ বৈষম্য ছিল না। বর্ণ বৈষম্য পরবর্তী যুগের আবিষ্কার। আর তা প্রশাসনের প্রয়োজনে। এর সমর্থনে আমরা উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরব পরবর্তী পর্যায়ে। তবে এটুকু এখনই বলা যায় যে ঋগ্‌বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে[১১] সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। তার সমর্থন মেলে ঋগ্‌বেদের শেষ পর্যায়ে।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে আমরা সর্বপ্রথম শ্রেণীর উল্লেখ পাই। এই দশম

মণ্ডল ঋগ্‌বেদে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে বিদ্বৎসমাজে বিতর্ক আছে। তবে শ্রেণী-বৈষম্যের পূর্বাভাস বিভিন্ন সূক্ত থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু একমাত্র দশম মণ্ডলেই স্পষ্ট দুটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে। তারা যথাক্রমে দ্বিজ ও শূদ্র। আর্য সম্প্রদায় এখানে দ্বিজ নামে পরিচিত। বিজিত আদিম অধিবাসী সেবাপরায়ণ ক্রীতদাস ও প্রজাবৃন্দ শূদ্র নামে পরিচিত। দ্বিজদের মধ্যে আবার ভাগ ছিল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্য। যাগযজ্ঞ, শিক্ষাদীক্ষার চর্চা ব্রাহ্মণরাই করতো। যুদ্ধ বিগ্রহ শাসন পরিচালনা যারা করত তারা রাজন্য। ক্ষত্রিয় নাম তখনো সমাজে প্রচলিত হয় নি। আর বৈশ্য সম্প্রদায় বাণিজ্যপটু। এরা সকলেই আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার এদের নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল। রাজা 'এ নিয়ে বিব্রত থাকতেন প্রায়শই। সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টির জন্যই এই প্রধান উপায় মাথায় আসে। রাজা ভাবলেন যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিত স্থানীয় আদিবাসীদের যদি আর্যসম্প্রদায়ের সেবা পরায়ণতার কাজে লাগানো যায় তো সম্প্রদায়ের মধ্যের দ্বন্দ্ব কিছুটা উপশম হতে পারে। এই ভাবে যুদ্ধে পরাজিত আদিবাসীদের দাসে পরিণত করা হয়। সেই দাসদেরই আর্য-সম্প্রদায় অচ্ছুৎ, অবহেলিত, ঘৃণ্য, শ্রমজীবী বলে আখ্যায়িত করেন। আর সমাজে তখন থেকেই শ্রেণীর উৎপত্তি যথার্থরূপ পেতে থাকে। এইভাবে অবসর-ভোগী কর্তৃপক্ষ হয় শাসকশ্রেণী ও শ্রমদানকারী ক্রীতদাস পরিণত হয় শাসিত শ্রেণীতে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সামাজিক শ্রেণীভেদ আরো বেড়ে যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনি শূদ্রদের দুভাগে বিভক্ত করেছেন যথাক্রমে নিরবসিত ও অনিরবসিত। নিম্নবৃত্তি সমূহের অধিকারীরা উৎপীড়িত শূদ্র সমাজ। এই নিম্নবৃত্তিবর্গ শূদ্রদের নগর ও গ্রামের সীমানার বাইরে এদের বসতি। এদের অচ্ছুতের জীবন যাপন করতে হতো। এই ভাবে ক্রমে আর্যসম্প্রদায় শাসক সম্প্রদায়ে আর স্থানীয় বিজিত অধিবাসী শাসিত প্রজায় রূপান্তরিত হয়। আর্যরা হয় শাসক। অনার্যরা হয় শাসিত।

তবে সব সময় যে এই বিভাজন টিকেছিল তা নয়। কিন্তু যে কোনভাবেই হোক না কেন কখনো চাপের মুখে কখনো সংমিশ্রিত রীতিতে আর্যরা তাদেরই আচার বিচার গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ফলে আর্য ও অনার্য শাসক ও শাসিত চিহ্নিত হয় দুই বিবদমান শ্রেণীতে যথাক্রমে, দ্বিজ ও শূদ্র হিসেবে।[১২] দ্বিজ শাসক শ্রেণী, শূদ্র শাসিত শ্রেণী। পরবর্তী সাহিত্য দর্শনে এই বিভাজন ক্রমশই প্রকট হয়েছে। এখন ঘুরে ফিরে সেই পুরোনো বিতর্কই আবার উঠতে পারে

ঋগ্‌বেদে কেবলমাত্র পুরুষ সূক্তের দ্বাদশ ঋক-এ চতুর্বর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এই প্রক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে কি এমন সিদ্ধান্ত টানা যায় যে বর্ণ ধর্ম সেই যুগের প্রচলিত রীতি। এর উত্তরে বলা যায় সন্ধ্যা প্রদীপের সলতে সকালেই পাকানো হয়ে থাকে। তেমনই কেবল দশম মণ্ডলই নয় ঋগ্বেদের বেশ কয়েকটি জায়গায় বর্ণধর্মের কথা আছে। যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণের পরিচয় সুস্পষ্ট সপ্তম মণ্ডলে ও প্রথম মণ্ডলে। দশম মণ্ডলে তো রয়েছেই।[১৩] তেমনই ক্ষত্রিয় বর্ণের উল্লেখ স্পষ্ট চতুর্থ ও সপ্তম মণ্ডলে।[১৪] তাছাড়া চতুর্বর্ণের উল্লেখ রয়েছে অষ্টম মণ্ডলেও।[১৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যাস্ক পূর্ব প্রাচীন ভাষ্যকার গণ বিশেষ করে ঔর্ণবাভ ঋগ্বেদের উল্লিখত 'পঞ্চজনাঃ' ও 'পঞ্চক্ষিতয়ঃ' শব্দ দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চারটি প্রধান বর্ণ ও আদিম অধিবাসিগণ বলে উল্লেখ করেছেন। অতি প্রাচীন যুগের এই ভাষ্যকারের উক্তি পরম্পরাগত কোন বিশেষ অর্থ বহন করলেও করতে পারে। কারণ পরম্পরাগত অর্থের সঙ্গে এঁদের পরিচয় অধিকতর মনে হয়। এইভাবে দেখা যায় বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে শ্রেণীবৈষম্য যে ভারতীয় সমাজকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে তার প্রমাণ আমরা ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে পরবর্তী ধর্মসূত্র-গুলিতে সবিশেষ পাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ব্যাখ্যাই ক্রমশ পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়ে নানান কাহিনীর জন্ম দেয়। কিন্তু মূল কাহিনী প্রায় অবিকৃত রাখা হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে শুধু চারটি বর্ণেরই উল্লেখ আছে তা নয়। তাদের জন্ম কাহিনীও বর্ণিত আছে। পুরুষসূক্তে পুরুষ অর্থে ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। সেই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের এবং পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছিল। এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একই সম্প্রদায়ভুক্ত। শরীরের অংশভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে উর্দ্ধ অঙ্গে স্থান দিলেও শূদ্রকে পদতল থেকে জাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বিজিত দাস সম্প্রদায় শ্রম ও সেবার জন্য নিযুক্ত, তাই পা থেকেই সৃষ্টি ইংগীতময় তাৎপর্য বহন করছে। এখান থেকে যে শ্রেণীঘৃণা স্পষ্ট এ বিষয়ে কোনরূপ বিতর্ক থাকার কথা নয়।

এতৎ সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট যে ঋগ্বেদের যুগে সমাজ শ্রেণীবদ্ধ হতে শুরু করে থাকলেও শ্রেণী বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে নি। ঋক্ বৈদিক যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থাৎ বিভিন্ন জীবিকার লোক ছিল। তাছাড়া ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অদীক্ষিত উপজাতিদের স্বতস্ফূর্ত রচনা বলেও কোন কোন চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছেন।[১৬] ঋক্

বৈদিক যুগে শ্রেণীধর্ম বংশানুক্রমিক ছিল না। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে রয়েছে! এমনকি পুরোহিত এবং সৈনিক বৃত্তিও বংশানুক্রমিক ছিল না। কিন্তু ঋগ্-বৈদিক যুগের এই সমাজ চিত্র টিকে থাকেনি। ক্রমে ক্রমে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে। রাজার বা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটে, প্রকৃতি দেবতার জায়গায় নতুন দেবতা সৃষ্টি হন প্রজাপতি। প্রাচীনকালে ঋক্ বৈদিক যুগে সূর্যকে একমাত্র দেবতারূপে কল্পনা করে নানা প্রকার স্তুতি করা হত। যেমন 'একৈব বা মহানাত্মা দেবতা স সূর্য ইত্যাচক্ষতে স হি সর্বভূতাত্মা'। কিন্তু এই প্রজাপতি নতুন দেবতা। ইনি কোন প্রকৃতি দেবতা নন। ইনি এক কল্পিত সৃষ্টি কর্তা। এই সৃষ্টিকর্তা যেন রাজার আদর্শেই কল্পিত প্রজাদের পতি। কিন্তু রাজা মর্ত অধিবাসী। প্রজাপতি স্বর্গের অধিবাসী। কিন্তু স্বর্গের অধিবাসী হলেও ইনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, সকলের প্রভু। তিনি সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রজাপতি মূলত স্বর্গ অধিকর্তা। মর্তের অধিকর্তা রাজা। এইভাবে রাজারাও উপাধি গ্রহণ করলেন প্রজাপতি। মর্তের রাজা ঐ প্রজাপতিরই প্রতিনিধি। এই ভাবে ধর্মব্যবস্থায় একেশ্বরবাদের উদ্ভব হয়। এই প্রজাপতিই পরবর্তী উপনিষদ যুগে ব্রহ্ম কল্পনায় পল্লবিত। এই ব্রহ্মা 'একমেব অদ্বিতীয়ম্', এক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই।

প্রকৃতি-দেবতা-প্রধান যাগযজ্ঞ এক কথায় যজ্ঞ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলো। উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ জীবনের অবসান ঘটতে থাকে যজ্ঞের আদিরূপও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। যজ্ঞ আদিতে বোঝাতো যজমানের সফল কামনার উদ্দেশ্যে সিদ্ধি অর্থাৎ যজমান নিজেই নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধির প্রয়াসে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। কিন্তু যজ্ঞের উত্তররূপে দেখা যায় যজমান নিজে নন, তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য পুরোহিতকে নিযুক্ত করবেন। যজমানের স্বার্থে পুরোহিত যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করবেন। পরিবর্তে যজমানের কাছ থেকে উপযুক্ত দক্ষিণা পাবেন। আর যজ্ঞের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন যজমান নিজে। এইভাবে পেশাদার পুরোহিততন্ত্র দেখা দিল। যজ্ঞের সমষ্টি কামনার বদলে দেবতার মহিমা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যজমানের গৌরব ঘোষিত হতে থাকে। ঋক্ বেদের প্রায় চল্লিশটি সূক্তে দানস্তুতির উল্লেখ আছে। কতকগুলি সূক্ত যজ্ঞে গেয়ও সুদীর্ঘ। অনুমান হয় যজমান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে বিশেষ আবৃত্তির জন্য এসব রচিত। কারণ কতক সূক্তে দেখা যায় গায়কের উপর সন্তুষ্ট

হয়ে রাজা বা যজমান যুদ্ধে লব্ধ বৃষ অশ্ব ও সুন্দর ক্রীতদাস দক্ষিণা হিসেবে দান করেছেন। এই সকল যজ্ঞে পুরোহিতদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিত রাজা বা পৃষ্ঠপোষক, যজমান ও দেবতার মধ্যস্থ ব্যক্তি। পুরোহিতের প্রার্থনায় প্রীত হয়ে দেবতা যজমানের জয়লাভ সুগম করে দেন।[১৭]

যজ্ঞব্যবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আদিম জাদু-বিশ্বাসের রূপও বদলে যেতে থাকে। আদিম মানুষের যাদু বিশ্বাস বৈদিক সাহিত্যে বেশ কিছু সূক্ত জুড়ে রয়েছে। তার মূল প্রতিপাদ্য হল সুপ্রাচীন যাদু অনুষ্ঠানই বৈদিক যজ্ঞের প্রারম্ভিক পর্ব। এখন আদিম যাদু অনুষ্ঠানের তাৎপর্য কি ছিল তা বোঝার জন্য একজন আধুনিক চিন্তাবিদের বিশ্লেষণ তুলে ধরলেই বোঝা যাবে। "যাদু বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মূল কথা হল একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যাবে—যেমন অনাবৃষ্টির সময় আকাশে বৃষ্টির একটা নকল তুলতে পারলেই বৃষ্টি হবে। নৃতত্ত্ববিদেরা তাই বলছেন, জাদু বিশ্বাসের মূল কথা প্রার্থনা-উপাসনা নয়, ভগবানের কাছে আবেদন নিবেদন কবা নয়, তার বদলে নানারকম আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে আনবার—আয়ত্ত করবার কল্পনাই।"[১৮]

"কিন্তু উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতির ফলে আদিম যৌথ জীবনের অবসান হলে ও জাদু বিশ্বাসেব রেশ সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় না; কিন্তু তখন তার আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আদিম যাদুবিদ্যা ক্রমশই শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত শাসক-শ্রেণীর গুহ্যবিদ্যায রূপান্তরিত হয় এবং ক্রমশই তা পুরোহিত শ্রেণীর অলৌকিক শক্তি বলে প্রচাবিত হয়।"[১৯] এইভাবে দেখা যায় ঋগ্বেদের মোট ১০২৮টি সূক্তের মধ্যে মাত্র ১২টির সঙ্গে জাদুর সম্পর্ক। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে গদ্য অংশ বিশেষ করে যজুর্বেদ, অথর্ববেদে ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীতে রহস্যময়তা ও প্রাধান্য পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত হতে হতে শাসক শ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

এই পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধির জন্য আর একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। "আমরা পরে দেখব পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগেই রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার উদ্ভব হয়েছে। ধর্ম ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। পুরাতন আমলের দেবদেবীরা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিরা, দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁদের জায়গায় নূতন দেবতা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন প্রজাপতি। ইনি স্রষ্টা এবং সকলের প্রভু, মর্তের রাজার আদেশেই যেন কল্পিত, এবং রাজারাও উপাধি নিতেন প্রজা-পতি। একেশ্বরবাদের ও উদ্ভব।

এই যুগ থেকে, এবং তারই চরম পরিণতি উপনিষদের ব্রহ্ম-কল্পনা, সেই এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। যজ্ঞব্যবস্থার ক্ষেত্রে ও ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ প্রকটিত হয়েছিল। উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতির ফলে আদিম যৌথ জীবনের অবসান হলেও জাদু বিশ্বাসের রেস সম্পূর্ণ মুছে যায় না। কিন্তু তার আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসতি হয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে আদিম জাদু বিদ্যা ক্রমশই সুবিধাভোগী শ্রেণীর গুহ্যবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়, তা পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি বলে প্রচারিত হয়। বৈদিক যজ্ঞের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। এখন যজ্ঞের হোতা আর যজমান নয়। একটি বিশেষ পুরোহিত শ্রেণী—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—যারা অর্থের বিনিময়েই যজমানের হয়ে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করত। পুরোনো আমলের সাদামাটা যজ্ঞ উঠে গিয়েছিল, তার জায়গায় এসেছিল বিরাট বিরাট ব্যয়বহুল যজ্ঞ—অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, পুরুষমেধ ইত্যাদি—যেগুলি রাজা বা প্রচণ্ড ধনী ছাড়া বাকি সকলের সাধ্যের অতীত ছিল।"[২০]

সমাজ কাঠামোর এই পরিবর্তনই উপরিকাঠামোর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। বৈদিক সাহিত্য তাই রাজশাসনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সংগৃহীত। তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ উপনিষদ উদ্ধৃত দেবাসুর সংগ্রাম ও দেবগণের সঙ্কল্প। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। একথা ও উল্লেখ করেছি ভারতবর্ষের সর্বত্র একই প্রকার প্রশাসন প্রচলিত ছিল না। বিরাট ভূখণ্ড, ভারতবর্ষের বৈচিত্রময় অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশ। পৃথিবীর যেখানে যতরকম পরিবেশ আছে তার সবটুকুই ভারতবর্ষের কোন না কোন জায়গায় বর্তমান। নদ-নদী পাহাড়-পর্বতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এর অবয়ব। ফলে বিচিত্র রীতি প্রকৃতির সমাবেশ এই ভারতবর্ষে। তবে সকল কিছু ছাপিয়ে দেবশাসন যে প্রাধান্য লাভ করেছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। অসুর শাসন কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত থাকলেও ঐতিহাসিক নিয়মে তারা শাসক শ্রেণী হিসেবে টিকে থাকতে পারে নি। ফলে সামাজিক প্রেক্ষাপটের লড়াই, সংস্কৃতি জগতের লড়াইতে পর্যবসতি হয়। ভূখণ্ড দখলের সংগ্রামের পাশাপাশি ভাবজগতে আধিপত্য দখলের লড়াই ও সমানভাবে চলছিল। স্বভাবতই শাসক সংস্কৃতি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এই দেবশাসনেই বেদ সংগৃহীত। ফলে বৈদিক সাহিত্য সংগ্রহকারী পণ্ডিতগণ যে দেব ভাবাদর্শ প্রবণ ছিলেন একথা সোচ্চারে উল্লেখিত না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বৈদিক যুগে দেখি রাজা পুরোহিতদের মুক্ত হস্তে দান করতেন[২১] ভূমি, স্বর্ণ, ক্রীতদাস, বৃষ, গাভী, অশ্ব ইত্যাদি। পরিণামে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দানস্তুতিমূলক

রচনায় দেবতার মহিমাকীর্ত্তনের সঙ্গে রাজাকে দেবতার প্রতিনিধি করে রাজার গৌরব গাথা কীর্ত্তিত করতেন। এই সকল রাজগুণগান সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এতে সন্তুষ্ট রাজা শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানচর্চায় অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ করায়ত্ব করার জন্য ক্রমে রাষ্ট্র উপদেষ্টার আসনে বৃত করেন। প্রশাসনিক সাহায্যপুষ্ট ব্রাহ্মণগন বশীভূত হয়ে রাজনির্দেশ প্রতিপালনকে অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলে স্থির করতে থাকেন। রাজা পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে ভাবজগতে প্রাধান্য বিস্তারের উপায় খুঁজতে থাকেন। সেই উপায়ই হলো এই বৈদিক সংগ্রহ।

সংরক্ষিত বৈদিক সাহিত্য অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন পারম্পর্যরহিত। একথাই প্রমাণ করে সমাজে প্রচলিত সকল কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় নি। বৈদিক সাহিত্য তাই আংশিক সংগ্রহ। অবশ্য এমন যুক্তিও দেখানো যেতে পারে পরি-বেশগত কারণে সার্বিক সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখিত উদ্ধৃতি থেকে এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করে না। যে কারণেই হোক একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে বিশাল সৃষ্টির অনেকাংশই সংগ্রহের বাইরে কেবলমাত্র তার কিছু কিছু অংশই ধরে রাখা হয়েছে। আর তা ধরে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণতই কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অনুশাসনে।

এখন প্রশ্ন তবে কি বৈদিক সংগ্রহ থেকে সেই সময়ের প্রচলিত দ্বন্দ্বমুখর বিরুদ্ধ সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বাইরে রাখা হয়েছে? তা কখনোই সম্ভব নয়। আলো বোঝাতে যেমন অন্ধকারের, তেমনি অন্ধকার বোঝাতে আলোর তুলনা প্রয়োজন। যে সংস্কৃতি জনগণকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত তাকে উপড়ে ফেলা কিভাবে সম্ভব? বরং যেটা করা যায় তা হলো দূষণ ঘটানো। আর দূষণ ঘটানো তখনই সম্ভব যখন যাতে দূষণ ঘটানো দরকার তাকে তুলে ধরা। বৈদিক সাহিত্য সংগ্রহের ধারায় সেই ঘটনাই ঘটেছে। আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ তুলে ধরতে পারি। আত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে মৈত্রেয়ীকে[২২] যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই উদ্দালক প্রতিষ্ঠিত লোকায়ত মতকেই হুবহু তুলে ধরেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। এ ছাড়া ও একটা ব্যাপার তো রয়েছেই। সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত পণ্ডিতগণ যতই কর্তৃপক্ষ পুষ্ট হোন না কেন তাঁরা ও সমাজভুক্ত মানুষ। সমাজ দ্বন্দ্ব তাঁদেরকেও অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। রক্তে, চেতনায় চারিয়ে থাকা দ্বন্দ্ব শাসন-অনুশাসনের বেড়াজাল মানে না। মানতে পারে না। কেননা নৈমিত্তিক ব্যবহার্য সমাজ মানুষই যোগান দেয়। ভাষা-ভাব, আহার-

বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সমাজ মানুষের দান। ফলে তাদের দেওয়া বোধ-ভাবনা নানাভাবে ইংগীতের আকারে হলেও স্থান করে নিয়েছে। হাজার হাজার বছর পরেও ইংগীতময়তা, দূষণ সংযোজিত ভাষা-ভাব থেকে কেউ না কেউ দ্বন্দ্ব মুখর মুহূর্ত্তকে আলোচনার বিষয় করে তুলতে পারে। বর্তমান গ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেনই বা নিজের ঘাড়কে এত শক্ত পোক্ত ভাবব। আমি কি বিভিন্ন চিন্তাবিদদের দৃষ্টি এখানে তুলে ধরতে পারি না! এই মুহূর্ত্তে অধ্যাপক হিরিয়ানার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা যায়।[২৩] অধ্যাপক হিরিয়ানার মতে বৈদিক মন্ত্রগুলি সংগ্রহের পূর্বে যুগের পর যুগ ভাসমান অবস্থায় ছিল। আর একথাই প্রমাণ করে যে তাদের কিছু কিছু অবশ্যই হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত যখন সংগৃহীত হলো নিশ্চয়ই প্রচলিত সবগুলিই নথিভুক্ত হয় নি। বরং পরিষ্কার করে বলা যায় যেগুলির সঙ্গে যাগযজ্ঞের প্রতক্ষ্য সম্পর্ক ছিল সেগুলিই সংরক্ষিত হয়েছে। অতএব সংগৃহীত এই সব তথ্য থেকে যা কিছুই পাওয়া গেছে তা অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং একপেশে। অধ্যাপক হিরিয়ানার[২৪] গবেষণায় এও ধরা পড়েছে যে সেই সময়ে সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হয়ে গেছে। আর যে শ্রেণী ক্ষমতায় ছিল তাদেরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংগ্রহের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। ফলে এটাই স্বাভাবিক যে, যে শ্রেণীর দ্বারা তখন এই কাজ সুসম্পন্ন হয়েছিল তারা নিশ্চয়ই ভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাকে সাদরে বরণ করার মতো মানসিকতায় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিন্ন শ্রেণীর চিন্তা ও আদর্শ কোনমতে রোখা যায় নি। সূক্ষ্ম অলি গলি পথ করে নিয়ে থেকে গেছে। বিপরীতের দ্বন্দ্বকে কখনো এড়ানো যায় না। যায় নি ও। তাই ক্ষমতাসীন শ্রেণীর আদর্শের পাশাপাশি ক্ষমতাহীন শ্রেণীর আদর্শ স্বাভাবিক কারণেই এসেছে। অধ্যাপক হিরিয়ানা ভিন্ন গ্রন্থে বলেছেন বেদে যেমন যাগযজ্ঞের আদর্শ ও শিক্ষা পাই, তেমনই পাই প্রতিবাদী আদর্শ ও শিক্ষার ইংগিত, যা সেই সময় সমানভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল।

বৈদিক সাহিত্য যে সংগ্রহ এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। এই সংগ্রহের পূর্বে লোকমুখে ছন্দের আকারে প্রচলিত ছিল এ বিষয়েও চিন্তাবিদগণ এক মত। এখন প্রশ্ন এই বৈদিক সাহিত্য কিভাবে উদ্ভব হয়েছিল? সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ এটুকু উপলব্ধি করতে পারছিল যে তাদেরকে বাঁচতে হলে প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করেই বাঁচতে হবে। কিন্তু সব সময়ই প্রাকৃতিক শক্তিকে রোখা সম্ভব হয় নি। সেই সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভাবনাপ্রবণ করে তুলত। কখনো প্রাকৃতিক শক্তির সাথে সমঝোতা করে কখনো বা রুখে

দাঁড়িয়ে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে তারা অজের অজানা প্রকৃতিকে নিয়ে কথনো শ্রদ্ধায়, কথনো প্রতিবাদের, কথনো বিস্ময়ের, কথনো সম্ভ্রমের প্রতিবেদন হিসেবে ভাষা-শৈলী প্রকাশ করে ফেলতে থাকে। প্রেমের, শ্রদ্ধার, সম্ভ্রমের সংগীতই হলো এই সকল ছন্দোবদ্ধ গীত, মন্ত্র। তার তা যৌথভাবে গীত হতো। সঞ্জিবনী হিসেব এই সব মন্ত্র কাজ করতো। তাই জাগর থাকতো মুখে মুখে। সেই সকল মন্ত্রেরই প্রক্ষিপ্ত অংশ সংরক্ষিত হয়েছে বেদে।

বেদ চার ভাগে বিভক্ত। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। তাদের আবার চার চারটি করে প্রতিবিভাগ আছে। যথাক্রমে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এরা পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত। একে অপরের পথ প্রস্তুতির দিক চিহ্ন। সংহিতায় সংগৃহীত মন্ত্র প্রকৃতি সংক্রান্ত সংগীত হিসেবে প্রচলিত। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পরিবর্তমান বস্তুরাজিই পৃথিবীর সত্তা। পার্থিব সম্পদ কামনাই এই সকল মন্ত্রের মূল কথা। ঋগ্বেদের মন্ত্রেই উল্লেখিত মুখে মুখে ছন্দ রচনা কর, মেঘ যেমন বিস্তারিত হয়ে পরিমণ্ডল ছেয়ে ফেলে তেমনই বিস্তারিত কর তোমার গায়ত্রী ছন্দ, উকৃথ্য গান কর।[২৫] এখানে ছন্দের সঙ্গে মেঘের সাযুজ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বৃষ্টি, শস্য সৃষ্টির অন্যতম উৎস। জীবনধারণের উৎস। সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়ে বার বার এ জাতীয় কামনাই স্থান পেয়েছে। এই সকল মন্ত্রে অন্নকামনা, পশুর কামনা ধন, বল, বীর্যের কামনাই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু উত্তরোত্তর সভ্যতার ক্রমবিকাশ, সম্পত্তির হস্তান্তর, স্থানান্তরকরণ পরিবেশগত পরিবর্তন এই প্রকৃতি সংক্রান্ত দর্শনকে বাধ্য করে অতি প্রাকৃত শাস্ত্র অন্বেষণ করতে। এই ঘটনা যে সকলেই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। কোন কোন কবি এই নতুন পরিস্থিতিকে অভিসম্পাত করেছেন। একজন আধুনিক গবেষকের ভাষায়[২৬] "মানব চেতনা সমাজ নিরপেক্ষ নয়—বৈদিক কবিদের চেতনাও নয়। এই মূল সূত্র অনুসারে অগ্রসর হয়ে বৈদিক সমাজ ইতিহাসের মধ্যেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অন্যান্য আদিম মানুষের মতোই বৈদিক কবিরা ও আদিতে যৌথ জীবন-যাপন করতেন; তখন তাঁদের সমাজ সংগঠন প্রাক্‌বিভক্ত বা আদিম সাম্যসমাজ। এই পর্যায়ের চেতনাই ঋতে-র পরিকল্পনায় প্রতিফলিত। কিন্তু কালক্রমে—বিশেষত যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক কীর্তির প্রাধান্য ফলে—সেই আদিম সাম্য সংগঠন ধূলিসাৎ হয় এবং তারই ধ্বংসস্তূপের উপর আবির্ভূত হয় ব্রাহ্মণ সমর্থিত, ক্ষত্রিয়

শাসিত, সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। স্বভাবতই ঋত-র চেতনাও ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়।"

ঋগ্বেদে কবি কুৎস এর নাম পাওয়া যায়। যাঁর সম্পর্কে কথিত আছে এমনকি ইন্দ্রকে পর্যন্ত যিনি বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর ক্ষোভ থেকে বোঝা যায় তিনি এই পবিবর্তন নিয়ে ভাবিত ছিলেন।[২৭] ক্ব ঋতং পূর্ব্বং গতম? পূর্বের সেই ঋত কোথায় গেল? ব্রুবীতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তম্। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি নতুন করে ঋতর জন্ম হোক। এই উক্তির মধ্য দিয়ে ঋতর প্রাচীন ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘোষিত হয়েছে। কবি সেই অতীতের যৌথ জীবনকেই ফিরে পেতে আগ্রহী।[২৮] কেননা বর্তমান ঋতর ব্যাখ্যা বিকৃত। যৌথ জীবনের সতঃস্ফূর্ত নিমানুবর্তিতার চেতনা যে ঋত, সেই ঋত আজ কলঙ্কিত। কারণ আদিম যৌথজীবন সমবেত শ্রম নির্ভর। চিন্তা ও শ্রম, জ্ঞান ও কর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের পরিবর্তে অন্য অকল্পনীয়, অন্ধ, খঞ্জ। তাই আদিম প্রাক-বিভক্ত বৈদিক সমাজে জ্ঞান ও কর্ম অভিন্ন! কিন্তু শ্রেণী সমাজ উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নিন্দিত হতে থাকে শ্রম। শ্রম নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রশংসিত হতে থাকলো। তাই পরবর্তি পর্যায়ে উপনিষদ গন্থে ক্রিয়া নিন্দিত, অক্রিয়া অভিনন্দিত। কর্ম ঘোষিত হয়—ঘৃণিতদের আশ্রয় স্থল। বিশুদ্ধ জ্ঞান গৌরবান্বিত হয় অবসর যাপনকারীদের চর্চার তীর্থক্ষেত্র হিসেবে।

কালে কালে প্রকৃতি অন্তর্হিত হতে থাকে। দেবতাদের কেন্দ্র বদল তরান্বিত হয় তিন দেবতা দৌ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী বেড়ে তেত্রিশ এ দাঁড়ায়।[২৯] কিন্তু দেব গরিমা বৃদ্ধি থেমে থাকে না, তা বাডতে বাড়তে একসময় গিয়ে দাঁড়ায় তিন হাজার তিনশ উনচল্লিশ এ।[৩০] কিন্তু ঋগ্বেদের একটি ঋক্ এ মাত্র তিন দেবতার স্তুতি লক্ষ্য করা যায়।[৩১] দৌ, দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা সূর্য, অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা বায়ু, এবং পৃথিবীর দেবতা অগ্নি। এমনকি যাস্কাচার্য নিরুক্ত গ্রন্থে মাত্র তিন দেবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে যাজ্ঞিক সম্প্রদায়কে দেখা যায় অসংখ্য দেবতার কথা বলতে। তাঁদের মতে যত নাম তত সংখ্যা হল দেবতার। কিন্তু কালক্রমে সেই ধারণার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। অসংখ্য দেবতার তত্ত্ব রূপান্তরিত হতে থাকে একেশ্বর বাদে। এই একেশ্বরবাদ শেষ পর্যন্ত আত্মবিদদের প্রচেষ্টায় পরমাত্মা পরমেশ্বরে এসে স্থিতু হয়। আত্মবিদদের মতে এক মহান অতীন্দ্রিয় আত্মাই বিভিন্ন আকৃতিতে, প্রকৃতিতে আবির্ভূত এবং স্তুত হন। এই অসংখ্য দেবদেবী

সেই মহান আত্মারই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদে প্রায় এই ধরণের অদ্বিতীয় সত্তার আভাস পরিস্ফুট নেই। বহু কবির রচনায় সমৃদ্ধ ঋগ্বেদে বহু দেবতার স্তুতিই বিশেষ ভাবে চিহ্নিত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঋগ্বেদ একজনের বা এককালের রচনা নয়। সুদীর্ঘ-কালের যাত্রাপথে মানবসমাজ বিশেষ করে অগ্রণী চিন্তার সূত্রধর বহু কবি অভিজ্ঞতার দিক চিহ্ন রেখেছেন ছন্দের মাধ্যমে মন্ত্রের আকারে। কিন্তু বেদের প্রাতিবিভাগ পর্যায়ে ক্রমত্তোরণের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদ আত্মবাদে ঠাঁই করে নিয়েছে। এইভাবে দেখা যায় সংহিতায় সংগৃহীত মন্ত্র প্রকৃতি সংক্রান্ত সংগীত হিসেবে পরিচিত হলেও এই সকল মন্ত্র কালে কালে যাগ-যজ্ঞাদির প্রথার সঙ্গে লীন হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদির ক্রমবিবর্তন ঘটতে থাকে। গোষ্ঠী কামনা সফল করার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ, তা যজমান কামনায় পর্যায়ে উন্নীত হতে হতে রাজতন্ত্র লালিত হয়ে বিরাট বিরাট ব্যয়বহুল যজ্ঞে রূপান্তরিত হয়। আর ব্রাহ্মণ পর্ব সমৃদ্ধ হয় এই যাগ-যজ্ঞাদির বিশদ বিবরণ হিসেবে। আরও চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ঘটে এই ব্রাহ্মণ অংশেই। আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব যাগ-যজ্ঞাদি দেবতা ও যজমানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পুরোহিতকে কেন্দ্র করে ক্রমশই অলৌকিক রহস্যাবৃত হতে দেখা যায়। আরণ্যক পর্যায়ে পুরোহিত তন্ত্র প্রকটতর হতে থাকে। পুরোহিত সম্প্রদায় যাদুবিদ্যাকে জনচিত্তজয়ের হাতিয়ার করে। যজ্ঞবিদ্যা উপেক্ষিত হতে শুরু করে। সংহিতার প্রকৃতি দেবতার পূজা ক্রমশই নৈসর্গিক কল্পনায় পর্যবসিত হয়। রহস্য শিক্ষা অবাস্তবতাকে প্রধান অবলম্বন করে আরণ্যক অংশে। এইভাবে যাদুবিদ্যা যা ছিল সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত বিজ্ঞান চিন্তার প্রকাশ তা আরণ্যক পর্যায়ে দার্শনিক জল্পনা কল্পনার পথ প্রস্তুতিতে সাহায্য করে বিশেষ করে বৌদ্ধিক সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে। যার পরিণতি দেখা যায় উপনিষদে। দার্শনিক পরিকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয় উপনিষদে। চরম সত্তার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে নিরলস পরীক্ষা নিরীক্ষায় একটি রীতি পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়াস উপনিষদেই চরম ভাবে প্রকটিত। বিশেষ করে আত্মাকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ বিতর্ক ছিল তা সূচীমুখ লাভ করে রহস্যাবৃত অধিবাস্তবতায়। আর অধিবাস্তব আত্মতত্ত্বের মধ্যে সকল সঙ্কট ও সমস্যা সমাধানের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্ভূত হয় ব্রহ্মতত্ত্ব। শুরু হয় আত্মণ্-ব্রহ্মণ্ একীকরণের প্রাণান্তকর প্রয়াস। তা সুপ্রযুক্ত কিনা বিচার্য বিষয় হলেও উপনিষদে যে তা বহুলাংশে সফল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আত্মণ্ ও ব্রহ্মণ্‌কে একই আসনে বসিয়ে ঘোষণা করা

হয় আত্মণ-ব্রহ্মণই চূড়ান্ত সত্তা।

এই আত্ম জিজ্ঞাসাই সামাজিক সংঘাতকে তীব্রতর করে তোলে। পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিরোধটা প্রথমে দানা বাঁধে। দ্বন্দ্বটা শুরু হয় প্রাচীন ও নবীনের প্রচলিত ও বিশুদ্ধতার সমর্থকদের মধ্যে। প্রাচীনদের পরিতৃপ্তি সেই সময়ের বাস্তব অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রাখার। আর নবীনদের পরিতৃপ্তি অধিবাস্তব সত্তার অনুসন্ধানে বৌদ্ধিক চর্চায়। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটও ইতিমধ্যে বদলাতে শুরু করেছে। সামাজিক শক্তির পুনর্বিন্যাস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিরোধে নিহিত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশুদ্ধবাদীরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলে। ক্ষত্রিয়রা এই সময় সদ্য উদ্ভূত শাসক শ্রেণীর মর্যাদায় ভূষিত। যাগ-যজ্ঞাদি সর্বস্বতা পেছনে ফেলে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় নতুনের বার্তাবহরূপে দেখা দিয়েছে। উপনিষদ হলো এই সময়ের সংগৃহীত উপাদান। উপনিষদে দুই বিবদমান সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত। দুটি বিশেষ নামে পরিচিত যথাক্রমে কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ হিসেবে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায়[৩২] প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণ উপনিষদকে বৈদিক সাহিত্যের ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পথকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে শ্রদ্ধাশীল। একটি কর্মমার্গ, ভিন্নটি জ্ঞানমার্গ।

এইভাবে সংহিতা বা মন্ত্রপর্বে যে প্রকৃতিদেবতার স্তুতি বিশেষ স্থান দখল করেছিল উপনিষদে এসে তা অধিপ্রাকৃতিক বৌদ্ধিক মননসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশে যা ছিল কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক উপনিষদে তাই হয়ে ওঠে জ্ঞানমার্গ প্রধান। কর্মকাণ্ডকে উপনিষদ পর্যায়ে নিকৃষ্ট বিদ্যা বা অপরাবিদ্যারূপে চিহ্নিত করা হয়। উপনিষদ হলো সেই ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টবিদ্যা বা পরাবিদ্যা।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপনিষদকে বিরোধমুক্ত বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক চিন্তার তীর্থক্ষেত্র রূপে ধরে রাখা যায়নি। তার কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। উপনিষদকে গুপ্ত বিদ্যা পরমাত্মার মুখনিসৃত বাণী ইত্যাদি প্রচার করলেও বর্তমান বিজ্ঞান-মনস্ক বিদ্বান সমাজ লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির সংগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে বেদ হলো জগত ও জীবন সম্পর্কে লোকায়ত জিজ্ঞসার ও সেই সম্পর্কিত বোধের ত্রিবেণী সঙ্গম। বেদ যেমন অপৌরুষেয় পরমাত্মার বাণী নয় তেমনই যতই পরিবর্তন ঘটানো যাক না কেন, পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য ঘটিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হোক না কেন প্রচলিত দ্বন্দ্বের অনিবার্য উপস্থিতি এড়ানো

যায়নি। দাশগুপ্ত বলেছেন[৩৩] উপনিষদে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। সমস্ত আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হয় বাইরে থেকে কোন স্রষ্টার উপর নয় বরং অন্তরাত্মায়। আত্মণ্ ই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এইভাবে যে বেদের সৃষ্টিমুহূর্ত্ত ছিল প্রকৃতি কেন্দ্রিকতা তা পরিবর্তিত হয় আত্মমুখীনতার কেন্দ্রবিন্দুতে। রাধাকৃষ্ণণ[৩৪] এই পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে বলেছেন আমরা যখন বৈদিক সংহিতার থেকে উপনিষদে প্রবেশ করি তখন আমরা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি। সেই পরিবর্তন হলো বিষয়মুখীনতার থেকে আত্মমুখীনতায় বিস্ময়কর বহির্জগতের প্রতি গভীর চিন্তমগ্নতা থেকে ধ্যানী আত্মমগ্নতায়। বস্তুত আত্ম-বিশ্লেষণই এখানে যাবৎ প্রকৃতিরহস্য সমাধানের মূল সূত্র।

দাশগুপ্ত ও রাধাকৃষ্ণণের এই পরিতৃপ্তিবোধ বেদান্ততত্ত্বকে দ্বন্দ্বমুক্ত প্রতিষ্ঠা দিতে সমর্থ হয় নি। তাঁদের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যতা উঁকি দিয়ে ফেলেছে। যত সচেতনভাবেই সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব এর সত্যতাকে আড়াল করতে চেষ্টা করুন না কেন সমাজে শ্রেণীর উদ্ভববশতঃ যে এই স্বার্থের স্থানান্তর-করণ তা চাপা দেবেন কি করে? জগত বিশ্লেষণে কেন্দ্রবিন্দুর এই তারতম্যের মূল হলো আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তারতম্য। যার ফলশ্রুতি প্রকৃতি দর্শনের রূপান্তর দর্শনের প্রকৃতিতে। বস্তু দর্শনের প্রক্রিয়া সম্মুখীন হয় বিশুদ্ধ চিন্তার দর্শনের প্রক্রিয়ায়। পরিকাঠামোর লড়াই উপরিকাঠামোর লড়াইতে তৃপ্তি খোঁজে। প্রকৃতি দর্শনের প্রকৃতি জিজ্ঞাসা প্রকৃতি নির্লিপ্ত ধ্যান মননে দর্শনের প্রকৃতি অন্বেষণে চরম উৎকর্ষ খুঁজে পায়। নবীনতম ব্যাখ্যায় সমুন্নত হয় দর্শন চিন্তা। আর এই দর্শন চিন্তা চর্চা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীর অবসর যাপনের মুহূর্ত্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। বস্তুজগত নির্লিপ্ত স্বকপোল কল্পিত ধ্যানলোকই এই উন্নত দর্শন চর্চার একমাত্র তীর্থক্ষেত্র। এই ধ্যানলোক একান্তই ব্যক্তিগত আত্মলোক। এইভাবে দর্শন চিন্তার জগতে সীমারেখা তৈরী হয়ে যায়। একদিকে বস্তুতন্ত্র, অপরদিকে কর্তৃতন্ত্র। এইভাবে দেখা যায় প্রকৃতি সংক্রান্ত বস্তুতান্ত্রিক দর্শন কর্তৃতন্ত্র প্রভাবিত চিন্তানায়কদের হাতে পড়ে বস্তুজগৎ নস্যাৎকারী বিশুদ্ধ চিন্তার দর্শনের আঙ্গিকে আত্মমনন সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক দর্শনের মুখোমুখি হয়। উপরিকাঠামোর এই পরিবর্তন সহসা কোন উদ্ভট ঘটনা নয়। এর ভিত্তি হল সমাজ কাঠামোর চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় শুচিমুখ পেয়েছিল তার আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা দরকার।

'এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপনিষদের আবির্ভাব, বেদ বিরোধী একান্ত

মননসর্বস্ব ব্যক্তিগত দর্শন হিসেবে। পরিকাঠামোয় তখন পুরোহিত তন্ত্রের দাপট। এক শ্রেণীর পুরোহিত গেল গেল রব তুলে যাগযজ্ঞসর্বস্ব আচার অনুষ্ঠানকে প্রধানভাবে আঁকড়ে ধরল। অশিক্ষা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে মূলধন করে পুরোহিত সম্প্রদায় দিনের পর দিন যাগযজ্ঞের গোঁড়ামি বাড়াতে থাকল। সমাজের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ালো তারা। একের পর এক অনুশাসন জারি করে তা অবশ্য-পালন সুনিশ্চিত করলো। চণ্ড পুরোহিত শাসন সমাজজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। যাগযজ্ঞের সংস্কৃতি তার সহজিয়া ঢং হারিয়ে পরিণত হল প্রথাবদ্ধ নিগড় হিসেবে। স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিপ্সা সমাজদেহকে বিষিয়ে তুলল। যাগযজ্ঞাদির মূল্য হ্রাস পেতে পেতে ফাঁকা নিয়মতান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শাসন-শোষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালো। কিভাবে কিসের প্রয়োজনে সেই যুগে এই সবের উদ্ভব হয়েছিল আগামী দিনের ঐতিহাসিক গবেষণায় স্পষ্ট হবে। কিন্তু টনা যা তা হলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের খবরদারী শাসনকে কব্জা করায় ক্ষত্রিয় শাসক ও পুরোহিতদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। পুরোহিতদের এইভাবে বাড়তে দিলে ক্ষত্রিয় শাসন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় অন্তর্দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। পুরোহিত সম্প্রদায় যাগযজ্ঞাদির সংস্কৃতি রক্ষায় মরীয়া। যে কোন মূল্যে বৈদিক ধর্ম রক্ষা চাই। কেবলমাত্র পুরোহিত সম্প্রদায়ই বেদের স্বাধর্ম রক্ষা করতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ চিন্তানায়কগণ ও লোক সাধারণ সমানভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ভালো চোখে নেয় নি। ভেতর ভেতর উসখুস করছিল। প্রশাসন থেকে এই বিদ্রোহে যে দ্বন্দ্বের সুযোগ সৃষ্টি হল লোক সাধারণ ফুঁসে উঠল। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। সমাজে ঝড় ওঠে কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলশ্রুতি যাতে বিপথগামী না হয় সেই প্রচেষ্টাই উপনিষদের উদ্ভবের মুহূর্ত। উপনিষদ ক্ষত্রিয় জাগরণের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এ বিষয়ে আধুনিক বিদ্বান অধ্যাপক দাশগুপ্তের[৩৫] মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উপনিষদের বিভিন্ন কাহিনী থেকে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় প্রতিনিধির কাছে গিয়ে দর্শনের শ্রেষ্ঠজ্ঞান ভিক্ষা করছে। এ থেকে অনুমিত হয় বিশুদ্ধ দর্শন চিন্তা ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই প্রচলিত ছিল যা উপনিষদ দর্শনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব স্বভাবতই ক্ষত্রিয়দের হাতে যায়। পুরোহিত সম্প্রদায়ের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রচারে সংগঠিত প্রশাসন যোগ দেওয়ায় সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেখানে। বর্ণাশ্রমের বলি শূদ্র-সমাজ ক্ষত্রিয় প্রচারে প্রভাবিত হয়। প্রশাসন

থেকেই যখন বলতে শোনা যায় যাগযজ্ঞ তাদের জীবনে কোন উপকার সাধন করতে পারেনি, পারবেও না। বরং এর ফলে পুরোহিততন্ত্রেরই লাভ ষোল আনা। লোক সাধারণের এর থেকে কিছুই পাওয়ার নেই বরং সর্বনাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। গণঅভ্যুত্থানের ফলে পুরোহিততন্ত্রের অন্তিম ঘণ্টাধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প চিন্তাভাবনা শুরু হয় ক্ষত্রিয় প্রশাসনে। এই গণ অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করতে চাই অভিনব সংস্কৃতি। যাগ-যজ্ঞাদি নিন্দা অভিপ্রেত, কিন্তু বরণীয় উপাসনা কী? এর উত্তরে বলা হল আত্ম উপাসনাই একমাত্র মুক্তি। যাগ-যজ্ঞের কুহক নয় আত্ম অন্বেষণ কর। ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে নিজেকে জানলেই আত্মাকে জানা যাবে। আত্মাকে জানলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের উপলব্ধি ঘটবে। এই সংস্কৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাধারণের ক্ষোভ বিক্ষোভের পরিমিতির কথা চিন্তা করে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় জনচিত্তজয়ের আশায় যাগ-যজ্ঞের ক্রিয়াদির বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে থাকল। যেন এক পরিবর্তনের পদধ্বনি লোক সাধারণের হৃদয়তন্ত্রে সুবহ সংগীত হয়ে ধরা দিল। এই প্রতিক্রিয়া ক্রমেই উৎসাহিত করল ক্ষত্রিয়দের। তারা ও চড়া পর্যায়ে তাদের উচ্চারণ শাণিত করল। উপনিষদ থেকে এমনি কিছু কিছু উচ্চারণ তুলে ধরলে বিষয়টির উপলব্ধি সহজ হবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে[৩৬] উদ্‌গীথ উচ্চারণকারীদের মানুষের অধম ইতর প্রাণী কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র যারা উচ্চারণ করে নেহাতই তাদের পার্থিব ভোগ-পান লিপ্সার জন্য। এই সকল ইতর প্রাণীই করে থাকে। মানুষ তো চিন্তাশীল প্রাণী তারা কেন মনুষ্যেতর প্রাণীর সদৃশ আচরণ করবে। প্রথম অধ্যাযের দ্বাদশ খণ্ডে প্রথম পাদে বলা হচ্ছে—অথাত শৌব উদ্‌গীথঃ। অনন্তর কুক্কুর কর্তৃক উদ্‌গীথ গীত হচ্ছে। তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যচুরন্নং নো ভগবানা গায়ত্বশনায়াম বা ইতি। তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য একটি শ্বেত কুকুর আবির্ভূত হল। অপরাপর কুকুরেরা ঘিরে ধরে বলল, মহাশয় আমাদের জন্য সামগান করুন। আমরা যাতে খাদ্য পাই। আমরা ক্ষুধার্ত।—তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তখন শ্বেত কুকুর তাদেরকে বললে, 'সকালে এই জায়গায়ই আমার কাছে এসো'। তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমানাং সংরব্ধাঃ সর্পন্তি ইতি এবং আসসৃপুঃ তে। যজ্ঞে যেরূপ বহিষ্পবমান স্তোত্র গান করতে করতে স্তবকারীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পরিক্রমা করে, এই কুকুরেরাও সেইরূপ করতে লাগল।

এই উদাহরণ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে বেদ বিহিত কর্মপদ্ধতি ঘৃণ্য। যারা বেদ

বিহিত যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করে তারা নিম্ন শ্রেণীর জীব। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কেবল খাওয়া পরা নৈমিত্তিক পার্থিব প্রক্রিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কেন শুধু এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে? অন্নপান প্রার্থনা কেবল ইহজগতের মধ্যে মানুষকে বেঁধে রাখে। অন্নপান প্রার্থনায় কেবল ভোগলালসা প্রতিবর্ধিত হয়। সেখানে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিরূপ বিশুদ্ধ চিন্তা চেতনার উন্মেষ সম্ভব নয়। এইভাবে ইতর প্রাণী কুকুরের উল্লেখ করে বৈদিক পার্থিব প্রার্থনাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদও ব্যতিক্রম নয়। যাগ-যজ্ঞাদির উপাচার অনুষ্ঠান সমানভাবে নিন্দিত। গৃহপালিত প্রাণীই কেবল উদ্‌গান ও পূজা অর্চনা ও ঈশ্বর আরাধনা করে। আর যাগ-যজ্ঞাদি পূজা অর্চনার অর্থই হল পুরোহিত সম্প্রদায়ের জীবনের উপায়ের সুবন্দোবস্ত করা।

মুণ্ডক উপনিষদে আরো স্পষ্ট ভাষায় নিন্দামন্দ ধ্বনিত হয়েছে। ওখানে উল্লেখ আছে[৩৭] যারা যাগ-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডকেই প্রধান বলে পরিতৃপ্তি লাভ করে তারা মূর্খ। যাগ-যজ্ঞাদিকে অথৈ সাগরে ভাসমান ভেলারূপে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে সেখানে শ্রেয় নেই। সেই স্থল বরং অস্থির অনিশ্চিত অকর্মের অধিনিবাস। —প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি। এই যজ্ঞরূপ ভেলা সকল অস্থির যারা অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নিকৃষ্ট কর্ম বিহিত করে তাদের কর্মফলের নিদান সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। কেবল মূর্খই এই সকল কর্মকে শ্রেয়ো লাভের উপায় মনে করে এবং জরামৃত্যু কবলিত হয়ে থাকে। অন্যত্র আরো বলা হয়েছে[৩৮] ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যৎ শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি। অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরা যজ্ঞ ও বাপী-কূপ খননাদি কর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার চেয়ে শ্রেয়ো কোন কিছু জানতে পারে না। তারা পুণ্যকর্ম লব্ধ স্বর্গের উপরিস্থানে থেকেও মনুষ্যলোকে কিংবা তার চেয়েও হীনতর পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখের যা তা হলো যাগ-যজ্ঞাদি চর্চা ও পুষ্করিণী, কূপখনন ইত্যাদি সমাজহিতকর কাজকে একই রূপে নিন্দা মন্দ করা হয়েছে। জ্ঞানরহিত মূর্খ ব্যক্তি সকলই সুখ ও পুণ্য আকাঙ্খায় এই সকল পরহিতকর কাজ করে থাকে। তারা ভ্রান্তভাবে মনে করে এই সকল পরোপকার বৃত্তি মনুষ্যজীবনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ গতি। আত্মজ্ঞান রহিত এই সকল ব্যক্তি দেহকেই মহনীয় রূপে চিন্তা করে ইহলোককেই সুখ সম্পদের আশ্রয়স্থল রূপে পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকেই একমাত্র শ্রেয়ো কাজ মনে

করে। আর যাবজ্জীবন সেই কর্মেই নিমগ্ন থাকে। এই সকল ব্যক্তি মূর্খেরও অধম। ফলে জরামৃত্যু কবলিত হয়ে চিরকাল বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

এখান থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিশুদ্ধ চিন্তার উদ্গাতাগণ যাগযজ্ঞাদি কর্মকে কঠোরভাবে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। বরং দেখা গেছে ঐতিহাসিক কারণেই উপনিষদে শেষ পর্যন্ত যাগযজ্ঞাদি যথাযোগ্য মর্যাদায় মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। নিন্দিত থেকেছে চিরকাল যা তা হলো ইহলোক কেন্দ্রিক পরহিতকর কর্ম সকল। এই ঐতিহাসিক মৈত্রী বন্ধন সাধিত হয় যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ প্রশমিত হয়ে গিয়ে একই প্রশাসনে সংযুক্ত হয়। পরিকাঠামোয় এই মৈত্রী বন্ধন উপরিকাঠামোয় সংস্কৃতির রাখি বন্ধনকে উৎসাহিত করে। জোড়াতালি ঘটতে থাকে সংস্কৃতি জগতে। তার উদাহরণ উপনিষদের সর্বত্র ছড়ানো। এতকালের নিন্দিত যাগযজ্ঞাদি কর্মমার্গ আত্মজ্ঞানের বা জ্ঞানমার্গের সোপান হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরহিতকর কর্মাদি চিহ্নিত হয় পিতৃযান হিসেবে। এই পিতৃযান দেবযানের সহায়ক। কিন্তু চূড়ান্ত স্তরে এই সব অবলুপ্ত হয়ে কেবল বিশুদ্ধ চিন্তার জাগরণ ঘটে। এইভাবে ধীরে ধীরে কর্মমার্গের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের মৈত্রী বন্ধন ঘটানো হয়। কালে কালে আমরা দেখি বহু ঈশ্বর তত্ত্ব ক্ষীয়মান হতে হতে শেষ পর্যন্ত অদ্বৈত তত্ত্বে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৩৯] এর স্পষ্ট উল্লেখ দেখি তিন হাজার তিনশ ছয় জন দেবতার থেকে বিতর্ক শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত একেশ্বর তত্ত্বে গিয়ে শেষ হয়। তাতে দেখা যায় বৈদিক কর্মকাণ্ডই মুমুক্ষু ব্যক্তির মনপ্রস্তুতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এর জন্য উপনিষদে প্রস্তুতিরও কোন ত্রুটি নেই। উপনিষদের ঋষি এই আচার অনুষ্ঠান উপাসনাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে প্রজ্ঞার জ্যোতি অন্তঃ-করণে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। প্রার্থনা ষোড়স উপাচার অনুষ্ঠান পরমার্থলাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম। আর তাকে ক্রমশই উচ্চকিত করে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে এই সকল সত্যনিষ্ঠ আচার অনুষ্ঠান কার্যত অহং পরিবর্তনের প্রধান সহায়। এইভাবে বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় উপনিষদের সর্বত্র। উপনিষদের সংকলকদের বিশেষ মনোযোগ হল বৈদিক উদ্ধৃতিকে কোন না কোনভাবে তুলে ধরে উপনিষদে অদ্বৈতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা। একই ঢিলে দুটি লক্ষ্যকেই সিদ্ধ করা হল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এক বৈদিক ধারা অনুসরণের নজির সৃষ্টি করা আর দুই হল পরমাত্মার একমাত্র অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এখান থেকে এটুকু উপলব্ধি করা যুক্তিযুক্ত নয় যে উপনিষদ তত্ত্ব আসলে বৈদিক ধারারই ফলশ্রুতি। এ

চেষ্টা উপনিষদ সংকলকদের থাকতে পারে কিন্তু পাঠক তা ধরে নেবেন কেন? এ ক্ষেত্রে যেটুকু বলা যায় তা হলো বৈদিক উদ্ধৃতিকে উপনিষদ সংকলক পণ্ডিতগণ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য এই কাজে উপনিষদের চিন্তানায়কগণ যে কেবল বেদকে ব্যবহার করেছেন তা নয় নিজেদের প্রয়োজনে কথনো কথনো লোকায়তবিদদেব সাহায্যও গ্রহণ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে যে বিপদ ঘটতে পারে সেই সচেতনতাও উপনিষদ চিন্তানায়কদের যে ছিল না তা নয়। একরূপ বাধ্য হয়েই এসব করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি থেকেই একথা প্রমাণিত। আর এর ফলে অনিবার্যভাবে যা ঘটার তা ঘটে গেছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের যে মূল দ্বন্দ্ব প্রচলিত ছিল তা সংস্কৃতি জগতকেও করায়ত্ত করে ফেলেছে। কিন্তু এই বিপরীতের দ্বন্দ্বকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ পণ্ডিত আমল দেন নি। কেবল অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকে একমাত্র ধ্যান জ্ঞান করে তদনুরূপ প্রচেষ্টাই অব্যাহত রেখেছেন। এ কালের বিদ্বান হিরিয়ানার উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য।[৪০] তিনি বলেছেন যে এইভাবে সকল প্রকার সামাজিক বিরোধ যেমন অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, জীবন-মৃত্যু, মঙ্গল-অমঙ্গল যা ভেতর ভেতর পরিবর্ধিত হচ্ছিল তা এক সময় এসে অদ্বৈত তত্ত্বে লীন হয়ে যায়।

কিন্তু বেদান্ত পন্থী হিরিয়ানার এই সিদ্ধান্ত তাঁর রচনাতেই অযৌক্তিক প্রমাণিত। তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব উপনিষদে বর্তমান। বাদরায়ণ, শঙ্কর ইত্যাদি যশস্বী চিন্তাধর পরবর্তীকালে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা করেছেন এইমাত্র। কিন্তু উপনিষদের কোথাও এই বিরোধের অবসান ঘটানো কোনভাবেই সম্ভব হয় নি। বিপরীতের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই উপনিষদের সর্বত্র বজায় থেকেছে। যা আজও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে দর্শন চর্চায় ব্যাপৃত হতে উৎসাহ জোগায়। কেবল দর্শনের জগতে তো নয়ই ব্যবহারিক জগতেও অদ্বৈত তত্ত্বকে বিরোধমুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি।

অন্য দিক থেকে উপনিষদ ব্যাখ্যার সুযোগ থেকে গেছে। ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ, উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, নারদ-সনৎকুমার সংবাদ হল বিপরীতের দ্বন্দ্বের মূল্যবান নথি। দেবাসুর সংগ্রাম শাসক শাসিত সংগ্রামকেই কাঠামোর সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করলে দেহাত্মবাদ বনাম আত্মবাদের সংগ্রাম হল উপরিকাঠামোগত সংঘর্ষ। এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব বর্তমান বলেই উপনিষদ পাঠ আজও চিত্তাকর্ষক। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে, হৃদয়বৃত্তিকে নিরন্তর স্পর্শ করে। কোন প্রকার একঘেঁয়েমি আমাদের ক্লান্ত করে না। স্তোত্রের অর্থ নিহিত রস নিত্যনতুনভাবে পাঠককে চিন্তান্বিত করে তোলে। বর্তমান গ্রন্থে সেই বিপরীতের সংঘর্ষকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার দিকে অগ্রসর হব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদের বিবর্তন

ঋগ্‌বেদের সূচনাপর্বে যে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল তারই পরিবর্ধন সূচীমুখ পেল উপনিষদে। বেদের অন্তর্ভাগই উপনিষদ। এই অন্তর্ভাগে এসে বৈদিক ধারাস্রোত নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। প্রচলিত প্রবাহে সংক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তাই উপনিষদের উদ্ভব মুহূর্ত্তই দ্বন্দ্বমুখর বলে চিহ্নিত। এই দ্বন্দ্ব স্বভাবতই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে নবোদ্ভূত ধারণার। এই পর্বে এসে বৈদিক সাহিত্য দুটি স্পষ্ট ভাগে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা এই দুই ভাগের ঐতিহ্য আত্মস্থ করেছে, বলা চলে। মীমাংসা কথার অর্থ বিতর্কিত দ্বন্দ্বের বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এককথায় বিরোধ ভঞ্জন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক কারণেই দ্বন্দ্বের বিরোধ মুক্তি ঘটানো সম্ভব না হাওয়ায় মীমাংসা শব্দটি বিপরীত দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপ নেয়—পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। পূর্ব মীমাংসা কর্মকাণ্ডকে ঘিরে এবং উত্তর মীমাংসা জ্ঞানকাণ্ডকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। বেদের প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রধানত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ড। পার্থিব কামনা বাসনাই এখানে মুখ্য বা প্রধান। বেদের অন্তর্ভাগ জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডই হল প্রকৃত দর্শন। কর্মকাণ্ড হল অ-দর্শন। উপনিষদেই সঠিক অর্থে দর্শনের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্য সেদিক দিয়ে অ দর্শন। উপনিষদে দেখা যায় চিন্তাবিদ্‌গণ দ্বিধাহীন ভাবে বেদের মুখ্য ও বৃহৎ অংশকে তুচ্ছ করে ফেলেছেন। কেননা এই অংশে কেবল পার্থিব কামনা বাসনাই মুখ্য। তথাকথিত অ-দর্শনে এ সবের গুরুত্ব থাকলেও দর্শনের ক্ষেত্রে পার্থিব কামনা বাসনার কোন ঠাঁই নেই। পার্থিব কামনা বাসনাই কর্মকাণ্ডে প্রধান। ঐহিক চিন্তা চেতনায় তা সীমাবদ্ধ। তা দিয়ে বিশুদ্ধ দর্শন চিন্তা কখনোই সম্ভব নয়। এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, উপনিষদের উন্মেষলগ্নই দ্বন্দ্ব মুখর।

কেবল উন্মেষলগ্ন কেন, উপনিষদ শব্দ ঘিরেই তো দ্বন্দ্ব বর্তমান। উপনিষদ কথার অর্থ উপ-নি-সদ্, গুরুর নিকট বসে জ্ঞান আহরণ। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে

গুরুগৃহই ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়। তাই ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতির ইতিহাস শ্রুতিশিক্ষা থেকে শুরু। গুরু শিক্ষা দিতেন, শিষ্য কানে কানে শুনে রপ্ত করত। এই ভাবে যুগের পর যুগ গুরু শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতিশিক্ষা প্রচলিত ছিল। লোক সাধারণই চর্চায় মননে এই শিক্ষা সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে। উচ্চবর্গের লোক সাধারণে পরিব্যাপ্ত বিদ্যা হিসাবে উপনিষদ মুক্ত বিদ্যা। সকলের সমান অধিকার। বিদ্যা মাত্রেই প্রাচীন ভারতে মুক্ত বিদ্যা। কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন রচনা বা সৃষ্টি এ নয়। এ হল সামাজিক সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পদ। লোকসাধারণের মধ্যেই যেহেতু এই শিক্ষা সংস্কৃতি সংরক্ষিত ছিল তাই উপনিষদের লোকায়ত অর্থই সমাদৃত হওয়ার কথা।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা সর্বাংশে গৃহীত নয়। উপনিষদের সহজ ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য বললেন, উপনিষদ কথাটি এসেছে 'সদ' ধাতু থেকে। 'সদ' ধাতুর অর্থ বিনাশ সাধন। অবিদ্যার বিনাশ সাধনও বিদ্যার অনির্বাণ জাগরণই হল উপনিষদ। তাই শঙ্করের মতে উপনিষদ হল গুহ্য বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা। এই বিদ্যা অপৌরুষেয় কেননা কোন পুরুষ বা ব্যক্তির রচনা এ নয়। এ হল পরমেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। যে কেউই এই রহস্য বিদ্যার অধিকারী হতে পারে না। কেবল নির্বাচিত কতিপয়ই এই গোপন বিদ্যা লাভ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত। উপনিষদ তাই মুক্ত বিদ্যা নয়, গুপ্তবিদ্যা। সমষ্টিবিদ্যা নয়, ব্যষ্টিবিদ্যা।

এখান থেকে প্রমাণিত যে এই দর্শনের উন্মেষলগ্ন বিপরীতের দ্বন্দ্বে মুখর। এই দ্বন্দ্ব লোকায়ত বনাম কর্তৃগত। সমষ্টিগত বনাম ব্যষ্টিগত। এই বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য আমরা তৎকালীন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের এখানে উল্লেখ করব। উপনিষদে সেই যুগের যে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস আমরা পাই তা হলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকে নস্যাৎ করে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠাপর্বই উপনিষদ।

এখন প্রশ্ন কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যে একই শাসকশ্রেণীভুক্ত হয়েও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বৈদিক যুগের যে সামাজিক চিত্র পাই তাতে আমরা দেখি প্রশাসনে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও মুখ্য উপদেষ্টার পদ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই অলঙ্কৃত করত। এই প্রসঙ্গে দেবগুরু বৃহস্পতি ও অসুর গুরু শুক্রাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা ও দেবতার মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসেবে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পরিচিত। এই সকল ব্রহ্মিষ্ঠদের প্রার্থনায় প্রীত

হয়ে দেবতাগণ অনুগৃহীত ব্যক্তির, সে তিনি রাজাই হোন বা যজমানই হোন, জয়লাভ সুগম করে দেন। এমনকি 'রাজসূয়' যজ্ঞে, রাজ্য অভিষেক অনুষ্ঠানে ব্রহ্মিষ্ঠ পুরোহিতদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে ঋগ্বেদে[১] ব্রহ্মিষ্ঠদের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত। সেই সময় থেকেই পুরোহিতের ভূমিকা ক্রমশই বেশী বেশী গুরুত্ব পেতে থাকে। রাজা দেবতার প্রতিনিধি হলেও রাজা ও দেবতার মধ্যে পুরোহিতই যেহেতু মধ্যমণি যজমান ও উচ্চস্তরের লোকজন বেশী বেশী পুরোহিত নির্ভর হয়ে পড়তে থাকেন। যজ্ঞস্থল, উপাসনাস্থল ইত্যাদি ক্ষমতার উৎস হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব-অভিলাষ বাড়তে থাকে। একসময় রাজ-প্রশাসন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে গুরুত্ব হারাতে থাকে। আনুষ্ঠানিকতা, কৃত্রিমতা রীতি প্রকৃতিকে গ্রাস করে ফেলতে থাকে। এইভাবে রাজার সঙ্গে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। উভয়ে উভয়ের প্রাধান্য রক্ষার সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক কারণেই উভয়ে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এরই উদাহরণ আমরা বৃহদারণ্যক[২] উপনিষদ থেকে তুলে ধরতে পারি। ব্রহ্মই একা ছিলেন, তিনি শ্রেয়োরূপী ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টি করলেন। এই ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউই নেই। রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ এই জন্যই ক্ষত্রিয়ের নীচে উপবেশন করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণস্বরূপ যশ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণই কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল। তাই রাজসূয় যজ্ঞে রাজা প্রথমে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলেও যজ্ঞের শেষে নিজের উৎপত্তিস্থল ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। যে ব্রাহ্মণকে আহত করে সে নিজের উৎপত্তিস্থলকে অবজ্ঞা করে। ক্রূরস্বভাববশত যদি কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে তো ঘোর পাপে আবদ্ধ হয়। এখানে এই উদ্ধৃতিতে ব্রাহ্মণ জাত্যভিমান যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্বকেও স্বীকার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ জাত্যভিমান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পূর্বে ক্ষত্রিয়াদি সকলজাতি ব্রাহ্মণরূপ একটিমাত্র জাতিতেই নিহিত ছিল। তেমনি রাজসূয় যজ্ঞে রাজা মঞ্চে সমাসীন হলে ঋত্বিককে 'ব্রহ্মন্' বলে আহ্বান করলে, ব্রহ্মিষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গেই বলেন 'হে রাজন' আপনিই ব্রহ্ম। এইভাবে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়েতে অর্পিত হল। তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সাবধান বাণীও উচ্চারিত হয়েছে এই বলে যে উৎপত্তিস্থলকে হিংসা করলে, পাপীয়ান্ রূপে চিহ্নিত হতে হবে। এইভাবে উভয়ে উভয়কে নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চিহ্নিত করে উভয় সম্প্রদায়ে সমন্বয়ী সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনি ধারা উদাহরণ উপনিষদগুলি থেকে আরো তুলে ধরা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই।

নিজ নিজ স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হলেও ক্ষত্রিয় প্রাধান্য ক্রমশই অনস্বীকার্য হয়ে দেখা দেয়।

এখন প্রশ্ন কিভাবে ক্ষত্রিয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল? এর উত্তরে বলা যায় যে সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় শাসন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভাব জগতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য অপ্রতিহত। তখন রাজন্য সম্প্রদায়ই উদ্যোগ নেন বড় বড় বিতর্ক সভার। আর এই সব বিতর্ক সভায় রাজন্যবন্ধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তার করতে। কেন এমন হল? আসলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধে ব্রাহ্মণদের একাংশই পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট বিচার করে ক্ষত্রিয় পক্ষ আগে ভাগেই নিয়েছিলেন। এঁদের রাজকীয় মর্যাদায় বৃত করে এঁদের সহায়তায়ই ক্ষত্রিয় রাজন্য তাঁদের নবোদ্ভূত আদর্শকে রূপায়িত করেছেন। কোন অংশেই ক্ষত্রিয় রাজন্য ব্রাহ্মণদের ন্যূন চিন্তা করেন নি। বরং যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্র উপদেষ্টার আসনে বৃত করেছেন ব্রাহ্মণদেরই। কর্তৃত্ব যাওয়াব পূর্বমুহূর্তে ব্রাহ্মণদের একাংশ ক্ষত্রিয় পক্ষ অবলম্বনকেই তাই শ্রেয় মনে করেছেন। ক্ষত্রিয় রাজন্য ও পরিস্থিতি সঠিক মূল্যায়ন করে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠত্ব দানে কার্পণ্য করেন নি। অবক্ষয়ী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছে রাষ্ট্র উপদেষ্টার পদ আত্মমর্যাদার রক্ষাকবচ বিবেচিত হয়েছিল। এইভাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মৈত্রী বন্ধন শেষপর্যন্ত সমাজ-ইতিহাসের স্তরে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যকেই সূচিত করে। উপনিষদগুলিতে আমরা দেখতে পাই এই কাজে সাহায্য করেছে আত্মবিক্রীত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একাংশই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখি বিতর্ক শুরুর পূর্বমুহূর্তেই উপস্থিত পণ্ডিত সম্প্রদায়কে হতচকিত করে বিজয়ের বরমাল্য পরে নিতে।[৩] রাজা জনক সভায় পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে বললেন, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি স্বর্ণ (মুদ্রাযুক্ত) শৃঙ্গ শোভিত সহস্রগাভী গ্রহণ করুন। উপস্থিত পণ্ডিতগণের কেউই ব্রহ্মজ্ঞ বলে জাহির করার প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বললেন, 'সৌম্য সামশ্রবা, এই গাভীগুলিকে নিয়ে যাও।' এই স্পর্ধা কি রাজন্যপুষ্ট বলে? কেননা রাজন্য আদর্শের অনুমোদিত আদর্শ যাজ্ঞবল্ক্যই কেবল প্রচার করতে পারেন। অপরাপর উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ যথারীতি ক্রুদ্ধ হলেন। বিতর্ক শুরু হল। কে এই যাজ্ঞবল্ক্য? যিনি ঋষি উদ্দালক আরুনির শিষ্য[৪]। কে এই উদ্দালক আরুনি? যিনি বস্তুতন্ত্রের প্রচারক। তাঁরই শিষ্য হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যখন রাজন্য পুষ্ট হয়ে কর্তৃতন্ত্রের প্রচারক হয়ে উঠলেন তখন উদ্দালক বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। তাই দেখা যায় জনক রাজার সভায়

উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে বিতর্কে শিষ্যের ঔদ্ধত্যে উদ্দালককে নীরবতা অবলম্বন করতে। এরপরই আমরা দেখি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে। যার অর্থ হল নবোদ্ভূত ভাবচর্চা ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই প্রথম জাগরিত হয়েছিল। উপনিষদের ছত্রে ছত্রে এইরকম অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আর সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে। বৃহদারণ্যক[৫] উপনিষদের জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের মধ্যদিয়ে এই বিষয় তো ভালোভাবে প্রমাণিত। তেমনই প্রমাণ রয়েছে বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদে[৬]। ছান্দোগ্য উপনিষদেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে নারদ সনৎকুমার সংবাদে[৭]। এইভাবে শাসনে অনুশাসনে ও নিয়ন্ত্রিত্র সংস্কৃতি চর্চায় পরবর্তীকালে ভাবজগতেও ক্ষত্রিয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পর্বেরই এই উপনিষদ সংগ্রহ। এইভাবে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হল আত্মবিক্রীত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সৌজন্যে, তখন দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ক্রমে লোকায়তে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সকল কিছু ছাপিয়ে কর্তৃপক্ষের আদর্শ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিন্তার ভাবাদর্শ ক্রমশ সমাজ পরিবেশকে করায়ত্ত করে ফেলে।

অবশ্য এই কাজ যে সহজে সমাধা হয়েছে, তা নয়। কারণ সমাজ মানস প্রচলিত প্রথায় রপ্ত। সেই প্রচলিত সমাজধারাকে বদল করা সহজসাধ্য হয় নি। বিশুদ্ধ চিন্তার আদর্শকে না হয় জোর করে প্রচার করা গেল কিন্তু শব্দের লোকায়ত ব্যবহার, তার বদল ঘটানো তো কোন সহজ ব্যাপার নয়। সেই কাজে তৎকালীন রাজন্যপুষ্ট পণ্ডিত সমাজ বহুল প্রচলিত শব্দাবলী যেমন ব্রহ্মণ্, আত্মন্, ঋত, কর্ম, ধর্ম ইত্যাদি শব্দের ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদনে প্রয়াসী হলেন। সংগঠিত প্রচারের ফলে সমাজে দ্বৈত অর্থ ই প্রচলিত হয়ে যায়। লোক সাধারণ গ্রহণ-বর্জন স্তরে সুবিধা মত অর্থ আরোপ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যখন বলার দরকার বলে, জলের ধর্মই হল নিম্নগামী। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বলে, ধর্মই মোক্ষ। এইভাবে প্রচলিত অর্থ ও নবতম অর্থ পাশাপাশি চলতে থাকে। এই পরিবর্তন দর্শনের ছাত্রমাত্রেরই বিশেষ উপলব্ধির বিষয়। বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই প্রচলিত দ্বৈত অর্থ অনুধাবন করা দরকার। লোক সাধারণকে সুবিধাবাদের পাঁক থেকে উদ্ধার করা দরকার। আধুনিক বিদ্বান সুরেশচন্দ্র চ্যাটার্জী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়ের মূল্যায়ন করেছেন।[৮] তাঁর মতে বৈদিক যুগের থেকে উপনিষদের যুগে চিন্তাজগতের এক বিরাট পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। এই পরিবর্তনকে তিনি চিহ্নিত করেছেন দুই বিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব হিসেবে। এই দুই

বিবদমান বিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব হল বস্তুতন্ত্র বনাম কর্তৃতন্ত্র।

ওপরের মন্তব্যটি ইংগিতবহ। কেননা তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে সমগ্র উপনিষদ হল দ্বৈত দ্বন্দ্বের লীলাভূমি। অবশ্য তিনি একথাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন উপনিষদে অন্যতম প্রচেষ্টা হল এই দ্বৈত দ্বন্দ্বের সর্বাত্মক সমন্বয় প্রচেষ্টা। আর চূড়ান্ত স্তরে উপনিষদ ঋষিদের মূল উদ্দেশ্য বলে যা প্রতিফলিত হয়েছে তা হল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এক[৯] অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিপাদন। এই অদ্বৈততত্ত্ব প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত সত্য হল সমাজে দ্বৈততত্ত্ব প্রচলিত ছিল। তা না হলে কেনই বা ঋষিরা কায়মনবাক্যে অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতিপাদন নিয়ে এত তৎপর হলেন। কিন্তু বস্তুতন্ত্র বনাম কতৃতন্ত্রের এই যে দ্বন্দ্ব তার কোনভাবেই সমন্বয় সাধন করা যায় নি। সেই প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই দুই তন্ত্রের বিরোধ চুম্বকের দুই মেরুর মত। তাদের কোনভাবে জোড়া লাগানো যায় না। ঘটনা ও রটনার বিরোধের মত এই দ্বন্দ্ব শ্রেণী সমাজে কখনোই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ আজও সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত।

বাদরায়ণ ও শঙ্কর যে প্রচেষ্টার উদ্গাতা তাঁরই উত্তরসূরী কোন কোন চিন্তাবিদ এখনও প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছেন যে উপনিষদ শিক্ষায় বিভিন্নতার মধ্যেও সর্বাত্মক ঐক্য বর্তমান। সেই ঐক্যের শিক্ষা হল অদ্বৈত শিক্ষা। অথচ উপনিষদেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে বিরোধী তত্ত্ব সমাজে প্রচলিত। মুণ্ডক উপনিষদে বলা আছে যে সমাজে দুই প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব প্রচলিত।[১০] দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে। পরা ও অপরা, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট। সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যায় এই দুই প্রকার জ্ঞানতত্ত্বই উপনিষদে প্রতিপাদিত হয়েছে। উপনিষদীয় পরিভাষায় এই দুই প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব যথাক্রমে দেহাত্মবাদ ও আত্মবাদ হিসেবে খ্যাত। দেহাত্মবাদ লোকায়ত বা বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা। অপরপক্ষে আত্মবাদ হল কর্তৃগত বা ভাবতান্ত্রিক শিক্ষা। এই দুই বিপরীত মুখী ধারাই উপনিষদের বিবর্তনের ইতিহাসে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

লোকায়তে যে প্রকৃতিকেন্দ্রিক বস্তুগত শিক্ষা প্রচলিত ছিল বৈদিক যুগে এসে হঠাৎই বাঁক নেয়। অবশ্য এই পথ পরিবর্তন আর্থ-সামাজিক কারণেই। ইতি-মধ্যেই সমাজ রাজতন্ত্রের দ্বারা কুক্ষিগত। আর রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় যখন সংস্কৃতি সংগৃহীত হতে থাকল তখন থেকেই দেখা গেল প্রকৃতি কেন্দ্রিকতা থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি দর্শনকে কি করে মুক্ত করে আনা যায় তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ পর্যায়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় সেই

প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে উপনিষদের প্রতিপত্তি সর্বজন বিদিত। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি সেই যুগের যে কোন গ্রন্থের নামের সঙ্গে উপনিষদ শব্দটি কোনভাবে জুড়ে দিতে। এ পর্যন্ত লব্ধ তথ্য অনুযায়ী আনুমানিক দুশটি গ্রন্থ উপনিষদ নামের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সংযুক্ত। এমনকি সম্রাট আকবরের সময়ে আল্লা উপনিষদ নামে ঐশ্লামিক তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যদিও উপনিষদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্বমহিমায় টিকে ছিল বাদরায়ণ পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত। কালে কালে সেই প্রতিপত্তি শিথিল হয়ে আসছিল। আর সেই বিশেষ অনুভূতিই বদরায়ণকে স্বতন্ত্র সূত্র রচনায় প্রবৃত্ত করে। শঙ্কর পরবর্তীকালে এসে তার চূড়ান্ত পরিণতি দান করেন।

উপনিষদের সংখ্যা বাহুল্য সমস্যার নয়। কেননা এদের অধিকাংশই ফোলানো ফাঁপানো যাতে যেন-তেন প্রকারে উপনিষদ নামে পরিচিত হওয়ার প্রাণান্তকর নজির বিদ্যমান। এ সবের মধ্য থেকে প্রাচীন কয়েকটি উপনিষদই আমরা বেছে নেব। আর প্রাচীন কয়েকটি উপনিষদই কার্যত বেদের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীন উপনিষদ সংখ্যায় তেরটি বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বেতর, কৌষীতকি ও মৈত্রী। এই সব উপনিষদের স্রষ্টাদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না প্রায়। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাঁরা প্রচার বিমুখ ছিলেন। কিন্তু উপনিষদ-গুলিতে বার বার প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত কয়েকজন ঋষির নাম আমরা জানতে পাই। সেই প্রতিনিধিত্বকারী নামগুলি হল উদ্দালক, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী, মহীদাস, শ্বেতকেতু, সনৎকুমার, নারদ, জৈবালী, বালাকি সত্যকাম, অজাতশত্রু, জনক, ইন্দ্র বিরোচন, যম, নচিকেতা, উষস্তি চাক্রায়ন প্রভৃতি। এদের মধ্যে উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র বিরোচন, নারদ-সনৎকুমারই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখন আমাদের দেখার কিভাবে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিচার বিশ্লেষণে চরিতার্থতা লাভ করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বৈত প্রবণতার প্রকাশ

বেদের কর্মকাণ্ড বিরোধিতার মধ্যেই উপনিষদের উন্মেষ। যদিও প্রাচীন বৈদিক যুগে দর্শনের প্রবল প্রকাশ ঘটেনি তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দার্শনিক প্রবণতা সেই বৈদিক সাহিত্যেই কখনো কখনো পরিস্ফুট। ঋগ্‌বেদের শুরু একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে। যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত রহস্য কি? আর এই রহস্য অন্বেষণে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখা পারিপাশ্বিক পরিবেশ প্রকৃতিই বেদের আদিপর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই বৈদিক সাহিত্য প্রকৃতি সংক্রান্ত দর্শন রূপে চিহ্নিত।[১] পাথিব সম্পদ কামনাই বৈদিক সাহিত্যের মূল বিষয়। অন্ন কামনা, পশুর কামনা, ধন, বল, বীর্যের কামনাই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু এই প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রম দেখা যায় উত্তরোত্তর সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতি সংক্রান্ত দর্শনে দৈবীরূপ অন্বেষণ মুখ্য বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। এইভাবে কালে কালে প্রকৃতি দেবতার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। সূর্য, বায়ু, অগ্নি, বরুণ মিত্র, সবিতৃ, পূষন্, বিষ্ণু, বিবস্বৎ, উষস্ প্রভৃতি বৈদিক দেবতা প্রধান স্থান গ্রহণ করে। এই ভাবে এক প্রকৃতি থেকে দেবতার সংখ্যা প্রথমে হয় তিন, আর তিন থেকে বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় ৩,৩৩৯-এ। অবশ্য এসবের মধ্যে পর্বত, নদী, ওষধি, বনস্পতি, অরণ্য, এমনকি পশুশিকারের নানা আয়ুধও স্থান পেয়েছে। আর এই দেবতাকে কেন্দ্র করে নানা উপাচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর আনুষ্ঠানিকতা, কৃত্রিমতা, রীতি প্রকৃতিকে গ্রাস করে ফেলতে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিকতা সর্বস্ব হয়ে যায় সমাজ কাঠামো। পুরোহিত সম্প্রদায় হয়ে ওঠে ক্ষমতার উৎস। সমাজে শ্রেণী বিরোধ বাড়তে থাকে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ। সেই সময়কার সংস্কৃতিচর্চাই হল উপনিষদ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঋগ্‌বৈদিক সমাজ দুই বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত দ্বিজ ও শূদ্রে। এই দ্বিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিরোধ একসময় বাইরে এসে পড়লে শূদ্র সমাজ স্বভাবতই পক্ষ হিসেবে বেছে নেয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে। কেননা ক্ষত্রিয়

সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য প্রাতিষ্ঠানিকতাকে আঘাত করতে চায়। এই ঘটনায় শূদ্র সমাজ পরিবর্তনের ইংগিত খুঁজে পায়। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় লোক সাধারণের অভ্যুত্থানের সূত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে পর্যুদস্ত করে ফেলে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি শূদ্র সমাজকেও অনুপ্রাণিত করে। তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে লোকায়ত সংস্কৃতিতে। কিন্তু লোকায়ত সংস্কৃতির উদ্গান ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কেও পীড়িত করে। তা শাসন-প্রশাসনের পক্ষেও মঙ্গলজনক নয়। এইভাবে সামাজিক আবশ্যকতায় এক সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিরোধ প্রশমিত হয়। সম্প্রদায়গত বন্ধন সুদৃঢ় হয়। দ্বিজ সম্প্রদায় কৌশল পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়। আচার-অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা ও প্রাতিষ্ঠানি-কতার বিরুদ্ধে যে বিরোধ দিয়ে শুরু হয়েছিল তা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শুরু হয় বৈদিক ক্রিয়া কর্মের আংশিক স্বীকৃতি। বিশুদ্ধ চিন্তার তত্ত্বের উপলব্ধির সোপান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বৈদিক ক্রিয়াকর্ম। এইভাবে যেমন সম্প্রদায়গত সমঝোতা সাধিত হয় তেমনই শ্রেণী বিরোধিতা সূচীমুখ পেতে থাকে। আর সংস্কৃতি জগতে সেই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি দর্শন ও বিমূর্ত দর্শনের প্রকৃতির মধ্যেই চলতে থাকে। তাই উপনিষদের যুগে আমরা দেখতে পাই বিরাট বিরাট দার্শনিক বিতর্ক সভার প্রস্তুতি। সেই সব দার্শনিক সভায় যে বিতর্কের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সেখানেও দেখি স্পষ্টভাবে দুই বিবদমান শ্রেণী প্রতিনিধিদের বিরোধ। বিতর্কের বিষয়ও আর কিছু নয় একদিকে প্রকৃতি দর্শন ও অপর দিকে বিমূর্ত দর্শনের রীতি প্রকৃতি। আর এইসব বিতর্কে অনিবার্যভাবে বিমূর্ত দর্শনের জয়গানই কোন না কোনভাবে ধ্বনিত হয়েছে। হওয়ারই কথা। কেননা বেদের সংগ্রহকারগণ ছিলেন প্রশাসনপুষ্ট। কিন্তু সেই সংগ্রাহকগণও বাধ্য হয়েছিলেন বিতর্ক সভার আনুপূর্বিক বর্ণনা নথিভুক্ত করতে। ফলে বিতর্কের যে বিবাদ ও প্রবণতা তাঁদেরকে তুলে ধরতেই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যার জয়গানই ধ্বনিত হোক না কেন বিরোধী প্রবণতাকে এড়ানো সম্ভব হয় নি। তাই সমগ্র উপনিষদ সাহিত্য হল দ্বৈত প্রবণতার প্রকাশ।

কি এই দ্বৈত প্রবণতা? একদিকে দর্শনের প্রকৃতি কেন্দ্রিকতা ও অপরদিকে অতিপ্রাকৃত বিমূর্ত অধিবাস্তবতা কেন্দ্রিকতা। এই দুই বিরোধী প্রবণতাকে আধুনিক চিন্তাবিদগণ ব্যাখ্যা করেছেন আরও সহজ ভাষায়। যথাক্রমে বস্তুগত ও অবস্তুগত বা মননগত। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার উপনিষদ সাহিত্যেও দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা শুরু হয়েছে বস্তুগত ভিত্তি থেকে, শেষ হয়েছে অন্যত্র, অধিবাস্তবতায় বা বিশুদ্ধ মনন সর্বস্বতায়। আমরা যেকোন কথোপকথনকে তুলে ধরি না কেন

এই বিচারই দেখতে পাব। এই দ্বৈত প্রবণতা দুই বিবদমান বিরোধী শিবিরকেই তুলে ধরছে। প্রধান তেরটি উপনিষদে আমরা যে দুই বিরোধী শিবিরের উল্লেখ পাই তা যথাক্রমে, উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র-বিরোচন, নারদ-সনৎকুমার ইত্যাদি। যখন উদ্দালক, বিরোচন ও নারদ বস্তুগত শিক্ষাদর্শ তুলে ধরেছেন তখন যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র ও সনৎকুমার চূড়ান্ত বিমূর্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য তত্ত্বকেই শিক্ষাদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এঁদের মধ্যে উদ্দালক হলেন বস্তুবাদী শিক্ষার প্রধান প্রবর্তক আর যাজ্ঞবল্ক্য বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদী অর্থাৎ ভাববাদী শিক্ষার প্রধান প্রবর্তক। আমরা এবার এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার বিষয় উপস্থিত করব।

উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদই প্রথমে ধরা যাক। জনক রাজার সভায় দার্শনিক বিতর্কে দেখা যায় উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে মূল প্রশ্ন করেছেন এইভাবে: বেত্থনু ত্বম্ কাপ্য, তৎসূত্রম্ যেন অয়ম্ চ লোকঃ, পরঃ চ লোকঃ, সর্বানি চ ভূতানি সংদৃধ্বনি ভবন্তি ইতি। তুমি কি সেই সূত্রের সম্পর্কে জান যার দ্বারা ইহলোক পরলোক সর্বভূত সংগ্রথিত?[২] উদ্দালক আরুণির প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, বায়ুই সূত্রাত্মা। উদ্দালক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন বায়ু কিসে ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য একের পর এক পৃথিবী থেকে শুরু করে প্রাণ, মন পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উল্লেখ করতে থাকেন। উদ্দালক ও একের পর এক প্রশ্নের জালে যাজ্ঞবল্ক্যকে জড়িয়ে ফেলতে থাকেন। কিন্তু অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্যের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি ক্রুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করতে থাকায় উদ্দালক পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থিত হন।

এখান থেকে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় যে উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য বিতর্ক আসলে পৃথিবীর আদি কারণ অন্বেষণ। উদ্দালকের এই নীরবতা সম্পর্কে অধিকাংশ পাঠকের মত পূর্বতন ঋষিগণ পরাজিতের প্রতিবেদন বলে চিহ্নিত করতে চাইলেও একে পরাজয় বলে আখ্যায়িত করা যায় না। নীরবতাও এক ধরনের প্রতিবাদ। তৎকালীন সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্দালক নীরবতা অবলম্বন করাকেই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু উদ্দালক বিতর্ক সভায় নীরব থাকলেও চিরকাল মৌনব্রত পালন করেন নি। তিনি জগতের আদি কারণ সম্পর্কে প্রশ্নের নিরসন করেছেন অন্যত্র। রাজসভার ঘেরাটোপে তিনি নীরব থাকলেও পুত্র শ্বেতকেতুকে শিক্ষা রপ্ত করাতে এই চিরন্তন প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করেছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বস্তুতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন। এই যাবতীয় বস্তুরাজি সমন্বিত প্রাণীজগত বস্তুসম্ভূত। বস্তুই আদি সত্তা। এই বস্তু নিচয়ের অনন্ত বিভাজন সম্ভব। আর এই বিভাজনের

শেষতম অংশ, যাকে আর কোনভাবে বিভাজন করা সম্ভব নয়, তা হলো আদি ভূত। (এই আদিভূত পাঁচটি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্। পরিমাণগতভাবে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র) অনন্ত মহাভূত একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে এই দেহ গঠন করে। কোন কিছুর শুরু মানেই বিকার, পরিবর্তিত আকার। কারণে যা নিহিত কার্যে তা রূপান্তরিত। যা অব্যক্ত ছিল কারণে তাই ব্যক্ত হল কার্যে। তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে ভূতগণের উৎপত্তি।[৩] তেষাম খল্বেষাম্ ভূতানাম্ ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি। —আণ্ডজম্, জীবজম্, উদ্ভিজ্জম্, ইতি। এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগত তিন প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়ে উৎপন্ন, অণ্ড থেকে, জীব থেকে ও উদ্ভিদ থেকে। এই উৎপত্তি ত্রিবৃৎকরণের[৪] দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। ত্রিবৃৎকরণে তেজ, জল ও পৃথিবী প্রধান মহাভূত রূপে অপর অপ্রধান দুটিতে নির্দিষ্ট অংশে মিশ্রিত হয়েই জগৎ বৈচিত্র্যকে সম্ভব করে তুলেছে। পাছে শ্বেতকেতুর উপলব্ধিতে কোন প্রকার ফাঁক থেকে যায় সেই জন্য উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন এই ত্রিবৃৎকরণ দু'প্রকার, অনন্ত মহাভূত কেন্দ্রিক ও শরীর কেন্দ্রিক। মহাভূতের ত্রিবৃৎকরণ বোঝাতে গিয়ে বললেন যে সূর্য হল বিশ্বের চক্ষু। সেই সূর্যে যে লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয় তা তেজরূপ, আর যে শুভ্র বর্ণ দৃষ্ট হয় তা জলের রূপ আর যে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় তা পৃথিবীর রূপ। এই মহাভূতগণের ত্রিবৃৎকরণের উপলব্ধি সম্ভব হবে যদি শরীরে ত্রিবৃৎকরণ কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তার উপলব্ধি করি। এরপর উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে অবহিত করাতে বললেন অন্ন ভুক্ত হলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূলতম অংশ মলে, মধ্যমভাগ মাংসে ও সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে জল পান করলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূলতম অংশ মূত্রে, মধ্যমাংশ রক্তে এবং সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণে পরিণত হয়। তেজ (ঘৃতাদি পদার্থ) ভুক্ত হলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তার স্থূলতম অংশ অস্থি, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্যে পরিণত হয়। অতএব হে শ্বেতকেতু মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।

এতৎসত্ত্বেও শ্বেতকেতু ভূততত্ত্ব বুঝতে অসমর্থ হওয়ায় উদ্দালক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুত্র শ্বেতকেতুকে সম্বোধন করে বললেন যে শরীর মাত্রেই ষোড়শ কলা যুক্ত। পনের দিন আহার ব্যতিরেকে কাটিয়ে কেবলমাত্র যত ইচ্ছা জল পান করে ফিরে এসো। জলপানে প্রাণ বিয়োগ হয় না। কারণ প্রাণ জলময়।

দীর্ঘ পনের দিন আহার না করে শ্বেতকেতু পিতার নিকট জিজ্ঞাসু হয়ে দাঁড়ালেন, পিতা উপদেশ দিলেন ঋক্, যজু, সাম গান কর। অনেকক্ষণ পর শ্বেতকেতু উত্তর করলেন ঐগুলি আমার মনে আসছে না। এরপর উদ্দালক বললেন এবার আহার করে এসো। শ্বেতকেতু আহার করে পুনরায় পিতার নিকট উপস্থিত হলে তিনি যা কিছুই জিজ্ঞেস করলেন, তৎসমুদয়ই ঠিক ঠিক উত্তর দিল শ্বেতকেতু। প্রজ্জ্বলিত দাহ্য পদার্থের কেবলমাত্র একটি অঙ্গারই অবশিষ্ট থাকে তার দ্বারা তার অপেক্ষা বড় কোন বস্তুকে যেমন দগ্ধ করা যায় না। তেমনি তোমার ষোড়শ কলাযুক্ত শরীরের মধ্যে কেবল একটি কলাই অবশিষ্ট ছিল। এর ফলেই কোন কিছু উদ্ধার করতে সমর্থ হও নি। আর এখন অন্ন দ্বারা তা পুনরায় বর্ধিত হওয়ায় তুমি বেদসমূহ অনুভব করতে পারছ। এরপর শ্বেতকেতু সকল বিষয়েই ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হন।[৫]

এই শিক্ষাদর্শ থেকে বুঝতে পারি যে উদ্দালক বস্তুজগতের স্বাভাবিক বিকাশ সেই যুগের উপযোগী বিজ্ঞানভাবনায় সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার মূল কথা হল মহাভূতই জগত কারণ। এই দিক থেকে উদ্দালকই বস্তুবাদের প্রথম স্বীকৃত প্রবক্তা। যদি ও সেই যুগে তা ভূতবাদরূপেই চিহ্নিত ছিল। ভূত থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি আবার ভূত সমুদয়েই লয়। প্রতিটি বস্তুই তা জড় কি চেতন আদিভূত সকলের বিশিষ্ট সমন্বয়। মানব দেহই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ক্ষেত্র। এমনকি জীবন, প্রাণ বা চেতনা তাও ভূত উদ্ভূত। মৃত্যুতে চেতনারও বিলুপ্তি ঘটে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভূত সকল আদিভূতে বিলীন হয়ে যায়। ফলে জগৎ বৈচিত্রের স্রষ্টারূপে সূত্রাত্মা হিসেবে পরমাত্মার কল্পনা অলীক আমদানি। উদ্দালকের স্পষ্ট উক্তি : অব্যক্ত ভূত প্রকৃতিই অসৎরূপে ছিল সেখান থেকেই সৎ প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে।

এর বিপরীতে যাজ্ঞবল্ক্য ভাবতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে আদি সূত্র হল অন্তর্যামী পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য। আর সকলই মিথ্যা। বঞ্চনাময়। লোক সকল মোহবশতই ইহজগত নিয়ে মশগুল থাকে। পরমাত্মার উপলব্ধিতে এই মোহ থেকে মুক্ত হয়। তখন এইসব মোহসমূহের কারণ অকারণ বুঝতে সমর্থ হওয়ায় কেবলমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করে। ফলে পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম। জগতের একমাত্র সত্তা। তারই উপাসনা একমাত্র মুক্তি। ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে অনুরূপভাবে বস্তুগত ও ভাবগত শিক্ষা-দর্শের দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত। যথাক্রমে দেহাত্মবাদ বনাম আত্মাবাদ। আত্মা

দেহাশ্রিত না দেহাতীত এই সূক্ষ্ম বিতর্ক এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। বিরোচন যে শিক্ষাদর্শ প্রচার করেছিলেন তা হলো বস্তুগত। তাঁর মতে চেতনা হল ভূত থেকে উদ্ভূত পদার্থ। দেহের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। এককথায় চৈতন্যই দেহ, দেহই চৈতন্য। চৈতন্য দেহের সর্বাংশে ব্যাপ্ত। কেননা অভিজ্ঞতায় দেখি দেহের সর্বাংশই উদ্দীপকে সাড়া দেয়। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যুতে জীবনের বিভিন্ন অংশ আদিভূতে বিলীন হয়। কোন অশরীরী দৈবী অলীক কল্পনা এই প্রকৃতির সৃষ্টির পিছনে নেই। ফলে অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন স্বর্গ নেই, নরক নেই, ঈশ্বর নেই। অলীক কল্পজগতের বাইরে এদের কোনই অবস্থান নেই। কেউই আজো পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে নি। করতে পারে না। কেননা এই সব অলীক কল্প, বস্তুবিষয় নয়। বিষয়ই কেবলমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য। প্রত্যক্ষের বাইরে সকল কিছুই অযথার্থ। প্রত্যক্ষই কেবলমাত্র যথার্থ জ্ঞানের বৈধ উপায়।

অপরপক্ষে ইন্দ্র যে শিক্ষাদর্শ প্রচার করেছেন তা কর্তৃগত বা ভাবগত। তাঁর মতে আত্মা দেহাশ্রিত নয় দেহাতীত। আত্মা কখনোই শরীর হতে পারে না। কারণ শরীর মাত্রেই জন্ম-মৃত্যু কবলিত। আর যা কিছুই জন্ম-মৃত্যু কবলিত তা বঞ্চনাময়। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। আত্মা অজর, অমর, ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা। কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ই চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি এই ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকে ছুঁতে পারে না। কেননা এই ইন্দ্রিয়সকলই দোষদুষ্ট, মিথ্যা প্রতীতি। কেবলমাত্র এই ইন্দ্রিয়াতীত একমাত্র সত্তা আত্মাই মহনীয়। আত্মাকে পরিচর্যা করলে শোক-তাপ-জন্ম-মরণাদি অতিক্রম করা যায়। আত্মউপলব্ধিই চিরমুক্তি।

দ্বৈত প্রবণতার ভাস্বর রূপ পাই নারদ-সনৎকুমার সংবাদে। এখানে নারদ পরিচিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত চিন্তাবিদ হিসেবে আর সনৎকুমার হলেন ক্ষত্রিয় চিন্তাবিদদের প্রতিনিধি। মহর্ষি নারদ সনৎকুমারের কাছে শিক্ষাপ্রার্থী হলে সনৎকুমার প্রথমে নারদের অধীত শিক্ষার বিষয়ে খবর নেন। নারদ প্রত্যুত্তরে জানান ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব উৎপাত বিষয়ক বিদ্যা, কালতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, প্রজ্ঞাবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র সকলই অধ্যয়ন করেছি। এক কথায় মন্ত্রবিদ হিসেবে দাবী করতে পারি। সনৎকুমার বললেন এইসব কেবল নামমাত্র। এই সকল বিদ্যার দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধি হয় না। কেবলমাত্র আত্মবিদই পরমার্থসিদ্ধি দাবী করতে পারেন। নারদও স্বীকার

করলেন যে তিনি মন্ত্রবিদই, আত্মবিদ নন। জ্ঞানীগুণি শ্রুত হয়ে তিনিও জেনেছেন কেবলমাত্র আত্মবিদই নাকি শোক-তাপের উর্দ্ধে অবস্থান করেন। কেবলমাত্র মন্ত্রবিদ হয়ে তিনিও শোক-তাপ কবলিত। নারদ এবার সনৎকুমারকে সম্বোধন করে বললেন, আমাকে আত্মবিদ হতে সাহায্য করুন। শোকের পরপারে পৌছোতে সাহায্য করুন। সনৎকুমার পরমতৃপ্তিতে বললেন, বেদ-বেদাঙ্গ ইতিশাস্ত্র কেবল নামসর্বস্ব। নামজ্ঞান মাত্রেই মিথ্যাজ্ঞান। আত্মজ্ঞানই কেবল সত্যজ্ঞান। শ্রেষ্ঠজ্ঞান। এইভাবে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে আমরা পরস্পর বিরোধী দুই শিক্ষাদর্শই পাই। সনৎকুমারের মতে সকল প্রকার বস্তুজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। অবস্তু অর্থাৎ আত্মার জ্ঞানই কেবল সত্যজ্ঞান। নারদ কেবল সেই বস্তুজ্ঞানই এ পর্যন্ত রপ্ত করেছেন। এইভাবে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে আমরা দু প্রকার জ্ঞানতন্ত্রের সন্ধান পাই। বস্তুগত জ্ঞানতত্ত্ব ও অবস্তুগত বা ভাবগত জ্ঞানতত্ত্ব।

এইভাবে সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যে পরস্পর বিরোধী দুই প্রবণতার প্রতিফলন পাই। একে দুইভাবে চিহ্নিত করা যায়। একটি বস্তুগত প্রবণতা অপরটি অবস্তুগত বা ভাবগত। বস্তুগত প্রবণতার উদ্গাতা হলেন যথাক্রমে উদ্দালক, বিরোচন, শ্বেতকেতু ইত্যাদি আর অবস্তুগত বা ভাবগত প্রবণতার উদ্গাতা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য, ইন্দ্র ও সনৎকুমার ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে আমরা ভাবগত শিক্ষাদর্শের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুন্দরভাবে অবহিত হই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন তাঁর শিক্ষাদর্শের চাবিকাঠি হল 'নেতি নেতি' তত্ত্ব। এই 'নেতি নেতি' তত্ত্বের মূল কথা হল নির্বিচারে কোন কিছুই গ্রহণ নয়। সকলকিছুই সন্দেহের আকারে সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে এক সময় দেখা যাবে যে জাগতিক সকল কিছুকেই আমরা সন্দিগ্ধভাবে নস্যাৎ করতে পারি। কিন্তু এই 'নেতি নেতি' প্রক্রিয়ার সপ্রশ্ন নায়ক আত্মাকে অস্বীকার করি কি করে? চারদিকের ব্যবহারিক জগত বঞ্চনাকারী, স্ববিরোধী কিন্তু চিন্তাস্বরূপ যে আত্মা তা নিশ্চিত ও যথার্থ। অতএব দর্শনের অনুসন্ধিৎসা আমরা এই আত্মা থেকেই শুরু করতে পারি। জ্ঞানের উপায় যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি দিয়ে যদি জাগতিক সকল কিছুকে বিচার করতে যাই ব্যর্থ হতে পারি। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে সেরূপ কোন ব্যর্থতার প্রশ্নই ওঠে না। আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে এই সকল উপায়ের কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা আত্মোপলব্ধি সাক্ষাৎ প্রতীতির বিষয়। আর আত্মজ্ঞান দর্পণস্বরূপ। এই জ্ঞানের আলোকে সকল কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়। জাগতিক সকল কিছুর

কারণ অকারণ আত্মজ্ঞান জীবের সামনে উপস্থিত করে। তখন ব্যবহারিক কামনা বাসনাবশতঃ যে শোকতাপ সাধারণতঃ জীবকে কবলিত করে তার থেকে চিরমুক্তি সম্ভব হবে। অজ্ঞানবশতই জাগতিক বস্তুনিচয়ে মোহবশত শোকগ্রস্থ হয়ে থাকি। আত্মজ্ঞান বিশ্বরহস্য উন্মোচন করে জীবকে মুক্তাত্মায় রূপান্তরিত করে। তখনই মুক্তি ঘটে। এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের নেতৃত্বে সকল ব্রহ্মবিদই আত্মতত্ত্বের আদর্শ গড়ে তুলেছেন।

বিপরীতে উদ্দালক বলেছেন আমাদের সামনে প্রতিভাত জগত সত্য। আমরা যা কিছুই অভিজ্ঞতায় পাই সকলই সত্য। এই অভিজ্ঞতায় ব্যাপ্ত বস্তু-নিচয়ের পূর্বাপর অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বরহস্য অনুধাবন করতে পারি। এই ভাবে বস্তুবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মহাভূতকে আদি সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন উদ্দালক। এই জগতের অনন্ত বস্তুরাজি মহাভূত থেকেই এসেছে। ওখানেই পরিশেষে বিলীন হয়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের বিভিন্ন উপায় যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমেই এই সত্য উপলব্ধি করি। এমনকি আমাদের যে প্রাণ, জীবন বা চেতনা তাও এই মহাভূত উদ্ভূত। ইন্দ্রিয় সর্বস্ব জগৎই সত্য। অতীন্দ্রিয় লোক বলে কিছু নেই। বস্তুনিচয়ের সম্যক জ্ঞানেই মুক্তি। এইভাবে উপনিষদে পর্যায়ক্রমে দ্বৈত প্রবণতার বিকাশ ঘটেছে। একদিকে বস্তুতন্ত্র বনাম বিশুদ্ধ চিন্তা বা আত্মতন্ত্র। বস্তুতন্ত্র কেননা জাগতিক বস্তুজগতের সত্যতা নিরূপণে তৎপর তাই বস্তুবাদ বলে পরিচিত। অপরপক্ষে আত্মতন্ত্র যেহেতু বিশুদ্ধ চিন্তা বা ভাবজগতের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে তৎপর তাই ভাববাদ বলে পরিচিত। আমরা যতই এই গ্রন্থের ভেতর প্রবেশ করব এই দুই বিপরীত চিন্তার ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করতে সমর্থ হব।

দু প্রকার জ্ঞান

বহুমুখী নয় উপনিষদে যে দ্বৈত প্রবণতা বর্তমান তা জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যেতে পারে। আসলে বিপরীতমুখী শিক্ষাদর্শের অনিবার্য পরিণতি হল এই দু প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব। উপনিষদে স্পষ্ট করেই বলা আছে যে কেবল দু প্রকারের জ্ঞান বর্তমান। শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট। উপনিষদের পরিভাষায় তারা পরা ও অপরা হিসেবে চিহ্নিত। পরাবিদ্যাই হল শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা হল নিকৃষ্ট বিদ্যা। এমনকি এও বলা হয়েছে যে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যাই কেবল একমাত্র বিদ্যা বা সত্যজ্ঞান। অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা চূড়ান্ত বিচারে মিথ্যা, এক কথায় কোন প্রকার জ্ঞানই নয় বলা চলে। এখন উপনিষদ থেকেই উদাহরণ তুলে ধরা যাক।

মুণ্ডক উপনিষদে শুরুতেই বলা হয়েছে—[১] দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি-পরাচৈবাপরা চ। বেদজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী কেবলমাত্র দুটি বিদ্যাই জানবার আছে। একটি পরা বিদ্যা অপরটি অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা হল সকল কিছুর অতীত ব্রহ্ম জ্ঞান আর অপরা বিদ্যা হল সৃষ্ট জগতের সম্পর্কে সকল রকম জ্ঞান। পরবর্তী পঙক্তিতেই বেশ চিত্তাকর্ষক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।—তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এ সবই অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যা যার দ্বারা কেবল মাত্র অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়।

এখন প্রশ্ন এই চিত্তাকর্ষক শব্দটি বা হঠাৎ ব্যবহার করতে গেলাম কেন? কেননা উপরোক্ত সংজ্ঞায় এমনকি বেদকে ও নিকৃষ্ট বিদ্যারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য পাঠক মাত্রেই বলতে পারেন, এ আর এমনকি ব্যাপার! বেদ নিন্দার মধ্য দিয়েই তো উপনিষদ গড়ে উঠেছে। যদিও পরিশেষে বেদকে জড়িয়ে নিয়ে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন বেদ নিন্দাই বা কেন? আবার পরিবেশ পরিস্থিতির প্রয়োজনে বেদকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই বা কেন। উপনিষদ কি বেদ

বহির্ভূত কোন ধারা ? তা তো নয়। আজো বেদ বিশারদগণ উপনিষদকে বৈদিক ধারার শেষতম বিভাগ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। উপনিষদ স্পষ্টতই বেদের অন্যতম অংশ। আর তাই যদি হয় তো বেদকে কেন্দ্র করে যা যা গড়ে উঠেছে তাকেও অপরা বিদ্যারূপে চিহ্নিত করতে হয়। কারণ উপনিষদ কখনোই দাবী করে না যে তা বেদের অন্তর্গত নয়। এমনকি আধুনিক গবেষকদের কেউই এমন ভাবনা প্রকাশ করেন নি। এখানে অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে বেদ বলতে বেদের কর্মকাণ্ডকেই বোঝানো হয়েছে। সেই অর্থে উপনিষদকে বোঝায় না। কিন্তু উনিষদই বা কি কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার উদ্‌গান সর্বস্ব। সেখানেও তো বিপরীতমুখী মত সংঘর্ষের প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট। বিরুদ্ধ মতের এমন সুনিপুণ সমাবেশকে কি শ্রেষ্ঠ বিদ্যারূপে চিহ্নিত করা যায় ? অবশ্য এক্ষেত্রে এমন যুক্তিও দেখানো যেতে পারে যে উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান হল পরাবিদ্যা আর উপনিষদের শব্দ-সমষ্টি হল অপরাবিদ্যা। কেবল শব্দ সমষ্টি অধিগত হলেই ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হয় না। গুরুর গুহ্য উপদেশেই ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হয়। তখন প্রশ্ন ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা বিষয়টিই বা কি ? উপনিষদ কি সত্যিই সত্যিই ব্রহ্মবিদ্যার রীতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে ? করবে কি করে ? আসলে পরাবিদ্যার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করা অসম্ভব। কেননা ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়টা কি তা নিয়ে ব্রহ্মবিদগণ একমত হতে পারেন নি। ফলে নানান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের সংজ্ঞায় সকল কিছুই অ—অর্থাৎ নঙর্থক উপসর্গ যোগ করে কোন কিছুই বোঝাতে না পেরে যা সকল প্রকার গ্রাহ্য জ্ঞানের বাইরে তাকেই ব্রহ্মজ্ঞান রূপে নির্দেশ করেছেন।[২] মুণ্ডক উপনিষদে এ বিষয়ে স্পষ্ট করেই লেখা—যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্। অগোত্রম্, অবর্ণম্, অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ তৎ অপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং, সর্বগতং, সুসূক্ষ্মং তৎ অব্যয়ম্ যৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, কারণহীন, রূপহীন, চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় বর্জিত, অবিনাশী, সর্বভূতগত, অতিসূক্ষ্ম, যা ভূতসমূহের কারণ অব্যয় ব্রহ্মকে জ্ঞানীরা দর্শন করেন।

আসলে উপনিষদ বিপরীত মত সংঘর্ষের সংগ্রহ। একটি বস্তুতান্ত্রিক অপরটি ভাবতান্ত্রিক। শ্রেষ্ঠজ্ঞান, পরাবিদ্যা ভাবতান্ত্রিক কেননা এই বিদ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বাস্তবতা বর্জিত ভাবজগত। যা ব্রহ্মলোক বলে চিহ্নিত। এই ব্রহ্মলোকের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। তাই ব্রহ্মজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান অন্তরে এমন অনির্বাণ শিখা প্রজ্জলিত করে যে সেই শিখার আলোকে

সে সকল কিছুই স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। বাহ্যজ্ঞান তখন কোন প্রকার ছায়া ফেলতে পারে না। এই চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জিত হলে যে উপলব্ধি ঘটে তা হলো কেবলমাত্র ব্রহ্মন্ বা আত্মন্‌ই সত্য। আর সবই মিথ্যা। যে জগত বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় তা ভ্রান্ত, মায়া মাত্র। তাদের আসলে কোন অস্তিত্বই নেই। অতএব বাস্তবতা শব্দটি কখনোই কোন অস্তিত্বের লক্ষণ হতে পারে না। কারণ বাস্তব মাত্রেই দ্বিত্বভাব জাগরিত করে। এই দ্বিত্বভাব যথাক্রমে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। কিন্তু সত্যজ্ঞান স্বতই অদ্বৈত। কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিভাত। অতএব চুড়ান্ত সত্যজ্ঞানে দ্বৈতভাবের কোন ঠাঁই নেই। যে বা যিনি এই চূড়ান্তজ্ঞানের অধিকারী হন তাঁর কাছে সকলই পরিজ্ঞাত। জাগতিক কামনা বাসনা জাগরিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ এ সকলই মিথ্যা ও অলীকরূপে পরিজ্ঞাত। তাই ব্রহ্মবিদের কাছে জগত বৈচিত্রের জ্ঞান অপরাবিদ্যার জ্ঞান। অপরাবিদ্যার জ্ঞান হল নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান।

এই অপরাবিদ্যা বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বলতে বোঝায় মানুষজন অভিজ্ঞতায় যা দেখে তা সত্য। জাগতিক বস্তু স্বনির্ভর। বহির্জগতের এই সকল বস্তু যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখন জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান দুভাবে হয় যথাক্রমে বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও আন্তরপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে। অভিজ্ঞতা মাত্রেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে নাম ও রূপের প্রত্যক্ষ। আদিতে এই জগত অব্যাকৃত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত ছিল। তারপর নাম ও রূপের আকারে অভিব্যক্ত হল।[৩] তৎ হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ। তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত। শুধু বৃহদারণ্যকই নয় উপনিষদ গ্রন্থাবলীতে অভিব্যক্ত জগতকে নাম ও রূপের আকারে বাস্তবতা ও বিশিষ্টতা রূপে বোঝানো হয়েছে। বাস্তবতা হল অস্তিত্বের পরিচায়ক। কোন বস্তু যখন বাস্তবতঃ আকাঙ্খার সফল জনক হয় তখনই জ্ঞান-রূপে বিশিষ্ট হয়। এইভাবে অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানকে বাস্তবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বলা হয়। ঠিক এই কারণেই পরাবিদ্যার প্রবক্তাগণ যখন অভিজ্ঞতা নিঃসৃত জ্ঞানকে বাতিল করেছেন তখন অপরাবিদ্যার প্রবক্তাগণ অভিজ্ঞতা নিঃসৃত জ্ঞানকে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর পরাবিদ্যার কাছে এই কারণেই সমস্ত জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ নিকৃষ্ট জ্ঞানরূপে চিহ্নিত। সত্যতা ও মিথ্যাত্ব হল জ্ঞানের লক্ষণ। অপরাবিদ্যা অনুযায়ী যা সফল প্রবৃত্তির জনক তা সত্য। আর যা সফল প্রবৃত্তির জনক নয় তা মিথ্যা। অতএব নিকৃষ্ট জ্ঞান মাত্রেই মিথ্যা অবিদ্যার জনক এই যুক্তি একদেশদর্শী।

উপরের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে উপনিষদে দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আর এই দুপ্রকার জ্ঞানের নিকৃষ্ট অর্থাৎ অপরাবিদ্যার জ্ঞানকে যে সর্বৈব ত্যাজ্য একথা বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। কেবলমাত্র পরাবিদ্যার জ্ঞানই শ্রেয়। অপরাবিদ্যার জ্ঞান আসলে জ্ঞানই নয়। সেই পরাবিদ্যার জ্ঞানকে মহনীয় করলেই সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মুণ্ডক উপনিষদে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—[৪] তম্ একম্ আত্মানম্ এব জানথ। অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ। সেই এক আত্মাকেই জান, এই আত্মজ্ঞান বিরোধী বাক্যসমূহ ত্যাগ কর। কারণ আত্মজ্ঞান বিরোধী বাক্য সমূহের জ্ঞানে চিত্তচাঞ্চল্য হয়, একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানই অমৃতের সেতু। আত্মজ্ঞান বিরোধী জ্ঞান অপরা বিদ্যা তা পরিত্যাগ কর।

শুধু মুণ্ডকে নয় সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যেই কোন না কোনভাবে এই রকম নির্দেশিকা জারি করে বিদ্যাচর্চার রথী মহারথীদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হয়নি উপনিষদ সমূহই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া একথা জলের মতো পরিষ্কার যে ব্রহ্মজ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, অমৃতের সেতু, সকল কিছুর নিবৃত্তি হতো তো মানুষ নিজের তাগিদেই স্বেচ্ছায় সেই জ্ঞানকে পাথেয় করতো! তবে ফরমান বা নির্দেশিকা জারি করবার কোন প্রয়োজন হতো না। নিজের প্রয়োজনেই আত্মবিরোধী ব্যবহারিক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করতো। বরং উল্টোটাই সত্য। আপামর মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান বিমুখ। ঐহিক জ্ঞানের চর্চায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর সেইটাই স্বাভাবিক। কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যা সেই ব্যবহারিক জগতই তার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির তীর্থক্ষেত্র। সেই আবিষ্ট মানুষজনকে পারলৌকিক জ্ঞান চর্চায় রত করানোর জন্যই এই নির্দেশিকা। শুধু কি এই মহৎ উদ্দেশ্যে এই ফরমান যে বিষয়জ্ঞানের অজ্ঞ মানুষকে চক্ষুষ্মান্ করা? নিশ্চয়ই নয় তার সূক্ষ্ম সামাজিক তাৎপর্যও বর্তমান। তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় রাজ-শাসনকে নিরুপদ্রব করতে হলে প্রজাসাধারণকে বিষয় বিমুখ করে তোলা একান্ত জরুরী। সেই প্রয়োজন আজও বিশেষভাবে অনুভূত। কিন্তু মেঘ দিয়ে যেমন সূর্য ঢাকা যায় না তেমনি নিষ্ফল প্রচেষ্টা আজও বর্তমান। তাই সেই উপনিষদের যুগ থেকে উপনিষদ-কর্তাদের একমাত্র প্রয়াস ছিল যেন তেন প্রকারেণ মানুষকে বিষয়জ্ঞান থেকে পরাঙ্মুখ করা। আর তা তো আইন করে বা কঠোর শাসনের মধ্যদিয়ে বাধ্য করা যাবে না। তাই শাসনের পাশাপাশি অনুশাসনের প্রয়োজন। এইভাবে যে সংস্কৃতি পরিপালন করা হয়েছে তার মূল কথা হল

বিষয় বিমুখ বিশ্বাস নির্ভর পরাবিদ্যার চর্চাই মানুষের মুক্তির পাথেয়। উপনিষদ সমূহে এই রীতিতে পরাবিদ্যার জ্ঞানকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

প্রায় সবকটি উপনিষদে এই দ্বৈতজ্ঞানের তত্ত্বকে প্রায় একইভাবে তুলে ধরলেও তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে। উপনিষদ শ্রেষ্ঠ বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে[৫] অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর বেদ বিদ্যায় রত হওয়া মানে তো আরো গভীরতম অন্ধকারে প্রবেশ করা। ঠিক অনুরূপ শ্লোক ঈশ উপনিষদেও বর্তমান। এখানে অবিদ্যার উপাসনা করার অর্থ যারা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের উপাসনা করে তারা অন্ধকারে আর যারা কর্মবিহীন দেবতার উপসনায় রত তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। এখানে পাঠকের মনে ধাঁধা লাগতে পারে যে অবিদ্যা আর বেদবিদ্যার পার্থক্য কি? ব্রহ্মবিদ্‌দের মতে এই দুইই তো অবিদ্যা। ফলে বেদবিদ্যা বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে। তার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যে ভুল ঘটতে পারে তা হলো অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রসঙ্গ। উভয়ই কিন্তু বেদবিদ্যা। পূর্বে অবিদ্যা কথায় বোঝানো হয়েছে জ্ঞান রহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আর বিদ্যা কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে কর্মরহিত শুধু দেবতার উপাসনা। একথা পাঠক মাত্রেরই জানা যে দেবতা বলতে এখানে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম বোঝানো হয়নি। দেবতা বলতে এখানে দ্যুতিমান বস্তুপ্রকৃতি যা দেবতা রূপে চিহ্নিত। অন্যত্র এ নিয়ে আলোচনা করব। উপনিষদে পিতৃলোক ও দেবলোকের প্রসঙ্গ আছে। এই দেবলোক ব্রহ্মলোক নয়। এই দেবলোক হল চন্দ্র, সূয, গ্রহ তারা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে যারা প্রকৃতিদেবতা হিসেবে চিহ্নিত। এই সকল দেবতা কর্ম-ফলদাতা, নিকৃষ্ট। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য কর্মরহিত দেব উপাসনা ও জ্ঞানরহিত কর্ম উপসনা উভয়ই ক্ষতিকর। জ্ঞানরহিত কর্ম জীবকে কামনা বাসনায় আবিষ্ট করে ফলে দুঃখ শোক নিত্যসঙ্গী হয়। এইভাবে কামনা বাসনা তাড়িত হয়ে অন্ধের মত ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আত্মজ্ঞান তাদেব থেকে দূরে সরে যায়। আবার যারা কর্মত্যাগ করে শুধু বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় কাটায় তারা ততোধিক অন্ধকারে হাবুডুবু খায়। এখানে ও পাঠকের ধাঁধা লাগতে পারে। ব্রহ্মবিদ মাত্রেই তো কর্মকে ঘৃণা করে থাকেন। তাহলে কর্মের প্রয়োজন অনুভূত হল কেন? সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই একসময় অনুশাসন কর্তারা উপলব্ধি করেন যে জীবন ধারণের জন্য তো কর্ম করতেই হবে। কর্ম

সরাসরি নস্যাৎ করলে তো জীবন অচল হয়ে পড়বে। অনুশাসন প্রতিপালনই সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি বিশ্রুত পঙ্‌ক্তি "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ" কর্ম করেই জীবন ধারণ করতে ইচ্ছে করবে কথাটাকে ভিন্ন অর্থে স্বীকৃতি দিলেন। আর এই কর্মের ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন নিষ্কাম কর্ম হিসেবে। এই নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব প্রতিপাদন করার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ গীতার সৃষ্টি হল। কি সেই অপূর্ব তত্ত্ব। উপাসনা ও কর্ম একীকরণ তত্ত্ব। দেবতার উপাসনা ও কর্ম একই সঙ্গে প্রতিপালন করতে হবে। শুধু কর্ম বা শুধু দেবউপাসনা শাস্ত্রসম্মত নয়। কারণ তা কেবল পিতৃলোক থেকে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা আদি দেবলোক প্রাপ্তিতে সাহায্য করতে পারে। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটায়। সেখানে কর্ম ও উপাসনা কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। সাক্ষাৎ সংযোগই প্রধান। এইভাবে উপনিষদ কর্তাগণ ক্রমশই আপোষকামী হয়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু মূল লক্ষ্যের জায়গায় দৃঢ় সংকল্প থাকলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে ব্রহ্মলোক বা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য দেবতার উপাসনা বা কর্ম কোনটিরই প্রয়োজন হয় না।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে দু প্রকার জ্ঞানের তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুগত জ্ঞান নির্ভর সকল প্রকার গ্রন্থকে নিকৃষ্টতম জ্ঞানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সকল গ্রন্থরাজি কোনভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করতে পারে না। কঠ উপনিষদে নচিকেতা-যম সংবাদেও অনুরূপ ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে। যখন নচিকেতা সর্বপ্রকার শ্রেয় ও প্রেয় দ্রব্যে প্রলুব্ধ না হয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করার ইচ্ছায় নিশ্চল অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তখন যমকে স্তগতোক্তি করতে দেখা যায় যে নচিকেতা অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভকেই একমাত্র চরম উদ্দেশ্য হিসেব গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। যারা জ্ঞানবান তারা শ্রেয়োলাভের জন্য ইচ্ছুক হয় আর অজ্ঞান প্রভাবিত লোকেরা প্রেয়কে বরণ করে। এই জ্ঞানই বিদ্যা এবং অজ্ঞানই অবিদ্যা। নচিকেতাকে উভয় দিক থেকেই যাচাই করা হয়েছে। অতএব নচিকেতা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত। কঠ উপনিষদে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে—[৬] দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর ভিন্ন ও বিরুদ্ধ পথগামী। এককথায় তাদের গতি ও ফল পৃথক।[৭] —অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। যারা অবিদ্যা প্রভাবিত তারা নিজেদেরকে প্রজ্ঞাবান এবং শাস্ত্রকুশল বলে মনে করে।

আর বিষয়রাজির গোলকধাঁধায় ঘুরে মরে কখনোই গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারে না। আর এইভাবে সংসারচক্রে বাঁধা পড়ে মৃত্যুর অধীন হয়। অপরপক্ষে যারা জ্ঞানবান তারা দৃশ্যমান জগতের মোহে আবদ্ধ থাকে না। আত্মজ্ঞানে বলীয়ান হয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধনা করে। নচিকেতা তোমাকে আত্মজ্ঞান প্রার্থীই মনে করি। কোন কাম্যবস্তু তোমাকে প্রলুব্ধ বা বিচলিত করতে পারে নি। এই ভাবে কি কঠ উপনিষদে কি ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মজ্ঞানকে জ্ঞান বা পরাবিদ্যা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে আর বিষয়জ্ঞানকে অজ্ঞান, অপরাবিদ্যা বা অবিদ্যা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই দুই প্রকার জ্ঞান দুই পরস্পর বিরোধী আদর্শকে চিহ্নিত করছে। বিষয়-জ্ঞান সর্বস্ব অপরাবিদ্যা বস্তুজগত সম্বন্ধী আর আত্মজ্ঞান সর্বস্ব পরা বিদ্যা অতীন্দ্রিয় পরলোকসম্বন্ধী। শঙ্করাচার্য সুন্দরভাবেই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন—অপরাবিদ্যা সংসারে আসক্ত চিত্তের জন্য আর পরাবিদ্যা সংসার নিরাসক্তের জন্য। স্পষ্টতই এই উক্তি প্রমাণ করছে এই দ্বিবিধ জ্ঞান আমাদের দুই বিপরীত মার্গে নিয়ে যায়—একটি বস্তুতান্ত্রিক অপরটি ভাবতান্ত্রিক। ফলে এই দুই জ্ঞানতত্ত্বে আমরা বিপরীতের দ্বন্দ্ব ভিন্ন অন্য কোন কিছুর আভাষ পাই না।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সমগ্র উপনিষদ সংগ্রহেই ভাবতান্ত্রিক আত্মবাদেরই সার্বিক প্রাধান্য। অবশ্য এ অনিবার্য ছিল। কেননা তৎকালীন সমাজকাঠামোয় যে শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল সেই শ্রেণী দর্শন তো অধিক গুরুত্ব সহ উপস্থিত থাকবেই। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় যা তা হল সেই যুগে তো নয়ই আজও পর্যন্ত কোন ব্রহ্মবাদী কোনভাবে কোন ঐক্যমতে এসে সদর্থক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেননি। যার ফলে সেই যুগে তো অবশ্যই আজও ব্রহ্মমার্গকে নঙর্থক বলয়েই রাখা হয়েছে। অপরপক্ষে ইহলোকবাদী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন কেবল এই দৃশ্যমান ইহলোকই আছে। আর দৃশ্যমান সকলকিছুই সত্য। এইভাবে বিষয়জ্ঞান সর্বস্ব ইহলোকবাদী জগৎ বৈচিত্র্যকে সদর্থক ব্যাখ্যায় উপস্থিত করতে সর্বদাই সচেষ্ট। যা অব্যাখ্যাত তারও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তুলে ধরে কেন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বিপরীতে অতীন্দ্রিয় পরলোকবাদী, যুক্তি নয় অচলা বিশ্বাসকেই আত্মজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন বলে ঘোষণা করেছেন।

বেদই হলো প্রথম লিখিত সংগ্রহ,[৮] সঙ্কলিত হওয়ার পূর্বে বৈদিক সাহিত্য গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। যখন লিপি আবিষ্কার হল, সমাজ-বিকাশের ধারায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটল তখনই এই সঙ্কলনের আয়োজন। সমাজ-

বিকাশের ধারায় বিশেষ পরিবর্তন বলতে সমাজ পরিকাঠামোর পরিবর্তন। এতদিন সমাজ প্রশাসন সীমাবদ্ধ ছিল গণ ও ব্রাতের মধ্যে। যাকে সহজভাষায় গোষ্ঠী বা ট্রাইব বলা হয়। কিন্তু সেই সমাজ পরিকাঠামোয় ভাঙন ঘটল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। দশজন রাজার যুদ্ধ বলে অভিহিত ঘটনাই আসলে তেমনই এক ট্রাইবের যুদ্ধ। কাহিনীতে যদিও বিশেষ উপজাতির অন্তর্লীন বিরোধের ঘটনা চিহ্নিত কিন্তু এই যুদ্ধে আদি অধিবাসীরাও জড়িয়ে পড়েছিল।

বিপরীতের দ্বন্দ্ব : যুক্তি বনাম বিশ্বাস

উপনিষদ, বেদের সমালোচনায় মুখর হলেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আসলে তা বৈদিক শিক্ষারই ক্রম পরিণতি। যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব বৈদিক প্রবাহে সুপ্ত ছিল তাই উপনিষদে এসে উপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টিগত ছান্দসিক প্রকাশের সংগ্রহ হল বেদ। ফলে বেদের আদি পর্যায়ের মন্ত্র হল সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে সরল ও স্বাভাবিক বোধ। এগুলিই জগৎ সৃষ্টির গান রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আদি পর্যায়ে সৃষ্টির স্বাভাবিক ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ রূপে চিহ্নিত করা গেলেও কালে কালে তার সঙ্গে অবাস্তব কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে আর্য সামাজিক পরিবেশের ক্রম পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে। ফলে এককালে যা ছিল সৃষ্টির গান, বস্তুবিষয়ক, কালে কালে তা হয়ে দাঁড়ালো মিথ্যা নির্মিতির চর্চাক্ষেত্র। আর দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা বিশ্বাসের পাখায় ভর করে পথ হারালো রহস্যোদ্দীপক পুরাণ কথায়। এইভাবে এক সময় বিশ্বাস গ্রাস করলো যুক্তিকে বৈদিক ঋষি রূপান্তরিত হলেন ধর্মীয় শাস্ত্রের প্রবক্তায়। জন্মগত অধিকার সমাজ অনুশাসনে রূপান্তরিত হল। শুরু হল বর্ণপ্রথা, শ্রেণীভেদ। প্রভাবিত হল সাহিত্য-সংস্কৃতি দর্শন। সঙ্গে সঙ্গে বিভাজিত হল সমাজ। দ্বৈত ভাবাধারায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। পরস্পর বিরোধী সমান্তরাল সংস্কৃতি পথ করে এগোতে থাকল। এইভাবে যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বৈরথ অগ্রসরতাই বৈদিক শিক্ষার চালিকাশক্তি। তা সূচীমুখ পেল উপনিষদে এসে। বেদের শেষ পর্যায়ে উপনিষদে দেখা যায় ধর্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার জাগরণ। আর নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ধর্মসাধনার কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে উপনিষদ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই প্রতিবাদ প্রতিপক্ষকে পাছে উৎসাহিত করে তোলে, বিদ্রোহে রসদ সরবরাহ করে তাই উপনিষদকারদের প্রচেষ্টা ছিল কোনভাবে ধর্মীয় সাধনায় পরিবর্তন আনা। ধর্ম সাধনায় নৈতিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে ধর্মকে ধর্ম উপাসনার গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করা।

কিন্তু এই পরিবর্তন প্রস্তুতি বাধাহীন ছিল না। কেননা প্রকৃতির উদ্গাতা ঋষি ইতিমধ্যে পরিপার্শ্বের বস্তুজগতের রহস্য অনুসন্ধানে নতুন নতুন দিক আবিষ্কার

করতে শুরু করেছেন। বিশ্বরহস্যের ইতিবৃত্ত হিসেবে পঞ্চ ভূতাত্মক উপাদান। আর সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক চর্চার পূর্বাপর ধারায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হতে থাকল। এইভাবে প্রকৃতিবিদ্যা যা ছিল ত্রিলোকের ইতিবৃত্ত সূর্যস্তুতি, উষাস্তুতি, অগ্নিস্তুতি, বায়ুস্তুতি ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত তার পরিবর্তন সাধিত হল। ঋত সম্পর্কিত ধারণারও রূপান্তর ঘটল। বিশ্বরহস্য চিহ্নিত হল যথাক্রমে অব্যক্ত ও ব্যক্ত হিসেবে। যা পূর্বে আকারহীন, অনন্ত, আবস্তপূর্ব শক্তি হিসেবে ছিল তাই ব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতিতে। সৃষ্টি হল পঞ্চ আদি উপাদানের বিশেষ সংমিশ্রণ। আর ধ্বংশ হল সেই সমন্বয়ের বিযুক্তি। সৃষ্টি ও ধ্বংস হল জগতের চলমান প্রক্রিয়া। এইভাবে নানান আঁক বাঁক পথ করে প্রকৃতি বিদ্যা এগোতে থাকে। এই প্রকৃতি দর্শনের স্বাভাবিক বিকাশ দর্শনের প্রকৃতি নির্মিতির চর্চাকারদের দ্বারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। ব্যক্ত জগতের গোলক ধাঁধায় নয় অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচনই দর্শনের সার কথা। নিজেকে জানলে বিশ্বরহস্য জানা যাবে। আর তার জন্য নৈতিক অনুশাসন প্রয়োজন। এইভাবে পূর্বাপর ধারায় সইয়ে সইয়ে ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যজগতের ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ক্রমশই নৈতিকতা যুক্ত করতে করতে বাধ্যবাধকতাযুক্ত আত্মতত্ত্বের উন্মেষ ঘটে একসময়। এই ভাবে ভাবজগত প্রকৃতিতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের দ্বন্দ্বে মুখর হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ আমরা দেখি উপনিষদের সূচনাপর্বেই। উপনিষদ আলোচনা শুরু দার্শনিক বিতর্ককে কেন্দ্র করেই। আর সেই বিতর্কের ধ্বনি প্রতিধ্বনি সবকটি উপনিষদেই ঘুরে ফিরে এসেছে। সেই সকল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু যুক্তি বনাম বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য[১] সংবাদের মধ্যে আমরা প্রথম এইরকম দার্শনিক বিতর্কের পরিচয় পাই। রাজা জনক তাঁর সভায় একবার দার্শনিক বিতর্কের আসর আহ্বান করেন। তিনি সেখানে ঘোষণা করেন এই বিতর্কে যিনি জয়ী হবেন তিনি স্বর্ণ মুদ্রা শোভিত এক সহস্র গরু গ্রহণ করবেন। এই দার্শনিক বিতর্ক চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য বাদানুবাদে। বিতর্কের মূল বিষয় হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস বা আদি সূত্র কি? এই বিতর্ক যখন চরম উৎকর্ষ লাভের সময় হয় তখন হঠাৎই মাঝপথে উদ্দালক অস্বাভাবিক নীরবতা পালন করলেন। নাকি নীরবতা পালন করানো হলো অনিবার্য কারণে তা গবেষণার বিষয়। অবশ্য এরপর প্রতিবাদী গার্গীকে দিয়ে বিতর্ককে প্রলম্বিত করা হয়। উদ্দালকের এই নীরবতা যে কেন তার নানান আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা

উপস্থিত করা যায়। আমরা অন্যত্র তার কিছু কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমরা এখন উপনিষদের পরিসরে উদ্দালকের অন্য কি কি চিত্র পেয়েছি তার আলোচনা করব।

বৃহদারণ্যকের ঐ বিতর্কে উদ্দালকের নীরবতার পর্দা টেনে দেওয়া হলে ও অন্যান্য উপনিষদে উদ্দালকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব সহ উল্লিখিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চাল জনপদের সভায় উপস্থিত হন। তখন সেখানে জীবলের পুত্র প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করেন, তোমার পিতা কি তোমাকে সমূহ উপদেশ দিয়েছেন? প্রবাহণ এরপর একের পর এক পাঁচটি প্রশ্ন করেন। কি সেই সব প্রশ্নের বিষয়? চিত্তাকর্ষক যা তা হলো সেই সকল প্রশ্নের একটিই বিষয়। তা সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় পরলোক। বিশেষ করে মৃত্যুর পর প্রাণীরা যে ঊর্দ্ধলোকে যায় তার সম্পর্কে উদ্দালক কোন উপদেশ দিয়েছেন কিনা? শ্বেতকেতু এ সম্পর্কিত কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে না পেরে পিতার নিকট ফিরে আনুপুর্ব্বিক সমস্ত তুলে ধরলেন। উদ্দালক স্পষ্টই স্বীকার করেছেন[২] যথা অহম্ এষাম্‌ন একম্ চন বেদ, যদি অহম্ ইমান্ অবেদিষ্যম্, কথম্ তে ন অবক্ষ্যম্ ইতি? যেহেতু এই সকল প্রশ্নের একটিও আমার জানা নেই সেইজন্য তোমাকে এই বিষয়ে কোনরূপ উপদেশ দিই নি। যদি আমি এইসব জানতামই তবে কেন তোমাকে বললাম না। শুধু ছান্দোগ্য উপনিষদে নয় অন্যান্য উপনিষদেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। আমরা এখানে বিশেষ করে কৌষীতকি উপনিষদের উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। কৌষীতকি উপনিষদের[৩] প্রথম অধ্যায়েই শ্বেতকেতুকে পরলোক তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হয়েছে। শ্বেতকেতু বা উদ্দালক কেউই এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হয়েছেন। স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে এ বিষয় তাঁদের অজানা। অথচ সেই যুগের এত বড় পণ্ডিত, সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়েও তিনি পরলোক সম্পর্কিত বিপক্ষ তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই নীরব থাকলেন এবং জানা নেই বলে আগ্রহ প্রকাশ করছেন সেই পরলোক তত্ত্ব আসলে কি? সেই সম্পর্কে জানার। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ উদ্দালক কতখানি পরমতসহিষ্ণু বিচক্ষণ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন।

উদ্দালক ধৈর্য সহকারে পুত্র সহ সেই পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েও পরলোকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার সামান্যতম প্রয়াস ও অন্যত্র করেন নি। উদ্দালক সম্পর্কিত যেটুকু উক্তি ও ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে তার কোথাও এমন প্রমাণ নেই। বরং যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে পরলোকতত্ত্ব অস্বীকারই যে প্রধান হয়ে

দাঁড়িয়েছে তা নয় এই পরলোকতত্ত্ব বিরোধী ইহলোক সর্বস্বতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্দালকের বিশেষ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই প্রচেষ্টায় কোন প্রকার অন্ধ বিশ্বাস বা সেই সম্পর্কিত কোনরূপ উৎসাহ তো জাগানো হয় নি বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জগত থেকে বিষয়বস্তুর উদাহরণ তুলে ধরে যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে।

গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসা পুত্র শ্বেতকেতুর গম্ভীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত স্বভাব দেখে বিস্মিত হলেন। তুমি রাজন্যবন্ধুর উপযুক্ত বিদ্যাই রপ্ত করেছো। নিজেকে মহামন ভাবতে শুরু করেছো। ভাবছো তোমার তুল্য বেদজ্ঞ আর কেউই নেই। তোমার আচার আচরণে অবিনীত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এ তো সঠিক কোন জ্ঞানীর লক্ষণ নয়। তোমার নিশ্চয়ই সুশিক্ষা প্রাপ্তি ঘটেনি। চিন্তিত উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে সরাসরি বললেন, তুমি কি সেই শিক্ষা আদিষ্ট হয়েছো যে শিক্ষার বলে মানুষ অশ্রুত বিষয় শোনে, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করতে পারে, অজ্ঞাত বিষয় জানতে পারে? শ্বেতকেতু তার বিন্দু বিসর্গও অবহিত হয় নি। তাই জিজ্ঞাসু হয়ে পিতার কাছে শিক্ষাপ্রার্থী হলেন।

আর চিত্তাকর্ষক বিষয় হল উদ্দালক সেই গোপন সূত্র কি এককথায় তুলে না ধরে একের পর এক দৈনন্দিন লোকায়ত জগত থেকে উদাহরণ তুলে ধরে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।[৪] যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। হে সৌম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড জানলেই মৃত্তিকার পরিণামভূত সকল দ্রব্যকেই জানা যায়, তেমনই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু নিচয়কে জানলেই তার আদি উৎস জানা যায়। মৃত্তিকার পরিণাম-ভূত দ্রব্যসকল মৃত্তিকাই। যেমন ঘট, পট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হলেও এখানে তার আদি ভূত মৃত্তিকাই সত্য। মৃৎপাত্রগুলি ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নামে চিহ্নিত বস্তুমাত্র। এগুলি কেবল নাম মাত্র। এই বিভিন্নতা ছাড়া সকলেই কিন্তু মৃত্তিকা থেকে জাত। সকল ক্ষেত্রেই মৃত্তিকাই সত্য। অনুরূপভাবে—যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। একটি সোনার পিণ্ডকে জানলেই সকল সোনার বস্তুকেই জানা যায়, কেবল সকল সোনার বস্তুই সোনার পরিণামভূত। বিকারমাত্রেই নামে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধক দ্রব্যমাত্র। যেমন ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার বালা, কঙ্কণ, বাউটি, হার বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু এ সবের মূলে সোনাই সূত্র, একান্তই সত্য। অনুরূপভাবে—যথা সৌম্যেকেন

নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি। হে সৌম্য একটি লৌহপদার্থ যেমন নরুণকে জানলেই সব লৌহময় বস্তু জানা যায়। বিকার নাম সম্বলিত প্রয়োজন সাধক ভিন্ন বস্তুমাত্র। এ সবের মূলে লৌহই সত্য। এই সূত্র লৌহ জানলে সকল লোহা নির্মিত বস্তুকেই জানা যায়। এই রকমই জগতের আদি সূত্র জানলে জগতের সকল বৈচিত্রকেই উপলব্ধি করা যায়।

এইভাবে উদ্দালক ব্যবহার্য বস্তুসকলের সূত্র ধরে জগতের আদিসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হল লোকায়ত জীবন থেকে ব্যবহৃত উপাদান গ্রহণ। আর যে সকল উদাহরণ নেওয়া হয়েছে তার থেকে প্রমাণিত সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক কারিগরিকেই বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করছে যে সেই সমাজে কারিগরি বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আর জগততত্ত্ব ব্যাখ্যায় অত্যন্ত প্রত্যয়নিষ্ঠ করে বোঝানো হয়েছে যে এই বস্তুজতের আদিসূত্র কি হতে পারে।

এই বিশ্লেষণ থেকে তিনটি মূল বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত জ্ঞানের সর্বোচ্চ বস্তু কি? দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মাণ্ডের আদিসূত্র কি? তৃতীয়তঃ ব্যক্ত পৃথিবীর পশ্চাতের বিষয় কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উদ্দালক গ্রামের কারিগরি বিজ্ঞান থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন যথাক্রমে মৃৎপাত্র, স্বর্ণালংকার ও লৌহ নির্মিত বস্তু ইত্যাদি। আর অত্যন্ত যুক্তি পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলে ধরে বুঝিয়েছেন যে স্পষ্ট মৃৎপাত্রের অন্তর্নিহিত সত্য কি? উত্তর হল মৃত্তিকা। তেমনি ধারা উত্তর স্বর্ণালংকার ও লৌহ নির্মিত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাই যদি হয় তবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রশ্নে ও আমরা বস্তু বিশ্লেষণকেই যদি বিষয় করি তবে তার অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হব। অনুরূপভাবে ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুকে সমীক্ষা করলেই দেখা যাবে তার মূল অন্তর্নিহিত সত্য হল বস্তুই। এইভাবে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে লোকায়ত ব্যবহার দৈনন্দিন জগত থেকে সহজবোধ্য বিষয় তুলে এনে সমীক্ষা করে তার অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সহজভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়রাজি সমীক্ষা পূর্বক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সর্বোচ্চ সত্য কি। নিশ্চয়ই বস্তুকে চিহ্নিত করতে হবে। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতায় কেবল বস্তু পৃথিবীকেই দেখি। তাই জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিষয় বস্তুই।

এমনকি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ও উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে নিহিত। কি সেই প্রশ্ন যে ব্রহ্মাণ্ডের আদি সূত্র কি? এর উত্তরে বলা যায় যে যেমন মৃৎপাত্র

স্বর্ণালংকার ইত্যাদির আদিসূত্র মৃত্তিকা, স্বর্ণ ইত্যাদি তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়-রাজিকে বিশ্লেষণ করলেই তার আদিসূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। আর সেই আদিসূত্র বস্তু না হয়ে পারে না। কারণ যে কোন বিষয়কে সমীক্ষা করলে আমরা বস্তুকেই চূড়ান্ত মুহূর্ত পযন্ত উপলব্ধি করি।

তৃতীয় প্রশ্নও প্রথম দুটি প্রশ্নের সহযোগী। যদি তাই হয় তবে এই ব্যক্ত বস্তুপৃথিবীর পূর্বাবস্থা কি ছিল। এর উত্তরও দিয়েছেন উদ্দালক তা উপনিষদেই রয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক বলছেন[৫]—সৎ এব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ। এই জগৎ ব্যক্ত হওযার পূর্বে সৎ বা অস্তিত্বরূপে বর্তমান ছিল। সেই অবস্থা হল অব্যক্ত অবস্থা। জগৎরূপে ব্যক্ত হওয়ার পূর্বে জগতের যাবৎ বস্তুরাজি অব্যক্ত বস্তুপিণ্ডরূপে বর্তমান ছিল। এই প্রসঙ্গে উদ্দালক পূর্বপক্ষীয়দের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। উদ্দালক স্পষ্টই বলেছেন—তৎ হ একে আহুঃ অসৎ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জাযত। কারো কারো মতে পূর্বে এই জগৎ এক এবং অদ্বিতীয় অসৎরূপে বর্তমান ছিল। সেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের উৎপত্তি ঘটেছে। উদ্দালক এই যুক্তি খণ্ডন করেছেন। অসৎ থেকে সৎ এর উৎপত্তি কিভাবে সম্ভব। অনস্তিত্ব কখনো অস্তিত্বের জন্ম দিতে পারে না। তাহলে তো বলতে হয় শূন্য থেকে সকল কিছুর উদ্ভব। অস্তিত্বই কেবলমাত্র অন্যকোন অস্তিত্বকেই সৃষ্টি করতে পারে। যার কিছুই নাই সে কোন কিছুকে সৃষ্টি করবে কি করে? এইভাবে পূর্বপক্ষীয বক্তব্যকে খণ্ডণ করে উদ্দালক বললেন, বরং এই জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় সৎ রূপেই বর্তমান ছিল। আর অন্তর্নিহিত ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলেই এই জগৎ বৈচিত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। উদ্দালক ব্যাখ্যাত সৎ অবস্থা তাহলে দাঁড়ায় জগৎরূপে ব্যক্ত হওয়ায় পূর্বে অব্যক্ত অবস্থা হল বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানের সমাহার। যাকে অখণ্ড বস্তুপিণ্ডরূপেই চিহ্নিত করা যায় উদ্দালক একে মহাভূত বলেছেন। এই মহাভূত বা বস্তুপিণ্ডই সৎরূপে বর্তমান ছিল।

পরমুহূর্তে এই আলোচনা অভিনব রূপ পরিগ্রহণ করে। জগৎ ব্যাখ্যা এক নতুন দিকে মোড় নেয়। সেই প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা দরকার। প্রশ্ন হল যদি একথা সত্য বলেও ধরে নেওয়া যায় যে জগতের আদি উপাদান বস্তুই তবে প্রাণ বা চেতনার সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। চেতনা বা প্রাণও কি বস্তু সম্ভূত? এক্ষেত্রে উদ্দালক সেই যুগের পরিসর অনুযায়ী বস্তুকেই একমাত্র তত্ত্বরূপে উপস্থিত করেছেন। সেই যুগে বস্তু শব্দটি ভূত শব্দে চিহ্নিত। উদ্দালক বলছেন মহাভূতের

ব্যক্ত অবস্থা হল এই জগৎ। প্রাণ বা চেতনা এই শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন শরীর ভূত উপাদান সম্ভূত তেমনই প্রাণ বা চেতনাও ভূত উপাদান সম্ভূত। এখানে উল্লেখ করার সেই যুগে মহাভূতকে তিনটি পরম অংশে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছিল।[৬] তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকম্ করবানি ইতি। সেই ত্রিবৃৎকরণ, তিন উপাদান যথাক্রমে তেজ অপ্ ও অন্ন থেকেই যাবৎ সৃষ্টি সম্ভূত। মন বা প্রাণ অন্ন সম্ভূত।[৭] অন্নম্ অশিতম্ ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যঃ মধ্যমঃঃ, তৎ মাংসম্ যঃ অনিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ। অন্ন ভুক্ত হলে তিনভাগে বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূলতম অংশ মলে, মধ্যম্ অংশ মাংসে এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়। কি প্রকারে এই ব্যাপার সংঘটিত হয় তাও উদাহরণ সহকারে উদ্দালক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন করে দধি মন্থন করলে তার সূক্ষ্মতম অংশ উপরে উঠে আসে এবং তা ঘৃত হয় অনুরূপভাবে ভুক্ত অন্নের সূক্ষতম অংশই মনে পরিণত হয়। এইভাবে কেবল বাস্তব উদাহরণেই উদ্দালক নিশ্চুপ হন নি। তিনি এই তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধির জন্য শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন এই ষোলকলাযুক্ত শরীর যে মহাভূতের ত্রয়ী উপাদান সম্ভূত তার সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তিনি শ্বেতকেতুকে বললেন, পনেবদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে প্রয়োজনে কেবল জল পান করো কেননা জল পানে প্রাণ যায় না, তারপর এসো। শ্বেতকেতু সেই আদেশ পালন করে। আর পনেরদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে শ্বেতকেতু তার স্মৃতি হারায়। কোন রকমেই শাস্ত্রপাঠ উদ্ধার করতে পারে না। উদ্দালক তখন অন্ন গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। এবাব শ্বেতকেতু স্মৃতি ফিরে পায়। এইভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে উদ্দালক বোঝালেন যে জল প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম কিন্তু অন্ন ব্যক্তির শরীর ও চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে। অতএব চেতনা বা প্রাণ বস্তু সম্ভূতই। যেমন করে অন্যান্য বস্তু অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ব্যক্ত হয় তেমনই মনও ব্যক্ত হয়। চেতনা বা প্রাণের আদি উপাদান সেই মহাভূত বা বস্তুই।

উদ্দালক এতৎসত্ত্বেও নীরব না হয়ে শ্বেতকেতুর শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য পুনরায় শ্বেতকেতুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্য দিয়ে যেতে বললেন। তিনি শ্বেতকেতুকে বললেন, জলপূর্ণ পাত্রে লবণ খণ্ড ফেলে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে পরের দিন এসো। পরদিন শ্বেতকেতু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে এলে উদ্দালক জিজ্ঞাসা করলেন, জলপূর্ণ পাত্রের কোথাও লবণ খণ্ড দেখতে পেলে? উত্তরে শ্বেতকেতু বললেন—না, কোথাও দেখতে পাইনি। উদ্দালক বললেন লবণ খণ্ডটি জলে দ্রবীভূত

হয়ে গেছে। তার প্রমাণ হিসেবে তিনি শ্বেতকেতুকে বললেন, এই পাত্রের জলের বিভিন্ন অংশ থেকে স্বাদ গ্রহণ কর। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় শ্বেতকেতু দেখলেন জলের সর্বত্রই লবণাক্ত স্বাদ। এবার দেখলে খালি চোখে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভৌত উপাদানকে দেখা যায় না। অথচ দেখছো না বলে যে তাদের অস্তিত্ব নেই, তা নয়। এই ভৌত উপাদান সমূহই আদি সূত্র।[৮] সঃ যঃ এষঃ অনিমা এতৎ আত্মাম্ ইদং সর্বম্' তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বম্ অসি। এই যে অনিমা, এটাই হল জগতের আত্মা, আদিসূত্র। এই যে অনিমা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভৌত উপাদান সমূহই সত্য, এই-ই আত্মা, হে শ্বেতকেতু এমনকি তুমিও তাই। তোমার থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বস্তু সেই আদি উপাদান ত্রয় থেকে উদ্ভূত এবং পরিশেষে সেই আদি মহাভূতেই সমস্ত কিছুই বিলীন হয়ে যায়। সৃষ্টি হল সেই আদি উপাদান সমূহের সমন্বয় আর মৃত্যু হল সেই উপাদান সমূহের বিমুক্তি। মৃত্যুপথযাত্রী প্রথম তার স্মৃতি বা সংজ্ঞা হারায় তারপর বাক্য এবং সবশেষে তার জীবনপ্রবাহ ও তেজ। অতএব মৃত্যু হল উপাদানসমূহের আদি ভূত সৎ-এ সম্মিলন। সেই সৎ বা অস্তিত্ব থেকেই প্রথম সৃষ্টি হয় তেজ, জল ও অন্ন। এইসব উপাদান বাস্তব এমনকি তুমিও তারই প্রতিফল। এইভাবে উদ্দালক যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন তা যুক্তিনির্ভর ও লোকায়ত। এই অব্যক্ত প্রকৃতিকেই সৎ রূপে চিহ্নিত করেছেন উদ্দালক। এই সৎ, অতীন্দ্রিয় নিরাকার নিরালম্ব কোন তত্ত্ব নয় একান্তই পরীক্ষা-শ্রয়ী যুক্তি নির্ভর লোকায়ত। অন্ধ বিশ্বাসের এখানে কোন ঠাঁই নেই।

বিপরীতে যাজ্ঞবল্ক্য বিতর্ক সভায় সম্পূর্ণ ভিন্ন বলয় থেকে যাত্রা শুরু করলেন। উদ্দালক যেখানে বস্তু পৃথিবী থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আত্মজগতের ব্যাখ্যা দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে সকল কিছুকে বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে আত্মা থেকেই যাত্রা শুরু করলেন। বিতর্ক সভায় উদ্দালকের লোকায়ত তত্ত্বই যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক অবজ্ঞাত হয়েছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ায় বিতর্ক ক্ষেত্রে উদ্দালক যাজ্ঞ-বল্ক্যের সঙ্গে পুনরায় কোন বিতর্কে না গিয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেন। এই নীরবতা আসলে না স্বীকার না অস্বীকার। অথচ গার্গী প্রতিবাদী সত্তাকে জলা-ঞ্জলি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে একই সুরে সক্রিয় সমর্থনে যেখানে ইতি টানলেন উদ্দালক সেখানে মৌনীভাব অবলম্বন করে প্রতিবাদী ধারাকে প্রবাহিত রাখলেন। কিন্তু তা প্রবাহিত হতে থাকলো নীরবে আঁক বাঁক পথে লোকায়তে। আর যাজ্ঞবল্ক্যের জয়যাত্রা অভিনন্দিত ও রাজন্যপুষ্ট হয়ে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেল। যাজ্ঞ-বল্ক্য ঘোষণা করলেন আত্মা বা ব্রহ্মাই জগতের আদি সূত্র। অন্তর্যামী। সকল

কিছুর নিয়ন্তা। আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান কিন্তু কোনভাবে ভূতরাজির দ্বারা আশ্লিষ্ট নন। এই পরমাত্মাকে কখনো জানা যায় না। নঙর্থক দিক থেকে কেবলমাত্র তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। অচলা বিশ্বাসই এর চালিকা শক্তি।

এই আত্মতত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন এই জগতের যাবৎ বস্তু যে প্রিয় বোধ হয় তা তাদের কামনার জন্য নয় আত্মকামনার জন্যই সকল বস্তু প্রিয় বোধ হয়।[৯]—ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়াত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবনেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্। হে মৈত্রেয়ী এই আত্মাই সকল কিছুর মূল। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই সমস্ত অবগত হওয়া যায়।

এই আত্মা বা ব্রহ্মের দ্বৈত রূপ বোধ হয়। মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর স্থিতিশীল ও গতিশীল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত।[১০] দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবা-মূর্তং চ মর্ত্য চামৃতং চ যচ্চ সচ্চ তচ্চ। অজ্ঞান বশতঃই ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ এই দ্বিবিধ বোধ হয়। আসলে ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র চরম সত্য। এই চরমসত্তাকে কখনো সদর্থক দিক থেকে উপলব্ধি করা যায় না। নঙর্থক দিকই উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।[১১] অথ অতঃ আদেশঃ নেতি নেতি। 'নেতি নেতি' এই নঙর্থক প্রক্রিয়াযই কেবল ব্রহ্ম বা আত্মার উপলব্ধি ঘটতে পারে। যদি প্রশ্ন আসে কি রকম সেই প্রক্রিয়া? এর উত্তর ও এই বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্ট করেই উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা এখানে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি। যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য জগতের ভিত্তি বা অধিষ্ঠান সম্পর্কে নঙর্থক বর্ণনায় গার্গীকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে ব্রহ্ম বা আত্মা স্থূল নন, অণু নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, স্নেহবস্তু নন, ছায়া নন, তমঃ নন, আকাশ নন ইত্যাদি। আমরা এখানে সেই অংশটিই তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।[১২]—এতৎ বৈ তৎ অক্ষরম্ গার্গী! ব্রাহ্মণাঃ অভিবদান্তি—অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়াম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অব্যাহ্যম্।

কিন্তু এই নঞর্থক পদ্ধতিকে কেবলমাত্র নঞর্থকসর্বস্ব ভাবলে ভুলই করা হবে। কেননা এই নঞর্থক পদ্ধতির সাহায্যে সদর্থক চরম সত্তার উপলব্ধি হয়। যে

কেউই এই বিশ্বজগতের সকলকিছুকে স্ববিরোধী বলে বাতিল করতে পারে। কিন্তু কেউই তার নিজের চিন্তাশীল অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এই চিন্তাশীল জীবাত্মা থেকেই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। জীবাত্মাই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির একমাত্র পথ। এই আত্ম-উপলব্ধিই চরম উপলব্ধি। একমাত্র চৈতন্যময় সৎ। আর সকলকিছুই অসৎ এই আত্মা বা ব্রহ্ম অধরা, অছোঁয়া, অচিন্ত্যনীয়, অনির্বচনীয়, নিরাকার, অসীম ও অনন্ত। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মা অস্তিত্বশীল ছিল। আত্মাই উপলব্ধি করলেন বহু হব। সেই থেকে এই জগতবৈচিত্র। এই আত্মাকে জানলেই সকলকিছু জানা যাবে। কারণ আত্মাই এই বিশ্বের এবং চৈতন্যের অধিষ্ঠান। এই আত্মা আনন্দময। আত্মা আনন্দময় বলেই জীবন আমাদের কাছে এত প্রিয়। আত্ম উপলব্ধিই আনন্দ উপলব্ধি। এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই ব্যক্তিকে শোকের অপর পারে নিয়ে যায। তখন তার উপলব্ধি হয় আমিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম উপলব্ধি হলে সকল জগতের কারণ অকারণ উপলব্ধি ঘটে। ব্রহ্মবিদের কাছে এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মের পরিণামমাত্র। এই পরিণাম হল নাম ও রূপে প্রকাশ।

এখানে আমরা নারদ সনৎকুমার সংবাদ তুলে ধরতে পারি। সনৎকুমার নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানান আপনি যে সকল বিদ্যা এ পর্যন্ত বপ্ত করেছেন এ সবই নামমাত্র। অবশ্য যাত্রা শুরু করতে হবে এই নাম থেকেই। এরপর তিনি নির্দেশ দেন আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য নামকেই আত্মা বা ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার উত্তরে বললেন বাক্ নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাককেই উপাসনা কর। নারদ বাক্-এর উপাসনা করলেন। তারপর আবার সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন বাক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন। নারদ এবার মনের উপাসনা শুরু করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংকল্প। নারদ সংকল্পের উপাসনা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন সংকল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ। নারদ চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। নারদ ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিজ্ঞানও সীমিত। বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল বল। অবশ্য বলও

সীমিত। কেননা বলবান ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যাক্তিকে ভয় পায়। নারদ তখন জিজ্ঞাসা করলেন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্নও সীমিত। কেননা কেউ যদি পরপর দশদিন অন্ন গ্রহণ না করে তো দুর্বল হয়ে যায়। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বললেন অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জল। কিন্তু জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তেজ। কেননা তেজ অন্ধকার দূরীভূত করে। অবশ্য তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্তমান। তা হলো আকাশ। নারদ আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা শুরু করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি? সনৎকুমার উত্তর করলেন হ্যাঁ আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বর্তমান। আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতির আবার অনন্ত স্বাধীনতা। এই স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ। যখন স্মৃতি আশা দ্বারা উদ্দীপিত হয় তখন স্মৃতি জীবনের সীমা অতিক্রম করে। এই জন্য আশা ইহলোক, পরলোক কামনা করে। কিন্তু এই আশাও সীমিত। আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। নারদ এবার প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করলেন। কেননা প্রাণই সব। যে প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তার কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

নারদ এবার আর একইভাবে জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করলেন। এবার তিনি ক্রমশই যুক্তির অবতারণা করতে থাকলেন। তিনি উৎসাহিত হয়ে এবার প্রশ্ন রাখলেন প্রাণের উপাসনায় না হয় সত্য উদ্ভাসিত হল। কিন্তু যার সত্যজ্ঞান নেই সে কি করে সত্য উচ্চারণ করবে? সনৎকুমার তার উত্তরে বললেন যখন মানুষ মনন করে তখনই সে সবিশেষ জানে। মনন না করলে জানতে পারে না। তখন নারদ বললেন বেশ তবে মননকেই বিশেষরূপে জানতে চাই। সনৎকুমার তখন বললেন যে কেউই মনন করতে পারে না।[১৩] কেবলমাত্র শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ যিনি আস্তিক্যবুদ্ধি, বিশ্বাস সর্বস্ব তিনিই মনন করতে পারেন। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসই সকল কিছুর সার। শ্রদ্ধাবান হলেই মনন করা যায়। এই শ্রদ্ধাই নিষ্ঠা সাপেক্ষ। নিষ্ঠা একাগ্রতা সাপেক্ষ। নিষ্ঠাযুক্ত শ্রদ্ধাই কেবল অসীম অনন্তের কাছে পৌঁছে দেয়। আর এই অসীম অনন্তই অনাবিল আনন্দের উৎস। এই অসীম অনন্ত হল অধরা অছোঁয়া, সকল প্রকার সন্ধান ও যুক্তি তর্কের বাইরে। সেখানে প্রত্যক্ষ নেই, শ্রৌত নেই। যুক্তি নেই কেবল আনন্দ। আনন্দই সর্বত্র বিরাজ করছে। আনন্দানুভূতিই চরম তৃপ্তি। সেখানে অহম্ ও আত্মা একাকার। তখনই চরম প্রাপ্তি। ব্রহ্ম প্রাপ্তি। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে[১৪] অথাতোহহঙ্কারাদেশঃ

অর্থাত আত্মাদেশঃ। অহম্‌ই উপদেশ। অহম দৃষ্টিতে আমি উর্দ্ধে, আমি নিম্নে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে, আমিই সমস্ত। এই আমিই আত্মা। এই আত্মাই নিম্নে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে, আত্মাই সমস্ত। এইই হলো আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব।

উপরোক্ত নারদ-সনৎকার সংবাদ থেকে এটুকু স্পষ্ট এই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সকলেই অর্জন করতে পারে না। কেবলমাত্র অচলা বিশ্বাসসর্বস্ব শ্রদ্ধাবান মননকারী কোন পুরুষই এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেননা এই আত্মলোক বা ব্রহ্মলোক প্রশ্ন রহিত, দৃষ্টি রহিত, শ্রৌত রহিত এক অসীম আনন্দানুভূতির আশ্রয়। একে প্রত্যক্ষে, শ্রবনে, বাকোবাক্যে কোনভাবেই পাওয়া যায় না। এ হল এক অসীম অনন্ত অনুভূতি। একে কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ যাই ব্যাখ্যাযুক্ত তাই তো বাকোবাক্যের শিকার হয়ে পড়বে। সীমিত হয়ে পড়বে। এই ভাবে উপনিষদে অচলা বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, মনন, ধ্যান বা নিদিধ্যাসনকেই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির একমাত্র উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তর্ক বা যুক্তি কখনোই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির মাধ্যম হতে পারে না। কেননা তর্ক বা যুক্তি পরিধি অত্যন্ত সীমিত। কেবল দ্রষ্টার পরিপার্শ্ব বা চৌহদ্দিই অর্থাৎ দৃষ্টজগতই তার সীমা। কিন্তু অটল বিশ্বাস অসীম ও অনন্ত। যে কোন দিকেই তার অবাধ প্রসার। বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মানুষ চিন্তা করে কাজে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বিশ্বাসের স্থান যুক্তি বা তর্কের উর্দ্ধে। এইভাবে সনৎকুমার যুক্তি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসকে উর্দ্ধে স্থান দিয়ে অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখন প্রশ্ন অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব ভিন্ন কি কোন আত্মতত্ত্ব আছে না কি? এর উত্তর উপনিষদ থেকেই পাওয়া যায়। উপনিষদে পরস্পর বিরোধী দুই আত্মতত্ত্বই প্রচলিত। একটি লোকায়ত আত্মতত্ত্ব অপরটি লোকাতীত বা অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব। যাজ্ঞবল্ক্য সনৎকুমার সেই অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেই আত্মতত্ত্বলাভের উপায় হিসেবে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাকেই একমাত্র সোপান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরপক্ষে উদ্দালক প্রবর্তিত লোকায়ত আত্মতত্ত্ব যুক্তি নির্ভর। অসীম অনন্ত অতীন্দ্রিয় লোক নয়, অসীম অনন্ত ইন্দ্রিয়লোকই এই আত্মলোক। এইভাবে উপনিষদে যে বিপরীত শিক্ষাদর্শ ক্রমশই সূচীমুখ হয়েছে তার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু একদিকে বিশ্বাস অপরদিকে যুক্তি। যুক্তি বিশ্বাসের দ্বন্দ্বই এখানে বিপরীতের দ্বন্দ্ব। আমরা আত্মতত্ত্ব আলোচনা করলে বিষয়টির সম্যক উপলব্ধি করতে পারব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মতত্ত্ব : দেহাত্মবাদ বনাম আত্মবাদ

উপনিষদকে কেন্দ্র করে যে কোন প্রকার আলোচনাই শেষপর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি বিশ্ব জিজ্ঞাসা কি করে আত্মজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হল। আবার সেই আত্মজিজ্ঞসা কি করে পরিণতিতে দুই বিপরীত বলয়ে বিভক্ত হল তার পরিচয়ও আমরা পাব। এই দুই বিবদমান শিবির সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই অবহিত হয়েছি। এই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের এক শিবির গড়ে উঠল উদ্দালক বিরোচনকে কেন্দ্র করে অপর শিবির গড়ে উঠল যাজ্ঞবল্ক্য-ইন্দ্র-সনৎকুমারকে ঘিরে। উদ্দালক-বিরোচন যখন আত্মজিজ্ঞাসাকে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় উপস্থিত করলেন তখন যাজ্ঞবল্ক্য-ইন্দ্র-সনৎকুমার আত্মজিজ্ঞাসাকে ভাব-তান্ত্রিক ব্যাখ্যায় উপস্থিত করেছেন। বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী বস্তুজগতের ক্রম উত্তরণের সূক্ষ্মতম উপবস্তু হল আত্মা। শরীর স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্থিতি। শরীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। শরীরের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। অপরপক্ষে ভাবতান্ত্রিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী আত্মার ক্রম-বিকাশই জগৎ ও জীবন। আদিতে আত্মাই ছিল একমাত্র অস্তিত্ব। আত্মা ইচ্ছা করল বহু হব। সেই থেকেই এই সৃষ্টি। সকল কিছুই এই আত্মা থেকে উদ্ভূত এবং পরিশেষে আত্মাতেই বিলীন হয়। আত্মাই জগতের অকারণ কারণ। এই জীবন ও বৈচিত্র আসলে ভান। আত্মার উপলব্ধির উপায় মাত্র। আত্মার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল কিছুই মিথ্যা প্রতীত হয়। ফলে আত্মা ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা অলীক। এই আত্মা আসলে পরমভাব বা পরমাত্মা, চূড়ান্ত অস্তিত্ব।

এখান থেকে আমরা এটুকু স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি যে আত্মাকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব তা আসলে আত্মা সশরীর না অশরীর। সশরীর আত্মার প্রবক্তাগণ বস্তুতান্ত্রিক আর অশরীর আত্মার প্রবক্তাগণ হলেন ভাবতান্ত্রিক। সশরীর আত্মপ্রবক্তাগণের মতে শরীরই আত্মাময় আর আত্মাই শরীর ময়। শরীর পরিচর্যাই আত্মা পরিচর্যা আর আত্মা পরিচর্যাই শরীর পরিচর্যা। আত্মাশরীরের পরিচর্যাতেই সম্যক শান্তি, সুখ, শ্রেয়োলাভের পথ। আত্মাশরীর পরিচর্যাই মূল

কথা। অপরপক্ষে আত্মপ্রবক্তাগণের মতে আত্মা নিত্য, মুক্ত, বুদ্ধ সর্বচরাচরে ব্যাপ্ত। কোন শরীর তাকে কখনো বাঁধতে পারে না। তাছাড়া শরীর মাত্রেই শোকতাপ যুক্ত, মৃত্যু কবলিত। আত্মা অজর, অমর, অমৃত। ফলে অশরীর আত্মাই অমৃত শ্রেয়োলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। অতএব আত্মার কোন শরীরের প্রশ্নই উঠে না।

এই সশরীর আত্মা ও অশরীর আত্মা উপনিষদের পরিভাষায় যথাক্রমে দেহাত্মাবাদ ও আত্মবাদ রূপে চিহ্নিত। এই দুই বিপরীত তত্ত্ব উপনিষদ জুড়ে যে মত সংঘর্ষের অবতারণা করেছে এবার আমরা তা সবিস্তারে উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

দেহাত্মবাদ

উপনিষদে দেহাত্মবাদ উদ্দালক-বিরোচনকে ঘিরে বিবর্তিত হয়েছে। দেহাত্ম-বাদ অনুযায়ী চৈতন্যময় শরীরই আত্মা। দেহ অতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। ভূত উপাদান থেকে যেমন আত্মার সৃষ্টি হয় তেমনই আত্মার উপস্থিতি ততক্ষণ যতক্ষণ ভূত উপাদানগুলি অবিকৃত থাকে। এইভাবে দেহাত্মবাদ হল এমন এক আত্মতত্ত্ব যা সরাসরি ঘোষণা করে যে বস্তু থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি। এমনকি আত্মা ও বস্তু সম্ভূত।

প্রধান প্রধান সবকটি উপনিষদেই এই দেহাত্মবাদ কোন না কোনভাবে উল্লিখিত। তার যাথার্থ প্রতিপাদনে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করব। উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য বিতর্কই বৃহদারণ্যক উপনিষদের কেন্দ্রবিন্দু। আর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ হল প্রাণবিন্দু। মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের যুক্তিকেই হুবহু তুলে ধরে প্রতিবাদী আত্মতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আমরা সেই উদ্ধৃতিটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকম্ এব অনুবিলীয়তে ন হ অস্য উৎগ্রহণায় স্যাৎ। যতঃ যতঃ তু আদদীত লবণম্ এব। এমম্ বৈ অরে ইদম্ মহৎ ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।[১]

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যেমন একখণ্ড লবণ জলে ফেললে তা সঙ্গে সঙ্গেই জলে বিলীন হয়ে যায় তাকে কোনভাবে পৃথক করা যায় না, অথচ যে কোন স্থান থেকে জল নিলে তার লবণাক্ত স্বাদ পাওয়া যায় তেমনই এই অনন্ত অপার মহাভূত

এমনকি বিজ্ঞানময় সমস্ত কিছুই এই ভূত থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার ভূতেই বিলীন হয়। মৃত্যুতেই শেষ, মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না।

এখন এই উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা দরকার। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব রপ্ত করাতে চেয়ে বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসেবে এই উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। এখন প্রশ্ন এই উদ্ধৃতিটি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কেন ব্যবহার করতে গেলেন। উদ্ধৃতিটিই বা কার। যদিও স্পষ্ট করে ওখানে বলা নেই। তবুও উপনিষদ সাহিত্য হাতড়ে এই উদ্ধৃতির কর্তা কে তা খুঁজে বার করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ বহুল ব্যবহৃত দৃষ্টান্তই যাজ্ঞবল্ক্য এখানে তুলে ধরেছেন। স্পষ্টতই প্রতীয়মান এই দৃষ্টান্ত উপনিষদ সাহিত্যে ঋষি উদ্দালকই ব্যবহার করেছেন।[২] ছান্দোগ্য উপনিষদে পুত্র শ্বেতকেতুকে আত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে উদ্দালক প্রত্যক্ষ পরীক্ষার জন্য অনুরূপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন। যার মূল তাৎপর্য আত্মা বা চেতনা ভূত উদ্ভূত উপবস্তু। খালি চোখে এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা না গেলেও দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা উপলব্ধি করা যায়।

এইরকম এক বিপরীত দৃষ্টান্ত যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞান পিপাসু মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব রপ্ত করাতে তুলে ধরেছেন। এই দৃষ্টান্ত যে কোনমতেই যাজ্ঞবল্ক্য কৃত নয় তার প্রমাণ আমরা সঙ্গে সঙ্গেই পাই। মৈত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি স্পষ্টই বললেন এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমাকে বিভ্রান্ত করলেন। জাগতিক মোহের পক্ষে এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রের এই প্রতিক্রিয়া অনুমোদন করে বললেন যে তিনি অসচেতন ভাবে এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেননি। এর প্রয়োজন আছে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বললেন আত্মবাদ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বিপরীত আত্মজ্ঞানও জানা প্রয়োজন। অতএব কোনরূপ মোহ বিস্তার করার জন্য নয় আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির ভিতকে সুদৃঢ় করানোর জন্যই বিপরীত আত্মতত্ত্ব উত্থাপন করেছি। কোন যুক্তিই প্রতিবাদী যুক্তি ভিন্ন ক্ষুরধার হয় না। হৃদয়ে কোনরূপ দাগ কাটে না। বাক্যকে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যই বাকোবাক্যের প্রয়োজন হয়। এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্য কোন চাপল্যবশতঃ নয় সম্বার্থ প্রতিপাদনেই বিপরীত আত্মতত্ত্ব এখানে উল্লেখ করেছেন।

এই বিপরীত আত্মতত্ত্ব নিয়ে কটাক্ষ ঈশ উপনিষদেও বর্তমান[৩]। অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। অসুরদের আবাসভূমি সেই লোকসমূহ অন্ধকার দ্বারা আবৃত। আত্মঘাতী এই সব লোক দেহত্যাগ করে সেই সকল লোকেই অবস্থান করে।

এখানে অসূর্যা বলতে সূর্যবিহীন, জ্যোতির্বিহীন বোঝানো হয়েছে। আচার্য শঙ্কর অসূর্যা বলতে অসুরগণের বাসযোগ্য যে লোক তাকেই অসূর্য লোক বলে অভিহিত করেছেন। এই অসুর সম্প্রদায় অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ। তাই দর্শনহীন অর্থাৎ দৃষ্টি প্রতিরোধক অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এরা আত্ম-ঘাতী, অবিদ্বান, দেহ এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন পৃথক কোন চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যারা এইভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, কামনা বাসনার অধীন হয়ে জীবনযাপন করে তারাই 'আত্মহনঃ' বলে পরিচিত। ফলে তাদের অন্তিমগতি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিষাদময়, জ্যোতির্বিহীন লোকই। এইভাবে ঈশ উপনিষদে বিপরীত লোকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই বিপরীত লোকের একটি হল ইহলোক, যা অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিষাদময়। অপরটি হল পরলোক যা আলোকময় ও আনন্দময়। অতএব এখানেও কারে প্রকারে সুরদের উপনিষদও অসুরদের উপনিষদ যে বিভিন্ন তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। মৃত্যুতে দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটে। অতীন্দ্রিয় আত্মা বা চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। এ হলো অসুর উপনিষদ। অপরপক্ষে সুর উপনিষদ অনুযায়ী মৃত্যুতে দেহের নাশ হলে আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা অজর অমর। আত্মা অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

কেন উপনিষদেও বিপরীত আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এসেছে। এই বিপরীত আত্মতত্ত্ব যথাক্রমে দেহাত্মবাদ ও আত্মবাদ। কেন উপনিষদে বলা হয়েছে জীবনের পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তি। যার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না তার সংসার-গতিই অব্যাহত থাকে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন হয় কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ সর্বভূতে ব্রহ্ম উপলব্ধির দ্বারা এই সংসারগতির উর্দ্ধে উঠে অমৃতত্ব লাভ করেন। কেন উপনিষদে বলা হয়েছে[৪]—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্য অস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ অমৃতাঃ ভবন্তি। এখানে এই উক্তির বিশেষ তাৎপর্য হল মানবজীবনকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপযোগী বলা হয়েছে। যিনি বুদ্ধির প্রত্যয়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন শোক-দুঃখ-তাপময় এই সংসার থেকে মুক্তি পেয়ে অমৃতলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু মানুষ যদি আমি ও আমার এই বোধে দীপ্ত থেকে অনাত্ম বিষয়ে আসক্ত হয়ে দৈহিক সুখ ভোগকেই চরম ভেবে তাতেই মত্ত হয় তারা অন্ধকারময় বিষাদময় লোকেই অবস্থান করে। তাদের মহা বিনাশ হয়। একেই বলা হয়েছে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। জ্ঞানী মানুষজন যেখানে প্রত্যেক বস্তুতে একই আত্মার পরম প্রকাশ চিন্তা করে

একত্বের জ্ঞানে বিদ্যাযুক্তরূপে খ্যাত হন। তেমনি অজ্ঞানী লোক বিভিন্ন বস্তুকে পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন মনে করে অবিদ্যাযুক্তরূপে খ্যাত হয়। এইভাবে কেন উপনিষদে বিপরীত আত্মতত্ত্ব উল্লিখিত হয়েছে।

কঠ উপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদে দেহাত্মবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিক্ষাপ্রার্থী নচিকেতা যমকে আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসে প্রশ্ন করেন[৫] যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। কারো কারো মতে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে আবার কারো কারো মতে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে না, এই যে মৃত্যুর পর আত্মা বিষয়ে সংশয়, এর সঠিক তত্ত্বটি কি? এখানে আত্মা সম্পর্কে বিপরীত তত্ত্বকেই প্রতিপাদিত করা হয়েছে। একদিকে দেহাত্মবাদ, দেহের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার অবস্থিতি অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বিনাশ ঘটে। অপর পক্ষে আত্মবাদ অনুযায়ী আত্মা মাত্রেই দেহ বিমুক্ত, সৃষ্টি-বিনাশ রহিত অতএব শরীরের বিনাশের সঙ্গে এর কোন প্রকার বিনাশের ব্যাপার জড়িয়ে নেই। শরীর বুদ্ধি, মন-ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক আত্মাই পরলোকগামী। এই উভয়প্রকার জ্ঞানই বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে সূচিত। এরা পরস্পর বিপরীত। দূরতম অবস্থানে বিরাজ করে।[৬] দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যা ও অবিদ্যা একান্তই বিপরীত, ভিন্নগতি, ভিন্ন ফলপ্রদ। জ্ঞানই বিদ্যা এবং অজ্ঞান হল অবিদ্যা। অবিদ্যা বা অজ্ঞানী লোকেরা ইন্দ্রিয় সর্বস্ব দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। তাদের মতে দেহ অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নেই। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ। অপরপক্ষে জ্ঞানী লোকের কাছে একথা স্পষ্ট যে দেহ আত্মা নয়। দেহ পরিবর্তনশীল আত্মা অপরিবর্তনীয়। এই ভাবে বিদ্যা হল পরলোক সর্বস্ব তত্ত্ব আর অবিদ্যা হল ইহলোক সর্বস্ব তত্ত্ব। উভয়তত্ত্বই দৃঢ়ভাবে বিপরীত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। একমাত্র কঠ উপনিষদই এই বিপরীত আত্মতত্ত্ব তুলে ধরতে গিয়ে দেহাত্মবাদের কথা দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে। কঠ উপনিষদ পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশিত—অয়ং লোক নাস্তি পর ইতি মানী। এই ইহজগৎ, ইন্দ্রিয় লোকই একমাত্র সত্যি। পরলোক বলে কিছু নেই। কখনো থাকতে পারে না। যদি ও এই মত ভীষণ ভাবে নিন্দিত। এই মতকে বিবেকহীন বালকসর্বস্ব বলে বলা হয়েছে। এরা বিত্তমোহে অন্ধ। তাই বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন। দেহাত্মবাদ এর পাশাপাশি আত্মবাদকে যথারীতি মহিমান্বিত করে তুলে ধরা হয়েছে সমগ্র কঠ উপনিষদ জুড়ে।

দেহাত্মবাদ বিশেষভাবে চিত্রিত ছান্দোগ্য উপনিষদে। প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন

সংবাদের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী আত্মতত্ত্বের পরিচয় পাই। একটু বিস্তৃত-ভাবে এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরব।[৭] তৎ হ উভয়ে দেবাসুরাঃ অনুবুবুধিরে, তে হ উচুঃ—হন্ত তম্ আত্মানম্ অনু ইচ্ছামঃ যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য সর্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি, সর্বান্ চ কামান্ ইতি। ইন্দ্র হ এব দেবানাম্ অভি প্রবব্রাজ। বিরোচনঃ অসুরাণাম্। তৌ হ অসংবিদানৌ এব সমিৎপানী প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ। দেব ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির উপদেশের কথা অবহিত হন। ফলে উভয়েই এসে বললেন, বেশ তো, আত্মাকে অনুসন্ধান করলে যদি সকল লোক ও সকল কাম্যবস্তু লাভ করা যায় তো আমরা সেই আত্মারই অনুসন্ধান করব। এইভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধি কল্পে দেবতাদের মধ্য থেকে ইন্দ্র এবং অসুরদের মধ্য থেকে বিরোচন প্রজাপতির কাছে উপস্থিত হলেন। যদিও একে অপরের অজ্ঞাতে উভয়েই সমিধ হাতে শিক্ষাপ্রার্থী হলেন।

এইভাবে দীর্ঘকাল উভয়েরই শিষ্য হিসেবে কাটে। প্রজাপতি এক সময় উভয়ের উপরই প্রীত হলেন। তারপর উপদেশ দিলেন—উদশরাবে আত্মানম্ অবেক্ষ্য। যৎ আত্মানঃ ন বিজানীথঃ তৎ মে প্রব্রূতম্ ইতি। তৌ হ উদশরাবে অবেক্ষাম চক্রাস্তে, তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ পশ্যথঃ? ইতি। তৌ হ উচতুঃ সর্বম্ এব ইদম্ আবাম্ ভগবঃ। আত্মানম্ পশ্যাবঃ আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ প্রতিরূপম্ ইতি। প্রজাপতি বললেন জলপূর্ণ পাত্রে নিজেকে দেখে আত্মার সম্পর্কে যা বুঝতে পারবে না তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। তাঁরা জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দেখলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলে? উত্তরে উভয়েই বললেন, আমরা সমগ্র আত্মাকেই দেখেছি প্রতিমূর্তিরূপে লোম-নখ সংযুক্ত সর্বশরীর।

তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—সাধু অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ ইতি। তৌ হ অবেক্ষাম্ চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ পশ্যথঃ ইতি। প্রজাপতি এবার বললেন, উত্তম অলংকারে ও সুন্দর বসনে সজ্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে জলপূর্ণ পাত্রে আবার দেখ। উভয়েই তাই করলেন। প্রজাপতি এবার বললেন কি দেখলে? তারা উত্তর করল—ভগবঃ, এবম্ এব ইমৌ সাধু অলঙ্কৃতৌ, সুবসনৌ, পরিষ্কৃতৌ ইতি। এষ আত্মা ইতি হ উবাচ—এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্; এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ। আমরা উভয়ে সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত শরীরের প্রতিকৃতিই দেখলাম। তখন প্রজাপতি বললেন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। তখন দুজনেই শান্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন।

উভয়ে এভাবে চলে গেলে প্রজাপতি মনে মনে বললেন এরা আত্মাকে উপলব্ধি না করেই চলে গেলো।—আত্মানম্ অনুপলভ্য অননুবিদ্য ব্রজতঃ। অনন্তর বিরোচন স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে আত্মীয়দের মধ্যে এই উপনিষদই শিক্ষা দিলেন।—সঃ হ শান্তহৃদয়ঃ এব বিরোচনঃ অসুরান্ জগাম। তেভ্যঃ হ এতাম্ উপনিষদম্ প্রোবাচ—আত্মা এব ইহ মহয্যঃ আত্মা পরিচর্যঃ। আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ আত্মানম্ পরিচরণ উভম্ চ অমুম চ উভৌ লোকৌ অবআপ্নোতি ইতি। অসুররাজ বিরোচন শান্ত হৃদয়ে এই উপনিষদ অসুরদের মধ্যে প্রচার করলেন। শরীরই আত্মা। শরীরকেই আত্মা রূপে মহনীয় কর, পরিচর্যা কর তাহলেই সর্বলোক প্রাপ্তি সম্ভব হবে।—তস্মাৎ অপি অদ্য ইহ অদদানম্, অশ্রদ্দধানম্, অযজমানম্ আহুঃ আসুরঃ বত ইতি। অসুরাণাম্ হি এষা উপনিষদ। আজও অবধি তাই দানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও যজ্ঞহীন সমাজকে অসুর সমাজরূপে আখ্যায়িত করা হয়। একেই বলে দেহাত্মবাদ, অসুরদের উপনিষদ।

দেহাত্মবাদের এমনিধারা ইঙ্গিত সমগ্র উপনিষদ জুড়েই ছড়ানো ছিটোনো রয়েছে। যেমনভাবে আত্মবাদ অনেকখানি সংগঠিত সংবদ্ধ প্রচার পেয়েছে ততখানি না পেলে ও দেহাত্মবাদের তত্ত্ব যে অন্তস্রোতের মত ঠাঁই করে নিয়েছে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে এটুকু স্পষ্টভাবে চিহ্নিত যে বৈদিকযুগের শেষ দিকে চিন্তাবিদগণ পরস্পর বিরোধী দুই বলয়ে বিরাজ করতেন। একদিকে দেহাত্মবাদ অপরদিকে আত্মবাদ। দুই শিক্ষাদর্শের প্রতিভূ। আত্মবাদ আলোচনা করার পূর্বে দেহাত্মবাদের মূল কথাগুলি এখানে তুলে ধরা দরকার। তাহলে দেহাত্মবাদের মূল সূত্র বা রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। এগুলিকে আমরা সংক্ষেপে যুক্তির আকারে তুলে ধরব। (১) ভূত পদার্থ বা বস্তুই আদি সত্তা। (২) পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ হল পঞ্চ মহাভূত। (৩) এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ই শরীর। (৪) চেতনা ও এই মহাভূত বা বস্তু উদ্ভূত উপবস্তু। (৫) এই চেতনা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ভৌত উপাদান সমূহ সমন্বিত থাকে। (৬) চেতনাযুক্ত শরীরই আত্মা (৭) মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ, অতএব মরণোত্তর মোক্ষ নেই (৮) মুক্তি বা মোক্ষ হল জীবনের স্বাধীনতা (৯) জগত ও জীবনের সম্যগ জ্ঞানই মানুষকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ এনে দেয় (১০) ইহলোকই একমাত্র লোক, পরলোক ভিত্তিহীন অলীক কল্পনা।

আত্মবাদ

ঋগ্বেদে আত্মা সম্পর্কিত দুটি বিশিষ্ট ব্যাখ্যা বর্তমান। আত্ম তে বাতঃ ও অজোভাগঃ।[১] দর্শনের ইতিহাসে এই দু প্রকার ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন দিককে সূচিত করছে। প্রথমটি আত্মা কোথা থেকে উৎপত্তি হল সেই বিষয়টিকে ইংগিত করছে। দ্বিতীয়টি ইংগিত করছে আত্মা অনদ্ভুত অনাদি। এই দুই প্রসঙ্গ দুই পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে—দেহাত্মবাদ ও আত্মবাদ।

এ যুগের প্রায় সকল চিন্তাবিদই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে আত্মজ্ঞান যুগোপযোগী পরিবর্তিত হয়েছে। আত্মা সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান হল যে তা শরীর কেন্দ্রিক। কিন্তু সেই শরীর কেন্দ্রিক আত্মার স্বাভাবিক বা বাস্তব ধারণা ক্রমে ক্রমে অবাস্তব সার্বিক তত্ত্ব হয়ে ওঠে। আর সকল কিছুতেই আত্মার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। আত্ম বিশ্লেষণই প্রমাণ করবে যে আত্মা হল ঐক্যানুভূতি। সকলকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এক ও অদ্বিতীয়। আত্মাই ছিল একমাত্র অস্তিত্ব। আদিতে আর কিছুই ছিল না। এক সময় আত্মা চিন্তা করল যে আমি বহু হব। এই ভাবে এক আত্মা থেকে বহুর সৃষ্টি। কিন্তু এই বহু কোনভাবে আত্মাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আত্মা অদ্বৈত, অতএব বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। যা কিছু দ্বৈত তাই বিভ্রান্তকারী। অদ্বৈতের ক্ষেত্রে তাই বিভ্রান্তির প্রশ্নই আসে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে[২]—যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। সেখানেই দ্বৈতভাব রয়েছে যেখানে একে অপরকে দেখে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কথপোকথন করে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, স্পর্শ করে এবং জানে। কিন্তু সবই যখন অদ্বৈত একাত্ম হয়ে যায় তখন কি দিয়ে কে কাকে দেখবে, আঘ্রাণ করবে, আস্বাদন করবে, কথপোকথন করবে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, স্পর্শ করে এবং জানে। যাঁর দ্বারা সকল কিছুই তাঁকে কি দিয়ে জানবে। এ কথার অর্থ আত্মাতেই যখন সকল কিছু লীন তখন পৃথক কোন সত্তার উপলব্ধি ঘটতে

পারে না। এই আত্মাই একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্য। আত্মার বাইরে যা কিছুই মিথ্যা। এখন প্রশ্ন আত্মার বাইরে বলার তবে তাৎপর্য কি? এর উত্তরে অদ্বৈতপন্থীদের বক্তব্য হল সাধারণের ধারণা হল অভিজ্ঞতায় যা কিছু ধরা পড়ে সকলই সত্য। এই সাধারণের মত গড়ে উঠেছে লোকায়ত তত্ত্ব অনুযায়ী। লোকায়ত মতে আত্মা সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির একটি অংশ। বিশ্ব বৈচিত্র্য যেমন সত্য, অস্তিত্বসর্বস্ব পদার্থ আত্মাও তেমনি। কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাক্ত। এই লোকায়ত মতের ঘোরতর বিরোধিতা ঘোষণা করে অদ্বৈত মত। ভিন্নতা-মাত্রই স্ববিরোধী। আর যা স্ববিরোধী তা কখনোই আদি তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। যা কিছুই রূপ সর্বস্ব তাই স্ববিরোধী। নাম-রূপের ধর্মই হল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত। আত্মা কখনো নামরূপের স্বরূপ হতে পারে না। কেননা আত্মা বিভিন্ন নয়। এখন প্রশ্ন তাহলে আত্মা কি? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মা কি এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় যে প্রক্রিয়া তুলে ধরেছেন তা হলো 'নেতি নেতি'র তত্ত্ব। 'নেতি নেতি' হল নঞর্থক প্রক্রিয়া। এটা নয়, ওটা নয় ইত্যাদি। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে আত্মা অনাদি, অনন্ত নিরাকার সত্তা। আরো স্পষ্ট করে তিনি বলেন আত্মা স্থূল নন, অনু নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, স্নেহবস্তু নন, ছায়া নন, তমঃ নন, বায়ু নন, আকাশ নন ইত্যাদি। তাহলে আত্মা কি?[১০] স এষ নেতি নেত্যাত্মাহ গৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেশীর্যো ন হি শীর্যতেহসঙ্গো ন হি সহ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। এই ভাবে যিনি 'নেতি নেতি' তিনিই সেই আত্মা। তিনি অগ্রহণীয়, কারণ তিনি গৃহীত হন না, তিনি অক্ষয় কারণ তাঁর ক্ষয় নেই। তিনি অসঙ্গ কারণ তাঁর আসক্তি নেই, তিনি বদ্ধ নন, অতএব তাঁর ব্যথা নাই ও বিনাশ নেই। ঠিক অনুরূপ নঞর্থক বর্ণনা সুন্দরভাবে কঠ উপনিষদে দেখা যায়।—অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যম্ গন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য। আত্মা হলেন তিনি যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য মহতত্ত্ব থেকেও শ্রেষ্ঠ। আত্মার এই নঞর্থক ব্যাখ্যায় এক জায়গায় এসে থামতে হয়। তা হলো এটা নয় ওটা নয় বলে সকল কিছুকেই অস্বীকার করা যায় কিন্তু এই যে আমি যে চিন্তা করছে একে কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না। এই চেতন সত্তাই আত্মা। অতএব আত্মা কি এর একটিই উত্তর—[১১] যোহয়ং বিজ্ঞানময়। আত্মা হলেন তিনি যিনি বিজ্ঞান ময়। এই আত্মা ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।[১২] আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই আত্মা এক ও

অদ্বিতীয়রূপে সর্বদা সর্বত্র বিচরণ করেন। সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে কেবলমাত্র আত্মাই ছিল।[১৩] আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ। আদিতে আত্মা ছাড়া কোন কিছুই ছিল না। কঠ উপনিষদে আরো বলা আছে—[১৪] নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এক ও অদ্বিতীয় আত্মা ছাড়া কোন নানা ছিল না। এই সংসার বলে কিছু ছিল না। মৃত্যু দ্বারা সকল কিছুই আবৃত ছিল। তখন আত্মা চিন্তা করল যে আমি এক আছি দ্বিতীয় হবো। এইভাবে বিচিত্র প্রকৃতির উদ্ভব হল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে[১৫] অস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ু বায়োরাগ্নিঃ। আগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। সেই আত্মা থেকেই আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী। এইভাবে এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলা হয়েছে—[১৬] আত্মৈবেদং সর্বমিতি। সকল কিছুই আত্মাময়।

এই যে আত্মাময় ব্রহ্মাণ্ড এই উপলব্ধি সকলের হয় না। কারণ লোকসাধারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানযুক্ত। বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের ধ্যান ধারণা পরিদৃশ্যমান জগতেই ব্যাপ্ত। এই জাগতিক বিষয়রাজির যে জ্ঞান তা নিকৃষ্ট জ্ঞান। এই জ্ঞান অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মজ্ঞান হল পরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে কেউই এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। কেবলমাত্র মুমুক্ষু ব্যক্তিই এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। আত্মজ্ঞানীর কাছে সকল কিছুই স্বচ্ছ পরিষ্কার। তিনিই আত্মজ্ঞানী যিনি সকল কিছুতেই আত্মভাব দর্শন করেন। ঈশ উপনিষদে বলা আছে—যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি। যে বা যিনি সর্বভূতে নির্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন তাঁর কাছেই কেবল আত্মতত্ত্ব স্বরূপত উন্মোচিত হয়। তিনি নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মরূপে উপলব্ধি করেন। তখন তাঁর কাছে আত্ম-পর ভেদ থাকে না। এই আত্ম উপলব্ধি জগতের সত্যতারূপে ভ্রম দূর করে। আত্মা বর্তমান থাকা সত্বেও লোক সাধারণের অবিদ্যা দোষে আত্মার জ্ঞান হয় না। তাদের কাছে অজর অমর আত্মা আবৃত থাকে। এইভাবে যিনি সমুদয় বস্তুকে আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দর্শন করেন তিনিই আত্মদর্শী। তিনি জানেন এই আত্মা জন্মেও না, বিনাশও নেই। এই আত্মা কোন কারণ থেকেও উৎপন্ন হয়। আত্মা থেকেও কিছুই জন্মায় না। এই আত্মা নিত্য সর্বদাই এক রূপ। হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই—অপরিবর্তনীয় শাশ্বত পুরাতন অথচ চির নবীন। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না। উপনিষদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী—[১৭] ন

জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নং বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ ন হন্যতে, হন্যমানে শরীরে। এই আত্মাই অন্তর্যামী, এই আত্মাই অমৃত। আত্মান্তর্যামী অমৃতঃ। সেই আত্মাকে আমরা দেখি না কিন্তু তিনি আমাদের দ্রষ্টা। তিনি অশ্রুত, কিন্তু শ্রোতা। তাঁকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি সকলের মননকর্তা, তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা।

এই আত্মবাদের যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করা গেল তা থেকে এটুকু স্পষ্ট আত্মাই সকল কিছুর মূল উৎস। কিন্তু আত্মা অমূল মূল। অজোভাগ। অশরীর এই আত্মাই অমৃত। সশরীর আত্মা সীমিত মরণশীল, মৃত্যুগ্রস্ত। কিন্তু অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। দেব প্রতিনিধি ইন্দ্র এই স্বর উপনিষদই[১৮] প্রজাপতির কাছ থেকে রপ্ত করে দেবলোকে প্রচার করেন। স্বর উপনিষদ অনুযায়ী অশরীর আত্মায় সম্যক উপলব্ধিই অমৃত, মুক্তি, মোক্ষ।

ব্রহ্মন্

উপনিষদের মূল্য সমস্যা হল চরম সত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা। প্রায় সব কটি উপনিষদই কোন না কোনভাবে এই চরম সত্যের প্রসঙ্গটি তুলে ধরে আলোচনায় রত হয়েছে। এর থেকে মনে হতে পারে বুঝি চরম সত্যের প্রকৃতি স্থিরিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদ সাহিত্য সম্পর্কে যাঁর সামান্যতম ধারণা আছে তিনি স্বীকার করবেন এই ধারণা কতখানি সঠিক! কোন আলোচনাই শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তা হলো বাস্তব থেকে দূরে সরে গিয়ে ক্রমশই একটা অধিবাস্তব পরিমণ্ডলে হাতড়ে বেড়ানোই সার। এক কথায় বস্তুকেন্দ্রিক আলোচনা কর্তৃকেন্দ্রিক আলোচনায় ইতি টেনেছে। ব্যাপারটা একটু ধাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ব্রহ্মন্ প্রসঙ্গটি তুলে ধরছি। বেদের আদি পর্বে বিশেষ করে ঋকবেদে ব্রহ্মন্ ছিল বাস্তব বা বস্তুকেন্দ্রিক। কিন্তু কালে কালে লক্ষ্যণীয় রূপান্তর ঘটে যায়। বস্তুকেন্দ্রিক ব্রহ্মনের ধারণা অবাস্তব অকল্পনীয় এক মার্গে এসে থামে। আমরা সেই প্রসঙ্গই বিস্তৃত আকারে তুলে ধরব।

ব্রহ্মন্ শব্দটির ব্যুৎপত্তি থেকেই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও বিতর্ক বর্তমান। বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করেছেন। ব্রহ্মন্ শব্দটি বৃহ্ ধাতু থেকে এসেছে। বৃহ্ ধাতুর মনিন প্রত্যয় করে ব্রহ্মন্ হয়েছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি বা প্রকাশ। বৃহ্—বৃহী অর্থ আবার অন্ন বা ধন অর্থেও ব্যবহৃত। নিঘণ্টু এই অর্থেই প্রকাশ করেছেন। আদিতে, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য বিশেষ করে ঋগ্ বেদে ব্রহ্মন্ শব্দটি অন্ন বা সম্পদ অর্থেই প্রচলিত ছিল। তেমন নিদর্শন ঋগ্ বেদই রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে পারি ঋগ্‌বেদেই বর্তমান, জগতের প্রাণীসকল যার দ্বারা বৃদ্ধি পায়, যা সমগ্র জগতকে ভরণ করে, যার সাহায্যে সর্বভূতের বৃদ্ধি হয়। মানব জগতের ইতিহাসে অন্ন বা খাদ্যদ্রব্যই আদিমতম সম্পদ। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্রহ্মন্ শব্দের অন্নবাচকত্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ব্রহ্মন্ শব্দের আদি অর্থ তাই পার্থিব সম্পদ, যা একান্তই বস্তুগত। আদিতে ব্রহ্মন্ বন্দনা আসলে পার্থিব সম্পদ কামনা।

কিন্তু কালের বিবর্তনে ব্রহ্মন্ শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকেই বদলে যেতে থাকে। সেই পরিবর্তনের ধারা বেশ লক্ষ্য করবার মত। এখানে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ কোন পার্থিব সম্পদ নয়, অপার্থিব অধিবাস্তব কোন সত্তা হিসেবে চিন্তিত। আর কালে কালে দেখা যায় ব্রহ্মন্ শব্দটির সঙ্গে স্তোত্র, প্রার্থনা ও উৎসর্গ ইত্যাদি শব্দ যুক্ত হয়ে গেছে। ব্রহ্মন্ হল এমন কোন অধিবাস্তব সত্তা যাকে উপাসনা ও মননের মাধ্যমে লাভ করার প্রয়াস করতে হয়। এই ভাবে ব্রহ্মন্ যা ছিল বস্তুকেন্দ্রিক যাকে মেহনত ও অক্লান্ত কর্ত্তব্য কর্ম দিয়ে লাভ করতে হত তা হয়ে উঠল মনন কেন্দ্রিক বা কর্তৃকেন্দ্রিক যাকে লাভ করার জন্য কোন মেহনত নয় সকল প্রকার মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে মননের মাধ্যমে ঐকান্তিক সাধনা প্রয়োজন। এই সাধনার প্রকার হল স্তোত্র প্রার্থনা ও উৎসর্গ। এ সবই মনন সর্বস্ব। তাই দ্বিতীয় অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দটি স্পষ্টতই মননকেন্দ্রিক। মনন একান্তই কর্ত্তৃনির্ভর। অতএব ব্রহ্মন্ এই অর্থে কর্ত্তৃকেন্দ্রিকও বটে।

এখন প্রশ্ন কেন এই অর্থের রূপান্তর। এই রূপান্তর আসলে কালের দাবী অনুযায়ী। প্রাচীন বৈদিক যুগে যা ছিল পার্থিব পরবর্তী উপনিষদ যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে তা হয়ে উঠল অপার্থিব। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া কেন কিভাবে হয়েছে বুঝতে গেলে আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে। প্রাচীন বৈদিক যুগের সূচনায় যে সমাজ ছিল তা আদিম সাম্যবাদ কেন্দ্রিক। শেষ ভাগে সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে রাজন্য কেন্দ্রিক হিসেবে। সেই আদি বৈদিক যুগে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন ছিল তা স্বতঃউৎসারিত ও স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তীকালে তা রাজন্য প্রভাবিত হয়ে গড়ে উঠল কর্ত্তৃ কেন্দ্রিক হিসেবে। অর্থাৎ সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন তার স্বতঃ উৎসারিতভাব হারিয়ে গড়ে উঠল আরোপিত অর্থে পুষ্ট হয়ে। আর এই আরোপিত সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন চর্চার ক্ষেত্র হয়ে উঠল রাজসভা।

আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বসূরী কে কি বলেছেন তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও হিরিয়ানা অনেকেরই বক্তব্য এখানে তুলে ধরতে পারি। কিন্তু তা দীর্ঘায়ত হবে। আমরা এখানে বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণণের প্রসঙ্গই উল্লেখ করব। তিনি উপনিষদের উপর বিশেষ আলোচনা করেছেন। অবশ্য অনুবাদের প্রয়োজনে তিনি যে ভূমিকা লিখেছেন তা মহা মূল্যবান। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই অর্থের রূপান্তরকে প্রকটিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণণের মতে উপনিষদ যুগেই সেই রূপান্তর প্রকট আকার

ধারণ করে। উপনিষদে আমরা দেখতে পাই স্বতঃউৎসারিত প্রকৃতি দর্শন হিসেবে কর্তৃকেন্দ্রিক রূপ পরিগ্রহণ করল। প্রত্যক্ষ রাজন্যপুষ্ট হয়ে গড়ে উঠল এই দর্শন। তাই উপনিষদ যুগে দেখা যায় রাজা বড় বড় বিতর্ক সভার আয়োজন করছেন। ঋষিদের ভরণ পোষণের সব দায় দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। পারিতোষিক দিয়ে প্রভাবিত করছেন। এমন কি বিতর্ক সভায় বিতর্কের বিষয় পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। এখানেই ক্ষান্তি নেই উপনিষদে দেখা যাচ্ছে রাজা পণ্ডিতদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনের ব্যাখ্যায় পর্যন্ত উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করছেন। স্বাভাবিক ভাবেই স্বার্থের স্থানান্তর করণের মধ্য দিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। এইভাবে আদিতে যে দর্শন ছিল প্রকৃতি দর্শন তাই হয়ে উঠল রাজন্যপুষ্ট দর্শন হিসেবে। এই দর্শনের নামকরণ করা হলো বিশুদ্ধ দর্শন।

উপনিষদে এই বিশুদ্ধ দর্শনের জয়গান সর্বাংশে ছড়ানো থাকলেও ব্রহ্মনের আদি অর্থকে কোনভাবে মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মনের আদি অর্থ স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। ব্রহ্মন্ শব্দের পার্থিব অর্থ[১] যেমন অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যাজনাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসং বিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই এই ভূতসমূহ জন্মায়। জন্মের পর ভূতসমূহ অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে। শেষে অর্থাৎ অন্তিমকালে অন্নেই প্রতিগমন করে। অন্নেই বিলীন হয়। এখানে অন্ন বলতে পার্থিব বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুই ব্রহ্ম। বস্তুই সকল কিছুর উৎস। জাগতিক সকল কিছুই বস্তু থেকে জাত হয়, আর বস্তুগ্রহণ করেই জীবন ধারণ করে এবং জীবনের শেষে বস্তুতেই বিলীন হয়।

এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করছে যে সেই সময় সমাজে ব্রহ্ম শব্দটি পার্থিব অর্থেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাই উপনিষদ কর্তাগণ সেই পার্থিব অর্থকে কোনভাবে অবজ্ঞা করতে পারেন নি। এমন কি বিশুদ্ধ চিন্তার দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্রহ্ম শব্দের প্রচলিত পার্থিব অর্থ থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে। তাই দেখা যায় বরুণপুত্র ভৃগুকে ব্রহ্মের প্রচলিত অর্থ থেকেই আলোচনা শুরু করতে। কিন্তু ব্রহ্মের অন্ন অর্থ দিয়ে শুরু করলেও ক্রমশই ব্রহ্মের আরোপিত অর্থের দিকে সূচীমুখ করানো হতে লক্ষ্য করা যায়। বরুণপুত্র ভৃগুকে পরবর্তী পঙক্তিতেই বলতে শোনা যাচ্ছে—প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যাজনাৎ। প্রাণই ব্রহ্ম তা জানো। তারপর ভৃগু বললেন মনই ব্রহ্ম। মনো ব্রহ্মেতি ব্যাজনাৎ। এতেও

অতৃপ্তি দেখা দিল। পরবর্তী তপস্যায় জানলেন—বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। তবুও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পুনরায় তপস্যায় রত হয়ে জানলেন, আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দই ব্রহ্ম। এইভাবে সংশয়ের পর সংশয় ভৃগুকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করল। তিনি চরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন।

যেভাবেই হোক না কেন ভৃগুকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে সাধারণের ব্যবহৃত লোকায়ত জগত থেকে। এবং ধাপে ধাপে যুক্তিগ্রাহ্য করে বিশুদ্ধ চিন্তার দর্শনে আনার চেষ্টা হয়েছে। আর সেই মত বোধগম্য করে তোলার জন্য বলা হয়েছে, অন্ন একান্তই পার্থিব তা কি করে চরম সত্তা হতে পারে? এই সংশয়ই তাঁকে পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছে দিল তিনি জানলেন প্রাণই ব্রহ্ম। কিন্তু তাঁর প্রাণ নিয়েই পুনরায় সংশয় উৎপন্ন হল। প্রাণ অনঙ্গ, অথচ অঙ্গ বা শরীর কি করে তাঁকে বাঁধতে পারে। তাছাড়া প্রাণ জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেহাশ্রয়ী। অতএব প্রাণের ক্রিয়া মুক্ত স্বাধীন ও অব্যাহত নয়। এমনকি প্রাণ উৎপত্তিশীল। এখান থেকে এটুকু স্পষ্ট প্রাণ নয় নিশ্চয়ই অন্য কোন উচ্চতম সত্তা বর্তমান। এরপর তপস্যায় রত হয়ে জানলেন মনই ব্রহ্ম। কারণ মনের অবাধ গতি। মনই প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন প্রাণ থেকে ভিন্নও। অন্ন এবং প্রাণের চেয়ে মনই উচ্চতম সত্তা। কিন্তু মনও আবার সীমিত। মনের জন্ম আছে। তার ক্রিয়ার ছেদ আছে। পরিপূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন তো নয়ই। কেননা মন বিবেক, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত। তাহলে কি বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কারণ বিবেক বা বিজ্ঞানই শরীর ও মনকে চালনা করে। না, এই বিজ্ঞানও সীমিত। তার উৎপত্তি ও ক্ষয় বর্তমান। পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে তার গতি নেই। শেষ পর্যন্ত ভৃগু তপস্যায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেন। আর সিদ্ধান্তে এলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দই কেবল অসীম, অনাদি ও অনন্ত। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যিনি নিহিত আবার যিনি মহাকাশে পরিব্যপ্ত তিনিই আনন্দ। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আনন্দেই নিহিত। আনন্দে জ্ঞান-জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা একাকারে বর্তমান। সকল অনুসন্ধিৎসা আনন্দেই পরিসমাপ্তি পায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দ ও ব্রহ্মনকে একীভূত করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলেও এ নিয়ে উপনিষদ চিন্তানায়কদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান। মূল প্রশ্ন হল আনন্দই যদি ব্রহ্মন্ হয় আর ব্রহ্মন্ যদি আনন্দ হয় তবে তার স্বরূপ কি? কার্যত এই প্রশ্নের উত্তরে কেউই একমত হতে পারেন নি। কেননা আনন্দের স্বরূপ

কি তা উপনিষদ চিন্তাবিদগণ এককথায় বলতে পারেন নি। আনন্দ মূর্ত কি অমূর্ত, শূন্য কি বিষয়ী এসব তর্কে না গিয়ে উপনিষদ চিন্তাবিদগণ যে কথা বলেছেন তা হলো এক কথায় পুরুষের পূর্ণতা। মানুষের মধ্যেকার অধ্যাত্মিক অতৃপ্তিই তাদের প্রবৃত্ত করায় ব্রহ্মন্ বা আনন্দ সম্পর্কে অবহিত হতে বা কোনভাবে ব্যাখ্যা করতে। মুণ্ডক উপনিষদে তাই বলা হয়েছে[২]—তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপম মৃতং যদ্বিভাতি। যিনি আনন্দরূপ অমৃতরূপে আত্মাতেই প্রকাশিত তাঁকেই জ্ঞানী বিজ্ঞানপ্রভাবে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করেন। তাহলে ব্রহ্মন্ বা আনন্দ কি? এর উত্তর যেটুকু মেলে তা হলো ব্রহ্মন্ বা আনন্দ রহস্য আবৃত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা পরাবিদ্যার অধিকারী বিবেকিগণই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন।

ওপরের কথা থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধে নেই যে 'কভাবে ব্রহ্মের বস্তুগত রূপ ক্রমশই অবস্তুগত রহস্যানুভূতিতে রূপান্তরিত হল। এ বিষয়ে উপনিষদ চিন্তানায়কদের কৃৎকৌশল বিশেষভাবে অনুধাবন করার মতো। এখানে[৩] আধুনিক চিন্তাবিদ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর সুস্পষ্ট অভিমত তুলে ধরতে পারি। তাঁর মতে উপনিষদ চিন্তানায়কগণ যখন কোন মতেই ব্রহ্মকে প্রকৃতি দেবতা যেমন সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ইত্যাদির সঙ্গে মেলাতে অসমর্থ হলেন ততই ব্রহ্মকে রহস্যাবৃত অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে কি করে পরিগণিত করানো যায় তার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। কারণ তাঁরা এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে সূর্য, চন্দ্র, আকাশ বায়ু, অগ্নিকে দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। অন্তত যে দর্শনের পরিকাঠামো তাঁরা গড়ে তুলতে চান। তাই এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেবতাদের অতিক্রম করে ব্রহ্মকে রহস্যলোকে নিয়ে যান। অবশ্য তা করতে গিয়ে পারম্পর্য রহিত কোন অবিশ্বাস্য ব্যাপার উপস্থিত করেন নি। কারণ তা উল্টো ফলদায়ী হবে তা তাঁরা জানতেন। ব্রহ্মের প্রচলিত অর্থকে আপাতত বজায় রেখে তাঁরা ত্রিলোক তত্ত্ব উপস্থিত করলেন। এই ত্রিলোক যথাক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক। এইভাবে ইন্দ্রিয়ভিত্তি থেকে অতীন্দ্রিয় ভিত্তিতে অগ্রসর হন। তার প্রমাণ সব কটি উপনিষদেই পাই। আমরা এখানে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরব উপলব্ধির সুবিধার্থে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে নিরিখ উপস্থিত তা সকল দর্শন সম্প্রদায়ই গ্রহণ করেছেন।[৪] অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। জীব সমূহ অন্ন থেকে জাত এবং অন্ন দ্বারাই বর্ধিত হয়। পরিশেষে অন্নতেই প্রতিগমন করে। এবম্বিধ উদ্ধৃতি দেখে সহজেই অনুমেয় হতে পারে যে এ তো লোকায়ত মতকে

উপেক্ষা না করে তাঁরা তাকে ভিত্তি করেই অগ্রসর হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এখানে তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকেই একটি উপাখ্যান তুলে ধরব। বরুণ পুত্র ভৃগু পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে সকল সৃষ্টির সার যে ব্রহ্ম তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন পিতা তাঁকে বললেন[৫] অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য ইত্যাদিই ব্রহ্ম উপলব্ধির দ্বার। এদের অনুসন্ধিৎসা থেকেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা শুরু হয়। তারপর সদগুরুর উপদেশবশত আত্মবিচার ও মননের মাধ্যমে ব্রহ্ম উপলব্ধি ঘটে। তোমার সেইরূপ অনুসন্ধিৎসা জন্মেছে অতএব তুমি ব্রতী হও। এরপর বরুণ বললেন—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্নেই জন্ম, অন্নেই বৃদ্ধি এবং অন্নেই প্রতিলীন হয় সকল কিছু। তপস্যা করলেন। বস্তুই জগতের আদি সত্তা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই পুনরায় কাতর হলেন। বাহ্জগতের সত্তা না হয় বস্তুই কিন্তু অন্তর্জগৎ তার কারণ বস্তু হয় কি করে ? তাছাড়া অন্ন নিজেই উৎপন্ন পদার্থ। তা কি করে সর্বকারণ ব্রহ্ম হতে পারে ? সংশয় আকুল হয়ে তপস্যায় জানালেন—প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। প্রাণই ব্রহ্ম। কারণ প্রাণশক্তি বিশ্ব সৃষ্টির উৎস, প্রাণেই জগৎ বিধৃত, আর প্রাণেই বিলয় হয়। তবুও সংশয়মুক্ত হতে পারলেন না, কারণ প্রাণের ক্রিয়াও মুক্ত, স্বাধীন ও অব্যাহত নয়। তপস্যায় জানলেন—মনো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। মনই ব্রহ্ম। প্রাণের উর্দ্ধে মন। সংকল্প থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি, সংকল্পেই স্থিতি আর সংকল্পেই লয়। কিন্তু তবু যেন কোথায় খট্‌কা ! মন তো সীমিত। মুক্ত, স্বাধীন ও অবাধ নয়। পুনরায় তপস্যায় রত হয়ে জানলেন—বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। বুদ্ধিই উৎপত্তির হেতু, জগতের স্থিতি ও প্রলয়। তবুও বিচার ও মনন যেন সায় দেয় না। সংশয় আকুল হয়ে তপস্যায় জানলেন—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দই সৃষ্টির উৎস, আনন্দেই বৃদ্ধি, আনন্দেই পরিসমাপ্তি। এখানেই এসে ভৃগু অন্তরের তৃপ্তি খুঁজে পান। বিচার ও মন দিয়ে উপলব্ধি করলেন হৃদয়ের অন্তরতম কক্ষে যিনি আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত তিনিই ব্রহ্ম। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম থেকেই ভূত সকলের উৎপত্তি, আনন্দময় সত্তাই স্থিতিস্থাপক এবং আনন্দময় সত্তাই লীলা অবসানের ক্ষেত্র। এইভাবে তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম সান্নিধান এর সার কথা হল অন্নময় থেকে আনন্দময় পর্যন্ত অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী। তাহলে ব্রহ্ম কি ? হৃদয় মধ্যাকাশে আনন্দঘন সত্তাই ব্রহ্ম। এক কথায় আনন্দঘন সত্তা হল আত্মার তুরীয় অবস্থা। অতএব আত্মাই ব্রহ্ম।[৬] আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই অমূল মূল।

এইভাবে কেবল তৈত্তিরীয় উপনিষদে নয় অন্যান্য উপনিষদে রকম ফের সত্ত্বেও জীবন জগৎ প্রবাহকে আত্ম বিবর্ত প্রবাহরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ভিন্ন মাত্রায় হলেও একই চিত্র সংযোজিত হতে দেখি। ব্রহ্ম ইতি একে আহুঃ। তৎ ন তথা, পূয়তি বৈ অন্নম ঋতে প্রাণাৎ। প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি একে আহুঃ। তৎ ন তথা। শুষ্যতি বৈ প্রাণঃ ঋতে অন্নাৎ। এতে হ তু এব দেবতে একধাভূয়ম্ ভূত্বা পরমতাম্ গচ্ছতঃ। কারো কারো মতে অন্নই ব্রহ্ম। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ প্রাণ না থাকলে অন্ন পচে যায়। আবার কারো কারো মতে প্রাণই ব্রহ্ম। তাও সত্য নয়। কারণ অন্নের অভাবে প্রাণ শুকিয়ে যায়। বরং সত্য যা তা হলো উভয়ের একত্বই হলো পরম তত্ত্ব। অতএব অন্নও ব্রহ্ম নয়, প্রাণও ব্রহ্ম নয়। এই দুইয়ের অদ্বয়ই ব্রহ্ম। যিনি এই অদ্বয় বা একত্বকে জানেন তিনিই ব্রহ্মবিদ। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে কেবল এই টুকুই যথেষ্ট নয়। কেবলমাত্র অন্ন ও প্রাণের একত্ব জ্ঞানই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ঘটায় না তবে অন্ন ও প্রাণের একত্ব উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক।—বীত্যন্নং বৈ বি অন্নে হীমানি সর্বানি ভূতানি বিষ্টানি রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি সর্বানি ভূতানি রমন্তে। অন্নই বি অর্থাৎ অন্নেই সর্বভূত বিষ্টিত বা আশ্রিত। প্রাণই রম অর্থাৎ প্রাণেই সর্বভূত আনন্দ উপভোগ করে। অতএব কেবল অন্ন ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্রহ্ম নয়। এদের অদ্বয় আনন্দ উপলব্ধিই ব্রহ্ম। এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আনন্দই যে ব্রহ্ম তাহ প্রতিপাদিত করা হয়েছে। আনন্দ হল আত্মার তুরীয় মার্গ। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতই বলা হয়েছে[৭]—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এইভাবে বিশ্ব হল সৃষ্টি আত্মা বা ব্রহ্ম হল স্রষ্টা। এক আত্মা বা ব্রহ্মই ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে[৮]—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জালানিতি। এই বিশ্ব ব্রহ্মময়। ব্রহ্মকে এখানে 'তজ্জলান' বলা হয়েছে। 'তৎ' অর্থে তিনি, 'জ' অর্থে জগতের জন্ম দেন, 'লি' অর্থে তাঁর মধ্যেই জগত লয় পায়। আর 'অন' অর্থে তিনিই জগৎ ধারণ করেন। সমগ্র জগৎই স্বরূপত ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে এই ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য। একমাত্র অস্তিত্বশীল সত্তা। সকল কিছুর উৎস—[৯] সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বম্ ইদম্ অভ্যাত্তঃ, অবাকী, অনাদরঃ এস ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্ম। যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, যিনি সকল কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন যিনি সকল প্রকার ইন্দ্রিয় রহিত ও উদাসীন তিনিই আমার হৃদপদ্মে অবস্থিত আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ। দ্যুলোক, ভূলোক, সমুদয় প্রাণীজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হৃদয় মধ্যাকাশে, অনন্ত চৈতন্য বা পরমাত্মাই ব্রহ্ম।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ম

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে কর্ম কথাটির তাৎপর্য অপরিসীম। অবশ্য অধুনা যে অর্থে কর্ম কথাটি প্রচলিত, আদিতে কর্ম কথাটি সেই অর্থে প্রচলিত ছিল না। কর্ম কথাটি আদিতে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হত। তাই প্রাচীন বৈদিক যুগে 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন কর্মকে ক্রিয়া অর্থে মানুষের কর্মপদ্ধতিকেই সূচিত করত। সৎ ও সুন্দর কর্মপদ্ধতিই মানুষের সুফল লাভকে তরান্বিত করে। অসৎ ও অসুন্দর ক্রিয়া কলাপ মানুষের কুফল লাভে বাধ্য করে। অতএব সুকাজ অবশ্য করণীয়। ফলে বৈদিক যুগে কর্মের স্বাভাবিক ধারণাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে কর্মকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কর্ম কথার সঙ্গে জড়িয়ে যায় জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের ফোলানো ফাঁপানো তত্ত্ব! কর্মই শরীর। শরীরই কর্মের উৎস। শরীর নিন্দনীয়। কেননা ক্রিয়াশীল। অতএব ক্রিয়া নিন্দনীয়। কর্ম হল একটি অমোঘ নিয়ম। অতএব কর্ম ক্রিয়া নয়। কর্ম কথার অর্থ অক্রিয়া। ক্রিয়া মাত্রেই জন্ম-মৃত্যু কবলিত, পাপ পুণ্য বিজড়িত। কর্ম এসবের উর্দ্ধে। একটা সার্বিক নিয়ম, নিয়তি অদৃষ্ট।

বৈদিকযুগে, বিশেষ করে ঋগ্বেদে কর্ম কথাটি ক্রিয়া অর্থেই প্রচলিত। আদিতে জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের প্রশ্নই ছিল না। কর্মকেন্দ্রিক এই শরীর প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতিতে টানাপোড়েন ঘটলে শরীরে তার বিক্রিয়া হয়। প্রকৃতির বিক্রিয়াই এই শরীর। জীবন মাত্রেই প্রকৃতি উদ্ভূত। তেমনি মৃত্যুতে শরীরের বিভিন্ন অংশ প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে লীন হয়ে যায়। যেমন চক্ষু লীন হয় সূর্যে, শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুতে, বাক্য লীন হয় অগ্নিতে ইত্যাদি। আবার প্রকৃতির নিয়মেই জীবন পুনরাগমন করে। এই ভাবে জীবন-মৃত্যুর খেলা চলেছে প্রকৃতির বুকে। এই প্রাচীন ধারণায় ধর্মের ক্রিয়া অর্থই প্রতিপাদিত।

কিন্তু বৈদিকযুগের শেষভাগে, উপনিষদে কর্ম কথাটির ধারণায় পরিবর্তন ঘটে যায়। উপনিষদ যুগে কর্ম কথাটি ভিন্ন অর্থ এক কথায় সম্পূর্ণ নতুন অর্থ গ্রহণ করে। এখানে কর্ম মানে ক্রিয়া নয় অক্রিয়া। ফলে কর্ম কথাটির পূর্বের প্রচলিত অর্থ

ও নতুন এই অর্থ দুই ভাবেই চলতে থাকে। কর্ম কথাটি এই ভাবে দ্বৈত অর্থে প্রকাশিত হয়—ক্রিয়া ও অক্রিয়া। ক্রিয়া কথাটি চলতে থাকল পার্থিব জগতের কার্য-কারণ তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে। আর অক্রিয়া কথাটি প্রচলিত হল অপার্থিব পরলোকের ভিত্তি হিসেবে। ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত অর্থই ছাপিয়ে গিয়ে নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। আর দ্বৈরথ যুদ্ধে ক্রমশই কোণঠাসা হতে হতে কর্মের ক্রিয়া অর্থ সঙ্কুচিত হতে হতে শৈশবেই আটকে থাকে। অপর পক্ষে কর্মের নতুন অক্রিয়া অর্থ নিত্য নতুন ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ হতে হতে যুগোপযোগী যৌক্তিক বিকাশ লাভ করতে থাকে। উপনিষদ চিন্তানায়কগণ ক্রমশই এই কর্ম কথাটির সঙ্গে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদের নতুন ধারণা সংযোজিত করেন। তৎকালীন সমাজ মানুষের চিন্তা-চেতনার কথা উপনিষদ চিন্তানায়কদের অবশ্যই ছিল। তাই প্রচলিত ধারণার সঙ্গে থাপ খাইয়ে এই জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের তত্ত্ব প্রচার করতে থাকলেন। সমাজ মানুষের সামনে মানুষের গতির প্রক্রিয়াকে দ্বিস্তরে কখনো কখনো ত্রিস্তরে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। সেই বিভাগ যথাক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক। একে যান বা পথ হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। শেষোক্ত চূড়ান্ত লোকে যেতে এই দ্বিস্তর যান অবশ্যই জরুরী। এই যান যথাক্রমে পিতৃযান ও দেবযান। পিতৃযান পিতৃলোকে সীমাবদ্ধ রাখে। দেবযান দেবলোকের পথে চূড়ান্ত স্তরে ব্রহ্মলোকে যেতে সাহায্য করে। ফলে পিতৃযান ইহলোকের অবস্থানকে সূচিত করছে আর দেবযান হল ব্রহ্মলোকের বৈতরণী।

এখন প্রশ্ন এই স্তর বিভাগের প্রয়োজন কেন হল? এই প্রশ্নের উত্তর বৃহদারণ্যক উপনিষদে আর্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে রয়েছে। আর্তভাগ যখন যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন যে মৃত্যুর পর মানুষের গতি কি? তখন যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে প্রচলিত কর্মতত্ত্ব আর্তভাগের কাছে ব্যাক্ত করেন।[২]—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ, যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন কেশা অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন প্রচলিত কর্মতত্ত্ব অনুযায়ী মৃত্যুতে পুরুষের বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণ দিকসমূহে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, রক্ত ও শুক্র জলে বিলীন হয়। এ কথার দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য যে প্রচলিত কর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন তা ঋগ্‌বেদোক্ত তত্ত্বই। সেই তত্ত্বের মূল কথা হল মানুষ প্রকৃতির অংশ। মৃত্যুতে শরীরের বিভিন্ন অংশ প্রকৃতির বিভিন্ন অংশেই বিলীন হয়। এই জগতে মানুষ যেমন কর্ম করে বা ক্রিয়া

করে সেইরূপই ফলভোগ করে থাকে। পুণ্য কর্ম দ্বারা মানুষ মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলে স্মৃতি হয়ে মানসলোকে দীর্ঘকাল অমর থাকে। আর পাপকর্মে কুৎসিৎ আচরণে শীঘ্রই পাপাচারী আখ্যাত হয়ে মানসলোক থেকে অর্থাৎ মানুষের স্মৃতি থেকে অবলুপ্ত হয়। মানুষের শরীরী মৃত্যু তো হয়েই ছিল এবার তার কীর্তিরও মৃত্যু ঘটে। এ কথার অর্থ মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর কর্মই টিকে থাকে। সুকর্ম অভিনন্দিত হয় যুগ থেকে যুগান্তরে আর কুকর্ম নিন্দিত হয়ে কালের গ্রাসে বিলীন হয়ে যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রচলিত কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় আর্তভাগ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন। তখন পুরুষ কোথায় থাকে? এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য যারপরনাই খুশী হন। তিনি আনন্দের আতিশয্যে আর্তভাগের হাত টেনে নিয়ে বললেন, এসো এ নিয়ে নির্জনে আলোচনা করে সেই রহস্য উপলব্ধি করা যাক। কেননা, জনবহুল স্থানে এই রহস্য আলোচনা করা ঠিক নয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন[৩]—সোম্য! হস্তম্, আর্তভাগ! আবাম্ এব এতস্য বেদিষ্যাবো ন নৌ এতৎ সজন ইতি। তৌ হ উৎক্রম্য মন্ত্রয়াং চক্রাতে। সোম্য আর্তভাগ হাতে হাত মেলাও। চল আমরা দুজনেই এই রহস্য জানব। কিন্তু এই রহস্য জনবহুল স্থানে বিচার যোগ্য নয়। এরপর অন্যত্র গিয়ে আলোচনা করলেন।

এখন প্রশ্ন জনতার মাঝখানে আলোচনা করার উপযুক্ত নয়। জনগণের থেকে এইভাবে আড়াল করার প্রয়োজন যাজ্ঞবল্ক্য অনুভব করলেন কেন? তা কি প্রচলিত জনমত বিরোধী বলে? অবশ্য ব্রহ্মবিদদের সবেতেই রাখ-ঢাক-গুজ-গুজ ব্যাপার। আসল রহস্য হল জনগণে ব্যাপ্ত কোনকিছুকে ব্রহ্মবিদেরা কখনো গ্রহণ করতে না পারায় জনগণ থেকে কল্পিত ভয়ে নিজেদের সরিয়ে রাখার চেষ্টা সর্বদাই করেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই তাই গুহ্যবিদ্যা বা রহস্য বিদ্যা বলেই পরিচিত করানোর চেষ্টা হয়েছে।

এই ব্রহ্মবিদ্যার সহযোগী করেই প্রচলিত কর্মতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে কর্মের নতুন ব্যাখ্যা সংযোজিত করা হয়। কর্মতত্ত্বও অনুরূপভাবে কালে কালে রহস্যাবৃত হয়ে যায়। তবে এই রহস্যাবৃত করতে উপনিষদ চিন্তানায়কগণ তাঁদের ব্যাখ্যায় শুরুতে জনগণের মধ্যে প্রচলিত তত্ত্বকে সরাসরি নস্যাৎ না করে তাকেই ভূমি হিসেবে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করে ধাপে ধাপে যুক্তির সাহায্যে রহস্যজালে আবৃত

করে স্বমত প্রতিপাদন করেছেন। আর তা কিভাবে সম্ভব করে তোলা হয়েছে উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে[৪]: পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং পরলোকস্থানং চ। পুরুষের দুই স্থান ইহলোক ও পরলোক। ইহলোক হল পাপসর্বস্ব নরকভূমি। পরলোক হল পুণ্য সর্বস্ব স্বর্গভূমি। ইহলোকে শরীর গ্রহণই নিন্দনীয়, মহাপাতকের প্রতিফল। এককথায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করা মানেই পাপের আবর্তে নিমজ্জিত হওয়া। ইহলোক মানেই কর্মময় লোক। কর্ম দু প্রকার—সু ও কু। সুকর্ম ও কুকর্ম। ফলে ইহলোকে আসা মানেই হয় সুকর্ম না হয় কুকর্ম যে কোন প্রকার ক্রিয়ার কবলিত হওয়া। কিন্তু কি কুকর্ম কি সুকর্ম, ক্রিয়া মানেই নিন্দনীয়। উপনিষদ চিন্তানায়কগণের মতে সুকর্মও ইহলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কোনক্রমেই ভিন্নলোকে যেতে সাহায্য করে না। আর কুকর্মের বেলায় তো কথাই নেই। এইভাবে উপনিষদে বলা হয়েছে ইহলোক পাপ পরিপূর্ণ লোক। সর্বৈব পরিত্যাজ্য। আর একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপমভিঃ সংসৃজ্যতে। পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করে শরীরলাভই পাপসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। ইন্দ্রিয়সর্বস্ব শরীরই সকলপ্রকার অনিষ্ট বা পাপসমূহের উৎস। আর ইহলোক তো পাপসমূহ সংঘটিত হওয়ার একমাত্র সহায়ক স্থানই। ব্রহ্মবিদগণের মতে এককথায় ইহলোক পাপসমূহের ঘূর্ণাবর্ত। এখান থেকে মুক্তির উপায় নেই। ঘুরে ফিরে এখানেই চিরকাল অবস্থান করতে হবে।

এবার ত্রিলোক তত্ত্ব আলোচনা করলেই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সোপান হিসেবে দ্বিস্তর প্রক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। এই দ্বিস্তর প্রক্রিয়া যথাক্রমে পিতৃযান এবং দেবযান। এই পিতৃযান আলোচনা করলেই ইহলোক সর্বস্ব আলোচনার সাদৃশ্য চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পিতৃযান আলোচনায়- বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে[৫] অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকঞ্জয়ন্তি তে ধূমম্ অভিসংভবন্তি, ধূমাৎ রাত্রিম, রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণ পক্ষম্, অপক্ষীয়মাণ পক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান দক্ষিণা অদিত্যঃ এতি ; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্। তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নম্ ভবন্তি। যারা যজ্ঞ দান তপস্যার দ্বারা লোকসমূহকে জয় করে তারা মৃত্যুর পর চিতাগ্নির সাহায্যে ধূমলোক প্রাপ্ত হয়। আর এই ধূমলোক থেকে রাত্রিলোকে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ থেকে

দক্ষিণায়নে অর্থাৎ সূর্যেরদক্ষিণায়নে ছয় মাসে, আর এই মাস সমূহ থেকে পিতৃলোক, পিতৃলোক থেকে চন্দ্রলোকে গমন করে। চন্দ্রলোকে গিয়ে পুনরায় অন্নে পরিণত হয়। এই অন্ন দেবগণ ভক্ষিত হয়ে আকাশে ব্যাপ্ত হয়। আকাশ থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে এসে অন্ন হয়। এই অন্ন পুরুষরূপে অগ্নিতে আহুত হয়ে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে জাত হয়। এইভাবে পুরুষসমূহ কর্ম নিবন্ধন জনিত ফলভোগের ফলে বার বার চক্রাকারে ফিরে ফিরে আসে। তে লোকান প্রতি উত্থায়িনঃ তে এবম্ এব অনুপরিবর্তন্তে।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে।[৬] অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তম্ ইতি উপাসতে, তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি ধূমাৎ রাত্রিম্; রাত্রেঃ অপরপক্ষম্; অপরপক্ষাৎ যান্ ষট্ দক্ষিণা এতি মাসান্ তান ন এতে সংবৎসরম্ অভিপ্রাপ্নুবন্তি। যারা গ্রামে ইষ্ট অর্থাৎ জনকল্যাণ মূলক কর্মাদি সম্পাদন করে, পূর্ত্ত কাজ বলতে কূপ, পুষ্করিণী, খাল, উদ্যান ইত্যাদি সমাজসেবা-মূলক কাজে উৎসর্গ করে নিজেকে, আর দত্তম বলতে জনসাধারণের মধ্যে যারা অভাজন তাদেরকে ধনসম্পদ দানের মাধ্যমে পুণ্য অনুষ্ঠান পালন করে তারা মৃত্যুর পর ধূমে গমন করে। ধূম থেকে রাত্রিতে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, আর কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়নের ছয় মাস গমন করে।[৭] মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ আকাশম্ আকাশাৎ চন্দ্রমসম্। এষঃ রাজা। তৎ দেবানাম্ অন্নম্। তম্ দেবাঃ ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা অথ এতম্ এব অধবানম্ পুনঃ নিবর্তন্তে। যথা ইতম্ আকাশম্। আকাশাৎ বায়ুম্। বায়ুঃ ভূত্বা ধূমঃ ভবতি। ধূমঃ ভূত্বা অভ্রং ভবতি। অভ্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি। মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি। তে ইহ ব্রীহিযবাঃ ওষধি বনস্পতয়ঃ তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে। অতঃ বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্। এই ভাবে মাসসমূহ থেকে পিতৃলোকে, পিতৃলোক থেকে আকাশে, আকাশ থেকে চন্দ্রলোকে গমন করে। এই চন্দ্রই সোমরাজা। সেই সোম দেবগণের অন্ন। দেবগণ সোমকেই ভক্ষণ করেন। কর্মক্ষয় পর্যন্ত এইভাবে চন্দ্রলোকে থেকে আবার যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই ফিরে আসে। অর্থাৎ আকাশ থেকে বায়ুতে, বায়ু থেকে ধূমে, ধূম থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টিতে। তারপর এই পৃথিবীতে ধান, যব, ওষধি, বনস্পতি তিল ও মাষ হয়ে জন্মায়। সন্তান উৎপাদনসমর্থ যে যে প্রাণী ঐ অন্ন ভোজন করে সে সেই সকল প্রাণীকেই পুনরায় জন্ম দেয়। এই যে চক্রবৎ পরিবর্ত অবস্থা তা অনিবার্য, দুরতিক্রমণীয় সহজে অতিক্রম করা যায় না। এই ভাবে দেখা যাবে যে প্রায় সব কটি উপনিষদে

কোন না কোন ভাবে পিতৃলোক বলতে ইহলোককেই বোঝানো হয়েছে। আর ইহলোকে লোকসমূহের জন্মের ঘূর্ণাবর্ত প্রায় একই প্রকারে চিত্রিত করা হয়েছে। এই যে পিতৃলোক বর্ণনা তা তৎকালীন প্রচলিত কর্মতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা। এই প্রচলিত কর্মতত্ত্ব কি? এই প্রচলিত কর্মতত্ত্ব যা পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বোঝায় ক্রিয়াই কর্মতত্ত্বের মূল কথা। এই কর্মতত্ত্ব অনুযায়ী ক্রিয়াই মানুষকে পাপ ও পুণ্যে বিভক্ত করে। এই কর্মতত্ত্বের সঙ্গে অক্রিয়া বা কর্মহীনতার কোনরূপ সংস্পর্শ নেই। বরং সত্য যা তা হলো এই পিতৃযান সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় আশ্চর্য মিল রয়েছে ঋগ্‌বেদের জন্ম-মৃত্যু রহস্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যার। আর এর থেকে এ কথাই প্রমাণিত এমনকি উপনিষদের যুগে ও ঋগ্‌বৈদিক যুগের কর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা লোকসমাজে অটুট ছিল। নিশ্চিতরূপে এই জন্য কিনা তা পাঠকই বিবেচনা করবেন উপনিষদ ঋষি আর্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে কর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় লোকান্তবাল খুঁজতে। স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে লোকসমক্ষে নয় চল কোন নির্জন স্থানে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। তাছাড়া শুধু উপনিষদ যুগের কথাই বা শুধু তুলব কেন? আজও কি সাধাবণ লোক সমাজে লৌকিক সংস্কৃতিতে কর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত অনুরূপ ধারণা সমান ভাবে জাগরূক নয়? একটু চোখ-কান খোলা রেখে হাঁটলেও দেহাতি মানুষকে এবম্বিধ কথা বলতেই শোনা যাবে। আর এর থেকেই প্রমাণিত যে প্রাচীন ঋগ্‌বৈদিক কর্মতত্ত্ব কার্যত লোকায়ত কর্মতত্ত্বেরই ভগ্নরূপ। যা আজও নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও টিকে আছে।

কি সেই প্রচলিত কর্মতত্ত্ব? তা হলো লোকসমূহ যদি গৃহস্থ পিতার সুকর্ম অনুসরণ করে, সমাজ হিতকর মঙ্গলজনক কর্ম সম্পাদন করে যেমন পুষ্করিণী, খাল, কূপ খননাদি কর্ম, ভোগ অতিরিক্ত ভোগ্য যদি লোক সাধারণে বিতরণ করে তবেই সে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেছে বলে লোকপূজ্য হয়। আর লোকপূজ্য এই সব ব্যক্তি মানুষের মণিকোঠায় সুদীর্ঘকাল ঠাঁই করে নেয়। তারাই পিতৃযান লাভে সমর্থ হয়। আর যারা লোকহিতকর কাজে পরাম্মুখ তারা লোকসমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে পিতৃযান থেকে বিচ্যুত হয়। তারা ঘৃণ্য, পাপী সমাজেও অনুরূপভাবে অনাদৃত বিবেচিত হয়।

এই হল প্রচলিত কর্মতত্ত্বের প্রকৃতি। যার মূল কথা হল ক্রিয়া বা গতি। এই কর্মতত্ত্ব সংসারগতিকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করেছে। আর সংসারগতি অনিবার্য-ভাবে দুঃখ-শোক-তাপ যুক্ত মর্তভূমিকে আশ্রয় করে বিবর্তিত হয়। তাই এই সংসারভূমি যন্ত্রণার শ্রীক্ষেত্র, নরকভূমি বলে পরিচিত। সংসার গতির দ্বারা

প্রভাবিত সমাজ তাই নিত্য আবর্তনশীল। জন্ম-মৃত্যুর দুর্ঘটনা ছাড়া সংসারী জীবনের অন্য কোন ঘটনা নেই। সংসারগতির সার কথা হল, জন্মাও আর মর। তাই সমগ্র উপনিষদ জুড়েই যে কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা হলো, সংসারগতি মাত্রেই ঘৃণ্য। পুরুষকে বন্ধনে অবদ্ধ রাখে। জন্ম-মরণশীল নরক-লোকে আবর্তনশীল হয়। বার বার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে[৮]—তস্মাৎ জুগুপ্সেত। সংসার-গতিকে ঘৃণা কর। সংসারগতি মানেই পুরুষের ইহলোক বন্ধন। কিন্তু মুক্তিই পুরুষের আকাঙ্খা। প্রচলিত কর্মতত্ত্ব পুরুষের মুক্তি তরান্বিত করে না। পিতৃ-লোকের পথে সমাজহিতকর কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড় জোর ধূমলোকের আশ্রয়ে নানাভাবে পরিভ্রমণ করে পুনরায় ইহলোক, এই পৃথিবীতেই ফিরে আসে। পুরুষের কখনোই তাই মনুষ্যেতর প্রাণীর গতির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখা ঠিক নয়। তারও উর্দ্ধে ওঠা উচিৎ। আর কিভাবে তা সম্ভব? উপনিষদ চিন্তানায়কগণ এ ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রচলিত কর্মতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে সচেষ্ট হলেন।

এইভাবে দেখা যায় উপনিষদ চিন্তানায়কদের পিতৃযান তত্ত্বের পাশাপাশি দেবযান তত্ত্বের আমদানি করতে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত কর্মতত্ত্বেরও রূপান্তর ঘটানো হয়। কিন্তু উপনিষদ চিন্তানায়কগণ যথেষ্টই সমাজসচেতন ছিলেন। তাই এই রূপান্তর কার্যকর করতে গিয়ে প্রচলিত কর্মতত্ত্বকে সরাসরি নাকচ করে তো দেনই নি বরং তাকে ভিত্তিভূমি করে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটানোয় তৎপর হয়েছেন। তাঁরা কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন মুমুক্ষু পুরুষের সামনে দুটি পথ খোলা। একটি পিতৃযান ও অপরটি দেবযান। পিতৃযান ধূমাকীর্ণ অন্ধকার পথ আর দেবযান অর্চিযুক্ত আলোর পথ। পিতৃযান দেবযানের সোপান। এইভাবে পিতৃযানকে প্রথমে স্বীকৃতি দিয়ে ও চূড়ান্ত পর্যায়ে দেবযানকেই একমাত্র মুক্তির পথ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পথ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন এই কাজ কিভাবে, কোন ধারায় করা হয়েছে তা বোঝানোর জন্য এখানে উদ্ধৃতি তুলে ধরব।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতৃযান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[৯]—অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তম্ ইতি উপাসতে তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি ধূমাৎ রাত্রিম্, রাত্রেঃ অপরপক্ষম্ অপরপক্ষাৎ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সম্বৎসরম্ অভি-প্রাপ্নুবন্তি। আর যারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত, দান ইত্যাদি কর্ম করে তারা মৃত্যুর

পর ধূমে গমন করে। ইষ্টাপূর্ত বলতে ইষ্ট ও পূর্ত। ইষ্ট বলতে জণগণের মঙ্গলজনক কর্ম পদ্ধতি সম্পাদন করে। কি সেই মঙ্গলজনক কর্ম? তা পূর্ত কথাটির মধ্য দিয়েই বোঝানো হয়েছে। পূর্ত বলতে কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান ইত্যাদি কর্তব্য কর্ম। আর দত্ত বলতে অক্ষম, দরিদ্র সাধারণকে দান বোঝাচ্ছে। যারা এইসব লোকহিতকর কাজ করে থাকে তারা ধূমে গমন করে। ধূম থেকে রাত্রিতে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়নের ছয় মাসে যায়। পিতৃযান পথে গমন করে। কখনোই সংবৎসর প্রাপ্ত হয় না। সেখানে ছয় মাস অতিবাহিত করার পরই পৃথিবীতে ফিরে আসে।

অপরদিকে দেবযান সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি। অর্চিষঃ অহঃ। অহ্নঃ আপূর্যমান পক্ষং। অহ্নঃ আপূর্যমান পক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান্ উদঙ এতি তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্, সঙবৎসরাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্ চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্। তৎপুরুষঃ অমানবঃ সঃ এনান ব্রহ্ম গময়তি। এষঃ দেবযানঃ পন্থাঃ ইতি। যাঁরা বিশেষতঃ বাণপ্রস্থে অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যায় রত তাঁরা অর্চিতে গমন করে। আর এইভাবে অর্চি থেকে দিনে, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ থেকে উত্তরায়ণের ছয় মাসে গমন করে। মাস সমূহ থেকে সংবৎসরে, সংবৎসর থেকে আদিত্যে, আদিত্য থেকে চন্দ্রে, চন্দ্র থেকে বিদ্যুতে গমন করে। আর এই বিদ্যুতে থাকাকালীন অবস্থায়ই এক অমানব পুরুষই এঁদেরকে ব্রহ্মলাভ করান।

কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দেবযান ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে যেখানে মাস সমূহ থেকে সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুতের ক্রম বিভাজন করা হয়েছে বৃহদারণ্যক তাকেই সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে—[১১] মাসেভ্য দেবলোকম্, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্ তান্ বৈদ্যুতান পুরুষঃ মানসঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। বৃহদারণ্যকের মতে এই ক্রম যথাক্রমে দেবলোক আদিত্য ও বিদ্যুৎলোক। আর এই বিদ্যুতে অবস্থান কালেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে যে চন্দ্রলোকের কথা বলা হয়েছে তাতে পিতৃযানের সংসর্গ থাকায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে কিছু অতিরিক্ত অংশও যুক্ত করা হয়েছে যেমন[১২] তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতঃ বসন্তি; তেষাম্ ন পুনরাবৃত্তিঃ। অর্থাৎ সেই সকল ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির পর চিরকাল বসবাস করেন। তাদের আর কোনদিন পৃথিবীতে পুনরাগমন করতে হয় না।

উপরের বর্ণনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে মৃত্যুর পর চিতার অগ্নি থেকেই দেবযান ও পিতৃযান পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অ-কর্মী ক্রিয়াহীন উপাসকেরাই দেবযান-এর পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। দেবযান এর পথ বর্ণনাও চিত্তাকর্ষক। চিতার অগ্নিশিখার পথ হলো দেবযান পথ। আর চিতার থেকে ওঠা ধূমের পথ হলো পিতৃযানের পথ। এইভাবে দেখা যায় দেবযান ও পিতৃযান পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি আলোর পথ অপরটি অন্ধকারের পথ। পিতৃযানের ক্ষেত্রে যেখানে মৃত্যুর পরে চিতাগ্নির ধূমের পথে রাত্রিতে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষে, দক্ষিণায়নে এবং সর্বশেষে চন্দ্রলোকে যায়। তারপর আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এখানে লক্ষণীয় কর্মীরাই কেবল পিতৃযানের পথে যায়। কিন্তু ক্রিয়াকর্মহীন উপাসক শ্রদ্ধা ও মননের মাধ্যমে সিদ্ধকাম হয়ে অর্চিতে, অর্চি থেকে দিন, দিন থেকে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ থেকে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণের থেকে আদিত্যলোকে, পরিশেষে বিদ্যুৎলোক থেকে ব্রহ্মলোকে নীত হন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল দক্ষিণায়ন পিতৃলোক আর উত্তরায়ণ দেবলোক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিভাজনের মধ্যে তৎকালীন সমাজচেতনা চিহ্নিত। ঋতু বৈচিত্রের পথ ধরেই ফিরে আসাকে চিত্রিত করা হয়েছে দক্ষিণায়ণে আর অগস্ত যাত্রাকে চিত্রিত করা হয়েছে উত্তরায়ণে। যাতে সাধারণ মানুষ সহজে ঋতু বৈচিত্রের পথ ধরে পিতৃলোক থেকে দেবলোকের পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আকর্ষণীয় পার্থক্য আরো চোখে পড়ে যখন দেখা যায় পিতৃলোককে অন্ধকার লোক ও দেবলোককে জ্যোতির্লোক বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পিতৃলোকই অবিদ্যালোক। যে বা যারা পিতৃলোকের সাধনা করে তারা অন্ধকার থেকে গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসেতে' ইত্যাদি উদ্ধৃতি স্মরণীয়। আরো চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো লোকায়ত দর্শন প্রতিনিধি উদ্দালক, পুত্র শ্বেতকেতুকে কেবল ইহলোক তত্ত্বই রপ্ত করিয়েছিলেন। আর শ্বেতকেতু প্রবাহণ সংবাদে দেখা যায় যে প্রবাহণ পরলোক সম্পর্কিত যে পাঁচটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন শ্বেতকেতু তার কোনটিরই উত্তর দিতে পারেননি। শ্বেতকেতুকে প্রবাহণের তৃতীয় প্রশ্নটি এখানে উল্লেখ করতে পারি। তা ছিল[১৩] বেথ পথোঃ দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্তনা ত ইতি। দুটি পথের যথা দেবযান পিতৃযানের পথ কোথায় পৃথক হয়েছে জান? শ্বেতকেতু এর বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। কারণ লোকায়ত দর্শনবিদ তাঁর পিতা তাঁকে কেবল লোকজগত সম্পর্কেই দীক্ষা দিয়েছেন। লোকান্তরিত কোন পরলোক যেহেতু হয় না, হতে পারে না, সেই সম্পর্কিত কোন কিছুই উদ্দালক দীক্ষা দেননি। তাই

শ্বেতকেতুর পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার উত্তর কিছু পরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানেও যা কিছু উল্লেখ করা আছে তা লক্ষ্যণীয়। সেখানে আছে মৃত্যুর পর সকলেরই অগ্নিগতি হয়। সেই অগ্নিগতি থেকে পথ দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ ধূমের পথে যায়, আবার কেউ কেউ যায় অর্চি বা অগ্নিশিখার পথে। অগ্নিশিখার পথই দেবযান। আর ধূমের পথই পিতৃযান। জ্ঞানিগণ দেবযানযাত্রী। আর কর্মীগণ পিতৃযান যাত্রী। জ্ঞানিগণ দেবলোক থেকে ব্রহ্মলোকে নীত হন। আর কর্মীগণ চন্দ্রলোক থেকে ইহলোকে ফিরে আসে। এইভাবে জ্ঞান ও কর্মকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আচার হিসেবে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে জ্ঞানই অক্রিয়া কর্মই ক্রিয়ারূপে চিহ্নিত।

তাহলে কি এই নতুন কর্মতত্ত্ব? উপনিষদ চিন্তানায়কগণ এই কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় কর্মকে দুভাগে ভাগ করে দেখাতে থাকলেন। যথাক্রমে ক্রিয়া ও অক্রিয়া। ক্রিয়া অর্থে গতিকেই বোঝানো হয়েছে। সমগ্র জগৎ প্রক্রিয়াই গতির দ্বারা সক্রিয়। এই ক্রিয়া বা গতি দ্বন্দ্বকে সূচিত করে। দ্বন্দ্ব আবার দ্বৈত উপস্থিতিকে চিহ্নিত করে। অতএব ক্রিয়া অর্থে কর্ম বিভিন্নতার পরিচায়ক। জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ক্রিয়া বর্তমান। যে কোন বস্তুই ক্রিয়ার ফলে ভেতরে ও বাহিরে অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই ক্রিয়া আবার দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়ই। দৃষ্ট অর্থাৎ যা খালি চোখে দেখা যায়। অদৃষ্ট অর্থে যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এই দৃষ্ট ও অদৃষ্ট শব্দটির রূপভেদ লক্ষ্যণীয়। অদৃষ্ট শব্দটির রূপান্তর হতে হতে একটি অলৌকিক ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত হয়। কর্মের দৃষ্ট প্রক্রিয়া ক্রমে নতুন উদ্ভূত ধারণার চাপে কোণঠাসা হতে হতে লোকসমাজে পুনর্জন্মের পথ ধরে আসন তৈরী করে নেয়। এরই পাশাপাশি গড়ে ওঠে অদৃষ্ট তত্ত্ব। এইভাবে দেখা যায় কর্মের স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অদৃষ্ট তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রাণান্তকর প্রয়াস চোখে পড়ে। কিন্তু এত করেও কর্মের গতিসংক্রান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা সম্ভব হয়নি। তা নানানভাবে উপনিষদ সমূহেই জায়গা করে নিয়ে প্রচলিত কর্মতত্ত্ব হিসেবে অটুট থাকে।

বৈদিক যুগে আমরা দেখি লোক সাধারণ এমনকি চিন্তানায়কগণও এই ইহলোকের প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট। পরলোক সম্পর্কে প্রাচীন ঋগ্‌ বৈদিক যুগে কোন আগ্রহ ছিল না প্রায়। কেননা ঋগ্‌ বৈদিক যুগের মানুষকে দীর্ঘ জীবন কামনা করতে দেখা যায়। ঋগ্‌বৈদিক যুগের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কামনা হল

পূর্ণ জীবন লাভ। পূর্ণ জীবন বলতে শতবর্ষের পরমায়ু বোঝানো হত। এর উল্লেখ শেষের দিকে উপনিষদেও পাই। যেমন ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে[১৪]—কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এই পৃথিবীতে মানুষ কর্তব্য কর্ম করেই শতবর্ষ বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। বৈদিক সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে দেখা যায় দীর্ঘ জীবন কামনাই প্রধান কামনা।[১৫] ঋগ্‌বৈদিক সাহিত্যে তো অবশ্যই এমনকি উপনিষদেও তার রেশ বর্তমান। পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হলো বহু পুণ্য কর্মের ফল। এক কথায় সুকর্ম বা পুণ্যকর্মের পুরস্কার হল পুনর্জন্ম। মৃত্যু হলো ভবিষ্যৎ সকল আশার সমাধি। মৃত্যুকে এড়ানোর সার্বিক প্রচেষ্টা রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। সুখী সমৃদ্ধ জীবন এইভাবে নির্ভর করে সুকর্ম বা পুণ্যকর্মের উপর। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তো রয়েছেই এমনকি উপনিষদেও বর্তমান সুখী সমৃদ্ধ জীবন সম্ভব ত্যাগ, নিষ্ঠা ও জনহিতকর কাজের দ্বারা। পুণ্য কর্ম বলতে চিহ্নিত করা হয়েছে ইষ্টাপূর্ত-দান। এই ইষ্টাপূর্ত-দান মানুষকে সুখ সর্বস্ব স্বর্গলোক লাভে সাহায্য করে। আর স্বার্থসর্বস্ব কুকর্ম নরক যন্ত্রণা ডেকে আনে। স্বর্গ-নরকের অবতারণা বৈদিক সাহিত্যে থাকলেও স্বর্গ-নরক বলতে কোন ভিন্ন পরলোক-এর কথা বোঝানো হয় নি। ইহলোকেই স্বর্গ-নরক ভোগ হয়। পরলোক বলে কিছু নেই। ইহলোকই সব। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে পরলোক চিন্তা প্রাধান্য পেলেও পূর্ব ধারণার অবশেষ রয়েছে। কঠ উপনিষদে আছে—অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী। এইভাবে বৈদিক সাহিত্যে আমরা দেখি মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। বৈদিক যুগের মানুষকে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে বলতে 'পুনর্বার ফিরে এসো'। ফলে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের আদি ভাগে কর্ম ক্রিয়া অর্থেই প্রচলিত ছিল।

উপনিষদ যুগে এসে কর্ম শব্দের দ্রুত রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের পটভূমি ব্যাখ্যা যতটা সম্ভব ইতিপূর্বে করেছি। কিন্তু এই সংস্কৃতি জগতের পরিবর্তন হঠাৎই যে হ'য়েছে এমন কোন ঘটনা নয়। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে উপনিষদ যুগে এসে দেখি সমাজ স্পষ্টতই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্বিজ ও শূদ্র।[১৬] ঋগ্‌বেদের পর্যায়ে শ্রেণী বিভাগের আদি হলেও শ্রেণী শাসনের চণ্ড রূপ উপনিষদ যুগেই পাখা বিস্তার করতে পেরেছে।[১৭] ঋগ্‌বেদেই প্রথম এই দুই শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রম প্রথার শুরু এখানেই। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজের অন্তিম ধ্বনি শোনা গেলেও অবশেষ তখনও ছিল।

আর্যসামাজিক প্রেক্ষাপটে তখন আর্য-অনার্য বিভাগ চালু হয়ে গেছে। বর্ণাশ্রম প্রথায় ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র বিভাজন হয়ে গেছে। হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে আসা আগন্তুকরাই এই বিভাজনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতবর্ষের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে কখনো যুদ্ধে কখনও সমঝোতায় যখন স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলল ও বিপদ উপস্থিত হল নিজেদের মধ্য থেকেই। নিজেদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব ক্রমশই বিরাট আকার ধারণ করত। এমন কি মাঝে মাঝে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শেষ হত। বিবাদ সম্পদ-এর ভাগ নিয়ে। নিজেদের মধ্যে যে কর্মবিভাগ ছিল তাই নিয়েও বিবাদ বাধত। আর্যদের মধ্যে প্রচলিত কর্মবিভাগ বলতে বিদ্যাচর্চা যাগ যজ্ঞাদি যারা করত তারা ব্রাহ্মণ, যারা যুদ্ধে ও শাসনে নিযুক্ত তারা রাজন্য এবং কৃষিকর্ম পশুপালন ও পণ্য বিনিময় করত তারা বৈশ্য বোঝাত।

রাজা বা গোষ্ঠীপতি পড়লেন মহাচিন্তায়। এখন বিপদ বাইরে নয়। বিপদ ভেতর থেকে। যেভাবেই হোক নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ প্রশমিত করা চাই। সামাজিক পরিস্থিতির চাহিদা পূরণের তত্ত্ব তৈরী হয়ে যায়। চিন্তাজগতে আলোড়ন শুরু হয়। দীর্ঘ অনুশীলনে যে উপায় বেরোল তা হলো আর্য সমাজের সকলেরই প্রাধান্য বা অবসর দেওয়া চাই। আর বিজীত অধিবাসীদের দিয়েই সেই কাজ সমাধা করা হলো। বিজীত স্থানীয় অধিবাসীদের বেঁধে এনে লাগানো হলো আর্যদের সেবায়।[১৮] পরিণত করা হলো ক্রীতদাসে। আর শ্রম করতে হলো না আর্য সম্প্রদায়কে। প্রাধান্য ও অবসর দুইই পাওয়ায় আর্য সম্প্রদায়ের সকলেই খুশী। আর এখান থেকেই শ্রেণীর শুরু হল। আর্য বনাম অনার্য রূপান্তরিত হলো দ্বিজ ও শূদ্রে। আর্য সম্প্রদায় দ্বিজ হিসেবে পরিচিত হলো। দ্বিজ অর্থাৎ দুবার জন্ম। জন্মসূত্রে ও উপনয়ন সূত্রে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হল দ্বিজ। দ্বিজ শাসক সম্প্রদায় আর শাসিত, সেবাদাস হল শূদ্র। অ-কর্ম, অবসর হলো দ্বিজ সম্প্রদায়ের ভূষণ। আর শূদ্র সম্প্রদায় কর্মী, সেবাকারী। কর্ম ব্যাপারটা অশ্রদ্ধার, অবহেলার। শূদ্র সম্প্রদায় সেই সবের সঙ্গে যুক্ত, ঘৃণ্য। এইভাবে অবসর ও আলস্য যুক্ত হয় দ্বিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর শ্রম, কৃচ্ছ্রসাধন যুক্ত হয় শূদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে। কালে কালে ক্রিয়া বা কর্ম ঘৃণ্য ও অ-ক্রিয়া বা অ-কর্ম অভিনন্দিত হতে থাকে।

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে তাই দেখা যায় কর্মের নিন্দা ও অ-কর্মের জয়গান। কর্ম ও পুনর্জন্মের নতুন ব্যাখ্যা সংযোজিত করা হলো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রাচীন বৈদিক যুগে পুনর্জন্ম পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত হতো। ভালো কাজের

ফল স্বরূপ পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার কামনা ব্যক্ত করা হতো। যেহেতু অন্য কোন লোক-এর চিন্তা অবান্তর পুণ্য কর্মের দ্বারা এই জগতে ফিরে আসাই শ্রেয়। কিন্তু উপনিষদ যুগে এসে এই ব্যাখ্যাকে বাতিল করা হলো। ইহলোক-কেই নরক হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। জীবনের অর্থই হলো বন্ধন। শোক-তাপ-দুঃখ-পেষণ যন্ত্রণাই জীবনের পাথেয়। অতএব পুনর্জন্ম হলো অভিশাপ। ইহলোক তাই সর্বৈব পরিত্যাজ্য। জপ-তপ-মননে পরলোক সাধনাই পুরুষের একমাত্র কাম্য বস্তু। এক্ষেত্রে পরলোক ব্যাখ্যা কর্তাগণ নতুন মাত্রা সংযুক্ত করলেও প্রচলিত কর্মতত্ত্বকে একেবারেই নস্যাৎ করে না দিয়ে জন্মান্তরবাদের মিশেল ঘটিয়ে দ্বিস্তর তত্ত্বের আমদানি করলেন। এই দ্বিস্তর তত্ত্বই যথাক্রমে পিতৃযান ও দেবযান। পিতৃযান তত্ত্বে থাকলো প্রচলিত বৈদিক ধারণার ইহলোক অংশবিশেষ আর দেবযান তত্ত্বে পরলোক ধারণার জাগরণ করে জন্মান্তরের নতুন তত্ত্ব উদ্ভব ঘটানো হলো।

কি সেই জন্মান্তরবাদের নতুন সংযোজন? জীবন মাত্রেই কর্ম নিয়ন্ত্রিত। কর্মের পরস্পর বিরোধী দিক বর্তমান। ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক। পুণ্য কাজ পুণ্য ফল দেয়, পাপ কাজ পাপ ফল দেয়। পুণ্য দেয় সুখ, পাপ দেয় দুঃখ। কর্ম নির্ধারিত মানব জীবনে পুরুষ কখনোই এই কর্মকে এড়াতে পারে না। এমনকি ইহজীবনে সম্ভব না হলেও পরজীবনে তার ফলভোগ বর্তায়। এই কর্মের সহযোগী ভূমিকা নেয় জন্মান্তরবাদ। জন্মান্তরবাদ এই নতুন ব্যাখ্যায় দ্বৈত উদ্দেশ্য সিদ্ধকারী হয়ে ওঠে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্ব ও আত্মতত্ত্বের সঞ্জীবন। আত্মা চিরন্তন, অমর, জন্ম-মৃত্যু রহিত। জন্ম হল আত্মার শরীর ধারণ আর মৃত্যু হল আত্মার শরীর মুক্তি। এইভাবে এই নবতম ব্যাখ্যায় জন্মান্তরবাদ আত্মার চিরন্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুতির পর্যায় হয়ে ওঠে।

উপনিষদ চিন্তানায়কগণ এই কর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন যেন এই কর্মতত্ত্ব কোনভাবে বহিঃশক্তি হিসেবে পরিগণিত না হয়। কারণ তা কর্মবাদের পক্ষে অতীব ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে। তাঁদের প্রতিপাদিত তাৎপর্য হল কর্ম বাইরে থেকে জীবন নিয়ন্ত্রিত করে না। ব্যক্তির মধ্য থেকেই কর্ম ব্যক্তি-জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সকল কিছুর নিয়ন্তা এই কর্ম। এই কর্ম হল অলঙ্ঘ্য নিয়ম। কেউই একে এড়াতে পারে না। এই কর্মের যে অমোঘ নিয়ম তা ইহজীবনে ভোগ সম্ভব না হলে ও পর জীবনে তার ফলভোগ বর্তায়। এইভাবে নতুন কর্মতত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায় অখণ্ডনীয় এক নৈতিক শৃঙ্খলা। এই কর্মের ফলভোগ

করতেই হবে। কর্মফল কখনোই নষ্ট হয় না। এই কর্মবাদ তাই সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়ম জীবন-জগৎ সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু সর্বব্যাপী আত্মা কর্মনিয়ন্ত্রিত নয়। কর্মফল ভোগের জন্যই আত্মা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ অঙ্গাঙ্গি জড়িত। জন্মান্তরবাদ অনুসারে মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম হয়। আত্মা তখন নতুন একটি দেহ ধারণ করে। কৃতকর্মের ফলভোগ যদি বর্তমান জীবনে না হয়, কর্মফল ভোগ নিমিত্তই আবার দেহ ধারণ করে সংসারে আসতে হয়। কেননা কর্মের ফল বিনষ্ট হয় না। শুভ অশুভ যাই হোক না কেন সংরক্ষিত থাকে। আত্মা কিভাবে দেহ থেকে দেহে যান তার একটু চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে।[১৯] তৎ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্য অন্তম্ গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ নিহত্য অবিদ্যাম্ গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি। যেমন জোঁক তৃণের প্রান্তে গিয়ে অন্য তৃণকে আশ্রয় করে, নিজেকে তার উপর তুলে নেয় তেমনই আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করে, অবিদ্যা দূর করে অন্য একটি আশ্রয় অর্থাৎ দেহকে অবলম্বন করে ও নিজেকে সেখানে নিয়ে যায়। ঠিক এর পরই স্বর্ণকারের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। স্বর্ণকার যেমন একখণ্ড সোনাকে অভিনব ও অধিকতর সুন্দর রূপ দেয় তেমনই আত্মা নতুন আশ্রয় গ্রহণ করে জীর্ণকে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে। এই নতুন আশ্রয়ের আকার নির্ভর করবে পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী।

কিন্তু এই নতুন ব্যাখ্যাত কর্মতত্ত্ব যে সেই উপনিষদ যুগেই বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল তার নজির আমরা সেই উপনিষদ থেকেই পাই। কেননা লোক সাধারণ তখন ও প্রাচীন বৈদিক কর্মতত্ত্বকেই মানে। তাছাড়া তখনই বা কেন বলব আজও যে আদিম মানবগোষ্ঠী টিকে আছে সেখানেও সেই পুরাতন প্রচলিত কর্মতত্ত্বের নজির মিলবে। কেননা এই ঋগ্‌বৈদিক কর্মতত্ত্ব প্রকৃতিবিজ্ঞান নির্ভর। সেই কালের উন্নত চিন্তা চেতনায় যেভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব সেইভাবেই সেই কালের মনীষী জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই নতুন ব্যাখ্যাত কর্মতত্ত্ব প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্মত তত্ত্বকে নস্যাৎ করে এক কাল্পনিক কর্মতত্ত্বকে লোক সাধারণের চিন্তা-চেতনায় চারিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সফলও হয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত কর্মতত্ত্বকে পুরোপুরি মুছে ফেলাও সম্ভব হয়নি। আমরা উপনিষদ থেকেই উদাহরণ তুলে ধরে দেখানোর চেষ্টা করব। প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে শিক্ষা নিয়েই যে তৎকালীন মনীষী জন্ম-মৃত্যুর ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন তার উদাহরণ

কঠ উপনিষদেই বর্তমান।[20] অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্যতথাপরে। শস্যম্ ইব মর্ত্যঃ পচ্যতে, শস্যম্ ইব অজায়তে পুনঃ। পূর্বাপর পুরুষগণের মতো আমাদেরও ইতি কর্তব্য। মরণশীল মানুষ শস্যের মত জীর্ণ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে, আবার শস্যের মতই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। কি এই সূত্রে নির্দেশ? জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলছে, চলতে থাকবে। এই সংসারে মানবজীবন অনিত্য। জন্মালেই মৃত্যু অবধারিত। কেউই এই মৃত্যুকে খণ্ডাতে পারে না। অতএব পূর্বপুরুষগণ যেভাবে সাধু কর্ম করে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে আছেন, সেখানে অসাধুতার প্রশ্নই আসে না। বিয়োগ শোক বৃথা। এ হলো সংসার গতি। প্রচলিত কর্মতত্ত্বের প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা ঐতরেয় উপনিষদেও পাই। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে—[21] পুরুষে হ বৈ অয়ম্ আদিতঃ গর্ভঃ ভবতি, যৎ এতৎ রেতঃ, তৎ সর্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ তেজঃ সম্ভূতম্ আত্মনি এব আত্মানং বিভর্তি। যদা তৎ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি, অথ এনৎ জনয়তি। সংসারী আত্মা পুরুষ শরীরেই গর্ভরূপে থাকে। শুক্রই হল সেই গর্ভ শরীর সম্ভূত তেজ। পুরুষ দেহে এই যে শুক্র, সকল দেহ থেকে সারস্বরূপ উক্ত শুক্রকে পুরুষ নিজ শরীরেই ধারণ করে। সে যখন উক্ত শুক্র স্ত্রীতে সিঞ্চন করে, তখন শুক্রকে গর্ভরূপে জন্ম দেয়। এই-ই হল জীবন প্রবাহ। এইই হল সৃষ্টি।

এই জন্ম-মৃত্যু তত্ত্ব সম্পূর্ণতই কর্ম নির্ভর। কর্ম্ম মানে ক্রিয়া। ক্রিয়া অর্থে ভালো কাজ, মন্দ কাজ ইত্যাদি। সকল প্রকার কর্মের উৎসই শরীর। শরীর থেকেই কর্মসমূহ উৎপন্ন হয়। কর্মসমূহের সমাহারই হল শরীর। আবার কর্ম শরীরের মন্ত্র বা ধারক। ঠিক অনুরূপ ব্যাখ্যা আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেও তুলে ধরতে পারি।[22] অথ কর্মনাম্ আত্মা ইতি এতৎ; এষাম্ উক্থম্; অতঃ হি সর্বাণি কর্মাণি উত্তিষ্ঠন্তি। এতৎ এষাম্ সাম্। এতৎ হি সর্বৈঃ কর্মভিঃ সমম্। এতৎ এষাম্ ব্রহ্ম। এতৎ হি সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি। এই কর্মের অর্থ দৃষ্ট। কর্ম ইচ্ছাধীন। যেমন করে যে কোন প্রকার ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই, তার ফলও দেখতে পাই, তেমন ভাবেই কর্ম দৃষ্ট। আর কর্ম ইচ্ছাধীন বলতে, ইচ্ছা অনুযায়ীই কর্ম। বৃহদারণ্যকে তা স্পষ্ট করেই উল্লেখিত। —যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুঃ ভবতি। পাপকারী পাপঃ ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেন। অথ খলু আহুঃ কামময়ঃ এব অয়ম্ পুরুষঃ ইতি। সঃ যথাকামঃ ভবতি, তৎ ক্রতুঃ ভবতি। যৎক্রতুঃ ভবতি; তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে। যে ব্যক্তি যেমন

কাজ করে, যেমন আচরণ যুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি সেই রকম হয়। পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্যবান্। পাপকর্মের দ্বারা পাপী হয়। আবার অনেকে বলেন পুরুষ কামময়। সে যেমন কামনা করে সেইরকম সংকল্পযুক্ত হয়। আর সেইরকম কর্ম করে। আর যেমন কর্ম করে তেমনই সে ফল পায়। এখানে কর্ম হলো ইচ্ছা এবং পুনর্জন্মের মাধ্যম।[২৩]

বিশেষভাবে উল্লেখ করার যা তা হলো এই প্রচলিত ঋগ্‌বৈদিক কর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কর্ম এখানে বহিঃশক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এই কর্ম জীবনের অঙ্গ। দৈনন্দিন জীবনচর্যা থেকে কর্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কর্ম এখানে প্রক্রিয়া। প্রচলিত কর্মতত্ত্ব তাই জীবন আশ্রয়ী। কর্ম প্রক্রিয়ার প্রতিফল হল জ্ঞান। ফলে জ্ঞান ক্রিয়া বহির্ভূত বিশুদ্ধ কিছু নয়। জ্ঞান কর্মাশ্রয়ী। ক্রিয়ার মাঝেই তার বৃদ্ধি। ক্রিয়ার মাঝেই তার সাফল্য। এই সাফল্যই আনন্দ। এই আনন্দই মুক্তি। আনন্দ উপভোগই জীবনের চরম কথা। দুঃখ ভোগই লাঞ্ছনা, কখনোই কাম্য নয়। যথাবিহিত কর্তব্য কর্ম প্রতিপালন করেই মানুষ শতবর্ষ বেঁচে থাকার ইচ্ছা করবে। এইটাই শ্রেয় ইচ্ছা। ইশ উপনিষদে তাই বলা হয়েছে কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানই শতবর্ষ বেঁচে থাকার সিঁড়ি। এই কর্তব্য কর্ম প্রতিপালন ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। এইভাবে প্রচলিত ঋগবৈদিক কর্মতত্ত্ব বস্তুগত, প্রকৃতিবিজ্ঞান নিঃসৃত সেকালের জীবনবেদ।

কিন্তু বিপরীতে যে নতুন ব্যাখ্যাত কর্মতত্ত্ব তা সম্পূর্ণতই প্রচলিত ঋগ্‌বৈদিক কর্মতত্ত্ব বিরোধী। এই নতুন ব্যাখ্যাত কর্মতত্ত্বের সার কথা হল কর্ম মানেই অক্রিয়া।[২৪] কর্ম বা ক্রিয়া মাত্রেই ঘৃণ্য, হীন শ্রেণীর একমাত্র উপায়। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাজ কখনোই শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের উপায় হতে পারে না। তাই শ্রম বা ক্রিয়া মাত্রেই শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের নিকট পরিত্যাজ্য। আমরা পরবর্তীকালে মনুর মানবধর্ম শাস্ত্রে শ্রম ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে কিভাবে ঘৃণ্য ও অচ্ছ্যুৎ করে রাখা হয়েছে দেখতে পাই। কিন্তু এই ক্রমবিকশিত মানব ধর্ম শাস্ত্রের বীজ কিন্তু উপনিষদেই প্রথম উপ্ত হয়েছে। আর সেই বীজ নতুন গড়ে ওঠা কর্মতত্ত্বের মধ্যেই উপ্ত হয়েছে। এই কর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কর্ম হলো সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়ম, একটি অদৃশ্য শক্তি, অদৃষ্ট, জীবন ও জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কিন্তু কর্ম এখানে কখনোই কোন বহিঃশক্তি নয়। কর্ম বাইরে থেকে এসব নিয়ন্ত্রণ করছে না। ভেতর থেকেই এই কর্ম অখণ্ডনীয় নৈতিক নিয়মে সকল কিছু পরিচালনা করছে। এই কর্মবাদ তাই এক কথায় নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম। এখানে

কর্মকে আবার দুভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। কর্ম মাত্রেই ঘৃণ্য বললে তো সকল কর্মকে পরিত্যাগ করতে হয়। অসন-বসন-আহার-বিহার, জপ-তপ-উপাসনা সকলই পরিত্যাজ্য। তাহলে তো নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হয়। এইভাবে প্রচলিত কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা সকাম কর্মই যে কর্ম তাকে নস্যাৎ করতে উপনিষদ চিন্তানায়কগণ কর্ম সকাম ও নিষ্কাম রূপে বিভক্ত করেন। কামনা, বাসনা সর্বস্ব কর্মপদ্ধতি হল সকাম কর্ম আর শরীর ধারণের প্রয়োজনীয় উপাসনা মূলক কর্মসমূহ হল নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মই অবিদ্যা মুক্তির সহায়ক। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে[২৫]—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। সর্বাতীত অথচ সর্বগত ব্রহ্মকে আত্মরূপে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত অহং জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয়। আর মোক্ষবিরোধী কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়ম এই কর্মও সর্বাতীত এবং সর্বগত। একে বাহ্ কোন কিছু ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। ফলে এদিক থেকেও কর্মবাদ প্রচলিত কর্মবাদ বিরোধী। এই নবতম কর্মবাদের প্রবক্তাগণ শুধু যে নতুন কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তাই নয় প্রচলিত কর্মতত্ত্ব অনুরাগী মাত্রকেই তীব্র ঘৃণায় কষায়িত করেছেন। সামাজিক শাসনে অনুশাসনে তো কথাই নেই এমনকি সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শনে এই ঘৃণা চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। ছান্দোগ্য উপনিষদেই এমনই এক ঘৃণামিশ্রিত উদ্ধৃতি বর্তমান।[২৬] তৎ যে ইহ রমণীয়েচরণাঃ অভ্যাশঃ হ যৎ তে রমণীয়াং যেনিম্ আপদ্যেরন্। ব্রাহ্মণযোনিম্ বা ক্ষত্রিয়যোনিম্ বা বৈশ্যযোনিম্ বা। অথ কপূয়চরণাঃ অভ্যাশঃ হ যৎ তে কপূয়াম্ যোনিম্ আপদ্যেরন্—শ্বযোনিম্ বা স্থকরযোনিম্ বা চণ্ডালযোনিম্ বা। যারা এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র শোভন কর্ম করেছিল তারা ব্রাহ্মণ যোনি, ক্ষত্রিয় যোনি বা বৈশ্য যোনিতে জন্মলাভ করেছে। আর যারা কুকর্ম করেছিল তারা কুকুর যোনি, শূকর যোনি বা চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্যণীয় এখানে কুকুর যোনি ও শূকর যোনি এবং চণ্ডাল যোনিকে একাকার করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ শূদ্র সমাজ কুকুর ও শূকর প্রাণীর সমগোত্রীয়। এই শ্লোকের পর পরই বলা হয়েছে—তস্মাৎ জুগুপ্সেত। এই সংসারগতি ঘৃণ্য। একে ঘৃণা করবে। এখানে এইভাবে শুধু যে অপর পক্ষকে সমালোচনা করা হয়েছে তাই নয়, শ্রমভোগী শ্রেণী কর্তৃক শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি শ্রেণী ঘৃণাও প্রতিফলিত। সকল শোভন কর্মের অধিকারী কেবল শ্রমভোগী শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এই শ্রমভোগী শ্রেণীই হল দ্বিজ শ্রেণী, শাসক শ্রেণী। আর সকল কুকর্মের জনক রূপে

চিহ্নিত করা হয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণী, শূদ্র শ্রেণীকে। কুকুর, শুয়োর, চণ্ডাল সকলই এক অন্ত্যজ শ্রেণী। এখন প্রশ্ন কেন এই ক্রোধ এ কি এই জন্যই যে প্রচলিত দ্বন্দ্বে হিমসিম খাওয়া মসীজীবী সম্প্রদায়ের প্রচলিত কর্মতত্ত্বকে অবদমিত করতে না পারার অক্ষম আক্রোশ। এ বিচার দর্শনের অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররাই করবে। এইভাবে নতুন গড়ে ওঠা কর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কর্ম এখানে জ্ঞানের সহায়ক শক্তি। জ্ঞানই মুক্তি। আত্মজ্ঞানে আত্মগ্রন্থি ছিন্ন হয়। তখন তার কর্ম সকল ক্ষয় হয়। বিকার জণিত কর্মক্ষয়ে শরীর ধারণ প্রয়োজন, উপসনামূলক নিষ্কাম কর্মসমূহের জাগরণের মধ্য দিয়েই কেবল এই কর্মযোগ থেকে জ্ঞানযোগের উন্মেষ সম্ভব। এই কর্মবাদ নৈতিক জগতের কার্যকারণবাদ। অদৃশ্য শক্তি, অদৃষ্ট অন্তরাল থেকে কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জীবের ভবিষ্য জীবেরই অধীন। পুরুষ যদি তাই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে তবেই তার মুক্তি লাভ হয়।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে প্রচলিত কর্মতত্ত্ব ও নতুন করে গড়ে ওঠা কর্মতত্ত্ব পরস্পর দুই পৃথক বলয়ে অবস্থান করছে। একটি বস্তুগত প্রকৃতিবিজ্ঞান আশ্রয়ী, অপরটি ভাবগত সম্পূর্ণত অলীক কল্পনাশ্রয়ী। আমরা নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট আকারে পৃথক করতে পারি।

নবম অধ্যায়
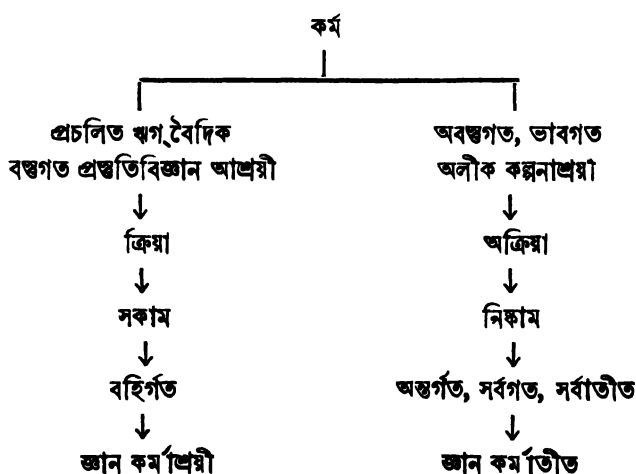
ধর্ম

ভারতবর্ষের চিন্তাপদ্ধতিতে ধর্ম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বেদ-উপনিষদ পরবর্তী বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ধর্ম ব্যাখ্যায় রত হয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে কোন কোন সম্প্রদায় ধর্ম জিজ্ঞাসা দিয়েই স্বীয় দর্শন শাস্ত্র শুরু করেছেন। অবশ্য তা করতে গিয়ে ধর্মের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যাকে নিষ্ঠার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। আর ভারতীয় দর্শনের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের তাই বিস্ময়ের অবধি নেই। কি করে একই শব্দের পরস্পব বিরোধী ব্যাখ্যা সম্ভব? কিন্তু এই বিস্ময়ের হেতু একটু আন্তরিক চেষ্টা করলেই উপলব্ধি করা যায়।

ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় যখন শাসক-শাসিতে, দ্বিজ-শূদ্রে বিভাগ হয় তখন উপরিকাঠামোয়ও অনিবার্য পরিবর্তন আসে। কারণ উভয় শ্রেণীই স্বশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট। যার ফলে সমাজ বিপরীতের দ্বন্দ্ববাহী ধারণার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সাধারণ লোকায়ত মানুষ এ সবের ধারই ধারে না। তারা প্রচলিত ধারায় গা ভাসিয়ে থাকতে অভ্যস্ত। ফলে কোথায় কি ঘটলো, কার কি হলো সেই নিয়ে তাদের খুব কমই মাথা ব্যথা। আর এইটাই শাসকশ্রেণীর কাছে সমস্যার। লোক সাধারণকে জয় করে আনতে এমন পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রচলিত মতবাদ মুখোমুখি বিরোধিতায় না আসে। আবার প্রচলিত মতবাদের কাছে নতি স্বীকার করার অর্থ শ্রেণী স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া। তাই শাসক সম্প্রদায় নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করল। সেই পদ্ধতি হল সাধারণে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বিভিন্নতাযুক্ত অর্থ সংযোজন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই কর্ম অকর্ম, ধম-অধর্ম দৃষ্ট-অদৃষ্ট প্রভৃতি প্রচলিত শব্দ ক্রমশই পরিবর্তিত হতে হতে শাসকশ্রেণী সংযোজিত অর্থই প্রাধান্য পেয়ে যায়। আর তা অনিবার্য কারণেই হয়েছে।

আদিতে ধর্ম শব্দ ধারক, অর্থাৎ যা ধরে রাখে এই অর্থে প্রচলিত ছিল। এক কথায় ধর্ম হল অস্তিত্বের ভিত্তি বা ধারক। প্রতিটি অস্তিত্বই তার ধর্মকে আশ্রয় করে স্থায়ী। এই ধর্মের লঙ্ঘন মানেই অস্তিত্বের সংকট। ফলে ধর্ম হলো অস্তিত্বের ধারা, জীবনের প্রণালী। সার্বিক অস্তিত্বের ধারক। সকল প্রকার অস্তিত্বই এই একান্ত সত্য, অন্তর্নিহিত ফল্গুস্রোতে সঞ্জীবিত। এই ধর্ম যে কোন

প্রকার সৃষ্টির চালিকাশক্তি। কর্মের প্রেরণার উৎস। ধর্মের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ কর্মের অর্থাৎ ক্রিয়ার। এক কথায় কি ধর্ম, কি কর্ম সকলই একই উৎস সম্ভূত। সেই উৎস হলো ব্যাবহারিক, বাস্তব, অস্তিত্বশীল জগৎ।

কিন্তু ধর্মের এই প্রচলিত অর্থ একসময় পরিবর্তিত হতে থাকল। নৈতিকতা যুক্ত হয়ে ধর্ম এখানে নতুন অর্থ গ্রহণ করে। ধর্মের এই গড়ে তোলা অর্থ অনুযায়ী ধর্ম মানে প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া অর্থাৎ অনুশীলন বা চর্চা। এই অনুশীলন বা চর্চা বলতে জোর দেওয়া হয়েছে মনন বা মানসিক অনুশীলনের। এই গড়ে তোলা অর্থ উপলব্ধি করতে পারব আমরা যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরি।[১] ত্রয়ঃ ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞঃ, অধ্যয়নম্ দানম্ ইতি প্রথমঃ। তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ অত্যন্তম্ আত্মানম্ আচার্যকুলে অবসাদয়ন্। এখানে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে ধর্ম তিন প্রকার। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান হল প্রথম, তপস্যা হল দ্বিতীয়, আর গুরুগৃহে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য পালন হল তৃতীয। এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ধর্মের এই প্রক্রিয়া-অর্থ কি বিশেষ দিককে সূচিত করছে। সাধারণত প্রক্রিয়া শব্দটি লৌকিক অর্থে দ্বৈত অর্থবাহী—শারীরিক ও মানসিক। শবীব সুস্থ সবল রাখতে হলে শারীরিক ব্যায়াম অপরিহার্য। তেমনই মানসিক সুস্থতার জন্য চর্চা বা মনন জরুরী। এখানে মনন বা মানসিক চর্চাকেই বিশেষভাবে জোব দেওয়া হয়েছে। আর কি কারণে কেন হয়েছে তা পরবর্তী আলোচনার সূত্রেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই উদ্ধৃতিতে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ক্রিয়াকে ধর্মের প্রথম অর্থ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু মুসকিলের ব্যাপার হলো এই তিন প্রকার প্রক্রিয়াতেই ক্রিয়া অর্থ প্রকট। আর ক্রিয়া স্বীকার করলে তো চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা এসে টুঁটি টিপে ধরবে। এই প্রতিবন্ধকতা নিরসন করার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে তপস্যার নিদান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'তপঃ' শব্দ নিয়েও সমস্যা। কেননা তপঃ শব্দ ব্যক্তিগত দিক থেকে তেজ বোঝায় যা সৃষ্টির আদি অবস্থা বলে প্রাচীন বৈদিক যুগে চিহ্নিত হতো। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে চিন্তানায়কগণ সে সম্পর্কেও সতর্ক ছিলেন। তাই তপস্যা বলতে ধ্যান নিদিধ্যাসন, আত্ম কৃচ্ছ্রসাধনকেই সূচীমুখ করে তোলা হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি শব্দকে যা ব্যবহারিক জগতের শক্তিরূপে চিহ্নিত ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে, ধৈর্য, আত্মকৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ, তিতিক্ষা ইত্যাদি অর্থে বোঝানো হয়েছে। ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা মুক্ত

কৃচ্ছ্রসাধনই আত্মার বিকাশমুখীনতাকে জাগানোর উপায়। তাই 'তপস্যা'র মাধ্যমে দৃষ্ট ব্যাবহারিক জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টায় সফল হন উপনিষদ চিন্তানায়কগণ। তাঁদের আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় ধ্যান, নিদিধ্যাসন, আত্মকৃচ্ছ্রসাধন হয়ে ওঠে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমন কি অধ্যয়ন শব্দটিও লৌকিক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অধ্যয়ন হলো জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ। ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে দৃঢ় হয়। এক কথায় অধ্যয়ন ব্যক্তিকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলে। অধ্যয়নের এই অর্থ আজো সমাজে এইভাবে প্রচলিত।

কিন্তু উপনিষদে অধ্যয়ন বলতে গুরুর নিকটে বসে গোপনে যে জ্ঞান আহরণ তাকেই বোঝানো হয়েছে। এই জ্ঞান গুপ্ত, কেননা ব্যক্তিগত, একান্তই ব্যক্তিগত। গুরুগৃহে শরীর ক্ষয় পূর্বক ব্রহ্মচর্যকাল সমাপনান্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এই জ্ঞান একান্তই নিজস্ব, গোপন, অপ্রকাশ্য। ফলে অধ্যয়নের নতুন অর্থ এখানে ব্যাখ্যাত। 'দান' এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দান বলতে বোঝায় পরার্থে কোন কিছু উৎসর্গ করা। ফলে দানের প্রচলিত অর্থ হলো উৎসর্গ। কিন্তু উৎসর্গ শব্দটি বলতে নিজের কোনকিছুকে উৎসর্গ বোঝাচ্ছে। কিন্তু উপনিষদে দান বলতে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। সত্য উপলব্ধির জন্য নিজের সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গ করা।

একথার অর্থ ব্যক্তির লৌকিক সত্তার অবদমন ঘটিয়ে অতিলৌকিক সত্তার জাগরণ ঘটানো। নিজেকে সেইভাবে রূপান্তরিত করা। আর এই রূপান্তরিত উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিই কেবল অন্তর্যামী অক্ষর ব্রহ্মকে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে। ফলে ধর্মের অর্থ বোঝাতে উপনিষদ চিন্তাবিদগণ ক্রমশই ক্রিয়া অর্থের অবদমন ঘটিয়ে অক্রিয়া অর্থকেই তুলে ধরার সর্বাত্মক প্রয়াস করলেন। কিন্তু তাই বলে ধর্মের লৌকিক অর্থকে কোনভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নি। আর তা যে করা যায় নি তার উদাহরণ আমরা সেই উপনিষদগুলি থেকেই উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে দেখাতে পারি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একাদশ অনুবাক্যে লৌকিক বিধিকে ধর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মূল কথা হলো প্রতিটি মানুষেরই লৌকিক বিধি অনুসরণ করে চলা উচিত। কি সেই লৌকিক বিধি? বেদ-অধ্যয়ন শেষে আচার্য শিষ্যকে সর্বশেষ বেদার্থ বোঝাতে গিয়ে বলছেন[২] সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনম্ আহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্, ধর্মাৎ ন প্রমদিতব্যম। কুশলাৎ ন

প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। সত্য কথা বলো। ধর্মের আচরণ করো। বেদ পাঠে বিরত থেকো না। আচার্যের জন্য অভীষ্ট সম্পদ উপায় করে তা দক্ষিণা হিসেবে দিও। সংসারী হয়ে প্রজন্ম ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রেখো। সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ো না। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ো না। আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হয়ো। উন্নতিলাভের জন্য মঙ্গলজনক কাজে বিরত থেকো না। এই যে উপদেশ, তার সবটাই লৌকিক বিধি নিয়ম সংক্রান্ত। সত্যকথা বলা সত্যপথে চলা এ হলো লোকায়ত বিধি। ধর্মের আচরণ বলতে তাইই বোঝায়। এখানে ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সকল প্রকার কর্মকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট সম্পদ আহরণ বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রাচীনকালে আচার্যগণ বিদ্যাদানের নিমিত্ত কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। বিদ্যা বিক্রয় নিন্দনীয়। তাই বিদ্যাদানের পরিবর্তে কোন অর্থ গ্রহণ করাকে নিন্দাজনক মনে করতেন। তবে শিক্ষার শেষে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আচার্য্যের প্রিয় সম্পদ দান করবার প্রথা ছিল। তার জন্য অনুশাসনও ছিল। গুরুদক্ষিণা ঠিকমত না দিলে অধীত বিদ্যা ফলবতী হতো না। শিক্ষান্তে সংসারধর্ম পালন করে সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। আত্মরক্ষা ভূত বিষয়ে অর্থাৎ সম্পদ ও মহত্ব লাভের অনুকূল কাজ করো। এই সকলই হলো সত্যের পথ, ধর্মের পথ।

তাহলে তৈত্তিরীয় উপনিষদে ধর্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে স্পষ্টতই জাগতিক বিষয় সমূহ সম্পর্কে সতর্ক আচরণকেই ধর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমন কি স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে[৩] এষা বেদোপনিষদ। এইই হল বেদোপনিষদ। ধর্ম এখানে কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। ধর্মই আচরণ। কোন ধরণের আচরণ? যে আচরণ হল অনিন্দিত। সমাজে নিন্দিত কাজ কখনোই করা উচিত নয়। এককথায় সৎ আচরণ। সৎকর্মই প্রতিপালনীয়। অসৎ আচরণ অসৎ কর্ম সর্বৈব বর্জনীয়। এইভাবে উপনিষদে লৌকিক আচার আচরণ প্রতিপালনীয় ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত। লৌকিক আচরণগুলি ও নির্দেশ করে দেওয়া আছে। সংসারই হল এই ধর্মচর্চার ক্ষেত্র। সংসারী হয়ে জীব ধর্ম প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে হিতকর কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করা। বৈদিক যুগে এ সমস্ত কিছুকেই একটি মাত্র শব্দে বোঝানো হত। তা হলো 'ঋত'। ঋত হল সার্বিক নিয়মশৃঙ্খলা। ঋতই ধর্ম কিন্তু ধর্ম মাত্রেই ঋত নয়। ঋত ধর্ম অতিরিক্ত কোন কিছু। ঋত ও ধর্মে প্রভেদ বর্তমান। ঋত হল নীতি নিয়ম আর ধর্ম হলো চর্চা বা আচরণ। ঋত হলো নিয়ম আর ধর্ম হলো সেই নিয়ম প্রতিপালন। অতএব ধর্ম হলো কোন

ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি যা ব্যক্তি বা বস্তুকে অব্যাহত থাকতে সাহায্য করে। এইভাবে উপনিষদ সাহিত্যে ধর্মের লৌকিক অর্থই নানাভাবে প্রতিপাদিত। ধর্মের এই প্রচলিত অর্থ লঙ্ঘিত হলে কোন কিছুর অস্তিত্বই অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উপনিষদ যুগেই ধর্মের এই প্রচলিত অর্থের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আরোপিত অর্থে প্রচারিত করার নজিরও এই উপনিষদেই বর্তমান। এই আরোপিত অর্থে ধর্ম বস্তু অন্তর্নিহিত কোন শক্তিকেই চিহ্নিত না করে দেখানো হয়েছে যে ধর্মের কোন অস্তিত্বই কোনকালে ছিল না। প্রজাপতি সৃষ্টি সুরক্ষার প্রয়োজনেই একসময় ধর্মকে সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কখন, কিভাবে, কি অবস্থায় এই ধর্ম সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা সুন্দরভাবে উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে ধর্ম সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। [৪] তৎ শ্রেয়োরূপম্ অত্যসৃজত ধর্মম্। তৎ এতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্, যৎ ধর্মঃ। তস্মাৎ ধর্মাৎ পরম্ ন অস্তি। অথ অবলীয়ান বলীয়াংসম্ আশংসতে ধর্মেণ—যথা রাজ্ঞা এবম্। যঃ বৈ সঃ ধর্মঃ। সত্যম্ বৈ তৎ । ভগবান প্রজাপতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি করে ও সকল কাজে সমর্থ না হয়ে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ স্বরূপ ধর্মকে সৃষ্টি করলেন। এই ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ও ক্ষত্রিয, বলশালী অপেক্ষাও বলশালী। এই ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন কিছু নেই। রাজার সাহায্যে যেমন বলবান লোককেও শাসন করা যায় তেমনই ধর্মেব সহায়তায় বলহীন লোক ও বলবান লোককে শাসন করতে পারে। এই ধর্মই সত্য। যে সত্য বলে সে ধর্ম আচরণই করে। ধর্ম হলো এমন নীতি নিয়ম যার অধীন যেমন রাজা, তেমনই প্রজাও। তবে ধর্মকে কেবল নীতি নিয়ম বললেও ভুল করা হবে, ধর্ম তারও অধিক। এখানে ধর্ম মানে মুক্তিও। আবার ধর্ম মানে কেবল মুক্তি নয়, পরিপূর্ণ মুক্তি। জীবনের বন্ধন থেকে চূড়ান্ত মুক্তি। ফলে ধর্মকে মানলে নিজেকেই জানা হয়। আর নিজেকে জানার অর্থ চূড়ান্ত সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। এই সাক্ষাৎ উপলব্ধিই হলো মোক্ষ। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই অর্থে বিষদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে [৫] ত্রয়ঃ ধর্মস্কন্ধাঃ। জপ, তপ, অধ্যয়ন, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদিকেই ধর্মমার্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধর্মই কেবল মনের স্বচ্ছতা এনে দেয়। বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এই মনের স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসই যোগীর অনুসন্ধিৎসার ভিত্তিভূমি। এই দৃঢ় ভিত্তিই সত্য উপলব্ধির শক্তি যোগায়। এইভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই অমৃতত্ব লাভ করে। এই চূড়ান্ত উপলব্ধিই ধর্ম। এই ধর্মই সত্য,

সত্যই ধর্ম। এই সত্য ও ধর্মের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকায় উভয়ে এক। ধর্মই কেবল নিম্ন প্রকৃতির থেকে উর্দ্ধলোকের দিকে মুমুক্ষুকে পরিচালিত করে। এই উর্দ্ধলোক বলতে অতীন্দ্রিয় লোককেই বোঝানো হয়েছে। এই ধর্ম কোন লৌকিক সত্তা নয়, অতিলৌকিক সত্তা।

এই ধর্মের লক্ষণ হল নিম্ন প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া। এই নিম্ন প্রকৃতি বলতে লৌকিক জগতের কর্মকাণ্ডকেই বোঝানো হয়েছে। আর এই নিম্ন প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানে অধর্মে পতিত হওয়া। অধর্মে পতিত হওয়া মানে সংসারগতিতে আবদ্ধ হওয়া। লোক ব্যবহারের জীবনের মধ্যে চিরকাল আটকে থাকা। ব্রহ্মলোক প্রভৃতি তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। অধর্ম তাড়িত মানুষ কেবল লৌকিক ক্রিয়া কর্মকেই একমাত্র আরাধ্য বলেই বিবেচনা করে। লোকহিতকর কাজকেই মনে করে একমাত্র পুণ্য কাজ। অশন-বসন-বিহারই অধর্ম আচ্ছন্ন মানুষের মুখ্য কথা। ইহলোকই তাদের কাছে সর্বস্ব। পরলোকের কথা তাদের কাছে অমৃত। এই অধর্ম আচরণ সর্বৈব পরিত্যজ্য। ধর্মাচরণই মানুষের একমাত্র মুখ্য কর্ম হওয়া উচিত।

এতক্ষণ আমরা যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাখ্যাত ধর্মের যে পরিচয় পেলাম এবং অধর্মের যে ব্যাখ্যা পেলাম পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে কালের রূপান্তরে কিভাবে ধর্মের রূপান্তর সাধিত হয়েছে। প্রচলিত ধর্ম যা সর্ব অর্থে লৌকিক হিসেবে পরিচালিত তাই ব্যাখ্যাত হল অধর্ম হিসেবে। আর অতিলৌকিক অতীন্দ্রিয় আরোপিত অর্থই হয়ে দাঁড়াল ধর্মের মূলকথা। কারণ আর্থসামাজিক কাঠামোয় শাসক সম্প্রদায়ই আরোপিত অর্থকে নানাভাবে সমাজে প্রচলিত করার চেষ্টা করতে থাকে। নানাভাবে বলতে বোঝাচ্ছে যে শাসনে অনুশাসনে কর্তৃপক্ষ মানুষের মাঝে ধর্মের আরোপিত অর্থকেই প্রচার করতে থাকলেন। আজও সেই একই শ্রেণী শাসনক্ষমতায় বর্তমান। বলা বাহুল্য যে সমাজে আজও ধর্মের অতিলৌকিক অর্থ লৌকিক অর্থকে ছাপিয়ে দৃঢ় ভিত্তি করে নিয়েছে। কিন্তু বিপরীতে এ কথাটাও আজ রূঢ় সত্য এত শাসনে-অনুশাসনেও ধর্মের লৌকিক অর্থের সমাজ থেকে একবারে অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব হয় নি। তাই ধর্মের ক্ষেত্রেও মত সংঘর্ষ বিপরীতের দ্বন্দ্ব হয়ে উপনিষদে ঠাঁই করে নিয়েছে।

কিন্তু যেভাবে ধর্মের এই আরোপিত অর্থের প্রচলন করা হয়েছে তা অতীব চিত্তাকর্ষক। ধর্মকে সৃষ্টি করতে প্রজাপতি কেন বাধ্য হলেন সেই প্রসঙ্গে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে উপাখ্যান তুলে ধরেছেন তা উল্লেখ করবার

মত। প্রজাপতি একের পর এক যখন শ্রেণী সৃষ্টি করতে থাকলেন তখন পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। তাঁর প্রিয়পাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজ শ্রেণী সৃষ্টি করে দেখলেন যে তাদের অবসর বিনোদনের জন্য সেবাকারী দাসানুদাস সমাজ চাই। তাই সৃষ্টি করলেন শূদ্র শ্রেণী। যাদের মূল কাজ হলো দ্বিজ শ্রেণীর সেবা শুশ্রূষা করা। দ্বিজ শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট অন্নে প্রতিপালিত হয়ে নিরুত্তর থেকে নিরন্তর পরিচর্যা করাই শূদ্র শ্রেণীর একমাত্র কাজ। কিন্তু তারপরও সমস্যা দেখা দিল। শূদ্র শ্রেণী সবসময় মুখ বুজে সহ্য করতে চাইতো না। দ্বিজ শ্রেণী সংখ্যায় শূদ্র শ্রেণীর থেকে কম। তাদের ক্ষোভ বিক্ষোভ কর্তৃপক্ষের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। যে ক্ষমতা সমাজকে শাসন ও প্রতিপালন করছে সেই ক্ষমতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রবল বাধাস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। দ্বিজশ্রেণী সৈন্য সামন্ত দিয়ে শাসন করলেও গরিষ্ঠ শূদ্র সমাজ শাসিত শ্রেণী যদি এককাট্টা হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তো দ্বিজ শ্রেণীর পক্ষে কোন মতেই এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তাই প্রজাপতি ঠিক করলেন শাসনের পাশাপাশি অনুশাসন প্রয়োজন। এই অনুশাসন হল নৈতিক নিয়মবিধি। এই অনুশাসনই ধর্ম। তাই প্রজাপতি দ্বিজ ও শূদ্র শ্রেণী অতিরিক্ত ধর্ম সৃষ্টি করলেন। এই ধর্মের অর্থ কি? এককথায় অনুশাসন প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে আমরা দেখি বিশাল অনুশাসন প্রক্রিয়া সম্বলিত ধর্মশাস্ত্র। কর্ম ও চিন্তার সমন্বয় হলো এই ধর্ম। এই ধর্মের ভূমিকা কি? পরিষ্কার ভাবে বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে—অথ অবলীয়ান বলীয়াংসম্ আশংসতে ধর্মেণ। এই ধর্মের সাহায্যে বলহীনও বলবানকে শাসন করে থাকে। সৈন্যসামন্তসর্বস্ব দ্বিজশ্রেণী আপাত বলীয়ান হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রশ্রেণীর তুলনায় ন্যূন। বিদ্রোহে এককাট্টা হলে কতিপয় সৈন্যসামন্ত কোথায় উড়ে যাবে। ফলে প্রচলিত অর্থকে নস্যাৎ করে ধর্মকে আরোপিত অর্থে প্রচার করা শাসকশ্রেণীর কতখানি প্রয়োজন ছিল তা পাঠকমাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। প্রচলিত ধর্মকে আঁকড়ে থাকা মানে অধর্মের কবলে পড়া। নিম্ন প্রকৃতির দাসানুদাস হওয়া। এইভাবে উপনিষদে ধর্ম ও অধর্মের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত তা আসলে বিপরীতের দ্বন্দ্বই। প্রচলিত ধর্ম যা ঋকবৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে তা একদিকে যেমন বস্তুগত তেমনই আর এক দিকে আরোপিত কর্তৃপক্ষ প্রচারিত ধর্ম, অতীন্দ্রিয়, অবস্তুগত, ভাবগত। প্রচলিত ধর্ম লৌকিক, আরোপিত ধর্ম অতিলৌকিক।

এইভাবে ইতিহাসের গতিপথে ধর্ম দ্বৈত অর্থ নিয়েই সমাজে আজও প্রচলিত।

তবে যেহেতু সমাজ কর্তৃগত, আজও পর্যন্ত উচ্চবর্ণ শাসিত তাই কর্তৃপক্ষ প্রচারিত ধর্মই বস্তুগত ধর্মকে কোণঠাসা করতে করতে প্রাচীরের দেওয়ালে লেপ্টে রেখেছে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা ঘুরছে। উপেক্ষিত, অবহেলিত শূদ্র সমাজ জাগছে। কোথাও কোথাও সমাজ শাসন করায়ত্ব ও করেছে ইতিমধ্যে। ফলে সংস্কৃতি জগতেও চাকা ঘুরছে ধর্মের বস্তুগত দিকে বেশী বেশী করে। বহুল আলোচিত হতে শুরু করছে। বর্তমান গ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দশম অধ্যায়

বাস্তবতার প্রতিপাদন সমস্যা

বাস্তবতার প্রতিপাদন সমস্যা সেই সুদূর অতীত থেকেই শুরু হয়েছে। সকলেরই সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা যে বাস্তব পৃথিবী আমরা দেখি তা কি সত্যি বাস্তব? এই প্রশ্ন বৈদিক যুগে চিন্তানায়কদেরও সমানভাবে ভাবিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের যুগের পরিস্থিতি, পরিবেশ ও সচেতনতা অনুযায়ী প্রশ্ন তুলেছিলেন এই বাস্তব জগতের মূল সূত্র কি। এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর অন্তরালে সে কোন চালিকাশক্তি যে চলমান রেখেছে এই জগৎ প্রবাহ? প্রথম পর্যায়ে এই বিস্ময় জিজ্ঞাসা থেকে রচিত হয়েছে কত উদাত্ত সংগীত। সূর্যকে বলা হয়েছে 'বিশ্বতশ্চক্ষু', তিমির বিনাশী জবাকুসুম সঙ্কাশ। কালিমা বিনাশী দিবাকর। অন্ন কামনা, ফসল কামনা, সন্তান কামনা ইত্যাদি সকল প্রকার কামনাই নিবেদিত হয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, মেঘ ও অন্তরীক্ষকে। পৃথিবীতে জীবনগতিকে নিরীক্ষণ করে রচিত হয়েছে পুরুষ-প্রকৃতি বন্দনা। এই জীবন সত্যি, এই জগৎ সত্যি, সংসার গতি সত্যি, তাদের মহিমামণ্ডিত করে রচিত হয়েছে সুললিত ছন্দ গীতি। কিন্তু কালক্রমে তেমনটি থাকল না। মুক্ত প্রকৃতির জীবন থেকে মানুষ যখন ইতিহাস চেতনায় প্রবেশ করল তখন মুক্ত চিন্তার পাশাপাশি ব্যষ্টি চিন্তার উন্মেষ দেখা দিল। চিন্তাজগত দ্বিখণ্ডিত হল। বাস্তবতার প্রতিপাদন সমস্যা ক্রমশই কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। আর তা সূচীমুখ পেল পরস্পর বিরোধী মত সংঘর্ষে। উপনিষদ যুগে আমরা দেখি চিন্তানায়কগণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাস্তবতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে।

এই পরস্পর বিরোধী মত বলতে আমরা পাই একটি দেব-মত অপরটি অসুর মত। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদেই দেখেছি যে প্রজাপতির দুই পুত্র দেবতা ও দানব, সুর ও অসুর। দেবতা কনিষ্ঠ, দানব গরিষ্ঠ। বুঝতে অসুবিধে নেই দেবতা বোঝাতে এখানে মুষ্টিমেয় কর্তৃত্বকারী পক্ষকে বোঝানো হয়েছে। আর কর্তৃত্বহীন অধিকাংশকে বোঝানো হয়েছে দানব বা অসুর হিসেবে। শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে চিন্তানায়কদের অবজ্ঞা ও উৎসাহ কার প্রতি কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখন এই পরস্পর বিরোধী মত প্রতিপাদন করতে গিয়ে আমরা প্রথমে দেব-মত ও পরে দানব-মত আলোচনা করব।

উপনিষদ জুড়ে দেব-মতেরই সর্বাঙ্গীন প্রকাশকে নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে বেশ যত্ন সহকারে। আর দেব-মতকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে গিয়ে কখনো কখনো তুলনা হিসেবে অসুর মত এসে পড়েছে। তাই অসুর মত অতীব সংক্ষিপ্ত নামমাত্র উল্লেখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেবমত সেখানে নানান শাখা-পল্লবে পল্লবিত হয়ে অধিকার বিস্তৃতির চেষ্টা করেছে। দেবমতের সার কথা হল— ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এই জগতের যা কিছু চলমান সকলই অনিত্য, সকলই পরমেশ্বর আচ্ছাদিত। জগৎ কথার অর্থই গতিশীল, অস্থির, সর্বদাই চলমান, পরিবর্তনশীল। এই জগতের সকল কিছুই চলমান হলেও এই চলমান জগৎ এক অচল সত্তারই অভিব্যক্তি। সেই অচল সত্তা হলেন পরমেশ্বর। এই অচল সত্তার আশ্রয় ব্যতিরেকে জগতের চঞ্চল প্রবাহ সম্ভব হতো না। এইভাবে পরমেশ্বর জগতের সকল বস্তুকে ধারণ করে আছেন। প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত অন্তর্বাসী হিসেবে পরমেশ্বর বিরাজ করছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে পরমেশ্বর সকল বস্তুর অন্তরে বাস করে সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছেন। তিনি বিশ্ব জগতের সকল কিছুর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। সর্বভূতে ঈশ্বর বর্তমান এই উপলব্ধি যার ঘটে তিনিই মুক্ত পুরুষ। তাঁর কাছে সমগ্র জগৎ স্বরূপত ব্রহ্ম। তিনি অবিদ্যাপ্রসূত সকল প্রকার শোক তাপ-মোহ ইত্যাদি সংসার ধর্ম থেকে মুক্ত। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবে তিনি বিভোর হন। আর সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করে 'বসুধৈবকুটুম্বকম্' দ্বারা সকলকে ভালোবাসতে শেখেন। এখানে ঈশ অর্থে ঈশ্বর, মঙ্গল, প্রভু ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। বাস্যম্ অর্থে আবরণ, পরিধেয় বাসযোগ্য বোঝানো হয়েছে। এই বিশ্ব ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের আচ্ছাদিত, ব্রহ্মের পরিচ্ছদ অর্থাৎ জগতের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ। আর বাসযোগ্য অর্থে সকলের অন্তরে বাস করেন। বিশ্বরূপ গৃহে তাঁর অবস্থান। প্রথম অর্থে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের মধ্যেই অনুস্যূত আছেন। প্রথম অর্থ অনুযায়ী এই জগৎ অর্থাৎ ইহলোক মিথ্যা, প্রবঞ্চনাময়। এই জগতের বাইরে যে অতীন্দ্রিয় লোক, যা পরলোক হিসেবে খ্যাত তাই একমাত্র সত্য। ইহলোক ভ্রান্ত পরলোক অভ্রান্ত চূড়ান্ত সত্য। ইহলোক সম্পর্কিত জ্ঞান অবিদ্যা আর পরলোক সম্পর্কিত জ্ঞান বিদ্যা। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন অজ্ঞানী লোকসকল নিজেকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলে অভিমান প্রকাশ করে। অন্ধ পরিচালিত অপর অন্ধের মতো নানা কুটিল পথে ঘুরে বেড়ায়, কখনোই লক্ষ্যে বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারে না।

১ এখানে কঠ উপনিষদ থেকে উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেন এব নীয়মানাঃ যথা অন্ধাঃ। এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হচ্ছে এক অন্ধ আর অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হলে যেমন প্রকৃত পথ হারিয়ে ফেলে এদিকে ওদিক ঘুরে বেড়ায় কখনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারে না সেইরূপ এই সংসারের অজ্ঞানী অবিদ্যপ্রভাবিত লোকেরা অপর অজ্ঞানী দ্বারা পরিচালিত হয়ে কেবল বিপথে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বিদ্যা প্রভাবিত জ্ঞানী লোক সকলের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা কথনোই ঘটে না। তাঁরা শ্রেয়কে শ্রেয়, আর প্রেয়কে প্রেয় বলে জানেন। কারো দ্বারা প্রভাবিত হন না। আপন জ্যোতির্লোকের আলোয় পথ চলেন ও গন্তব্যস্থলে সহজেই পৌঁছোন। তাঁদের কাছে প্রতিভাত এই জগৎ মায়া, মিথ্যা, অবিদ্যাপ্রসূত। ব্রহ্মই সত্য, পরমেশ্বরই গতি, স্থিতি ও লয়। অতএব ব্রহ্মই আরাধ্য, পরমেশ্বরই অমৃতময়, আনন্দময়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি দেব-মত যত বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত অসুর-মত সেখানে কোনরকমভাবে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত। কিন্তু যত সংক্ষিপ্ত পরিসরই হোকই না কেন মতবাদের ঋজুতা বক্তব্য বিষয় উপলব্ধি করাতে সক্ষম। এই বাস্তব [২] বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি কি? এই প্রশ্নে অত্যন্ত স্পষ্ট ঘোষণা হল—ইদম্ মহৎ ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্ বিজ্ঞানঘনঃ এব এতেভ্য: ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি। বৈচিত্র্যময় এই জগতের বস্তুরাজি মহাভূত উদ্ভূত। এই মহাভূত অনন্ত অপার। এমন কি বিজ্ঞানময় বস্তুরাজি ও মহাভূত উদ্ভূত। কেননা বিজ্ঞান বা চেতনা মহাভূত উদ্ভূত উপবস্তু। শরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়। তাই শরীর ক্ষয়ে বিজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুতেই চেতনার শেষ। যতক্ষণ শরীর অক্ষয় থাকে ততক্ষণই চেতনা থাকে। এই স্পষ্ট উক্তি প্রমাণ করছে মহাভূতই সৃষ্টির আদি উৎস। বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তর্নিহিত সত্তা। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় এই পঞ্চমহাভূত কি? মৈত্রী উপনিষদে তারও স্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান [৩] অথ পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দে নোচ্যন্তে। মহাভূত অনন্ত অপার হলেও পাঁচভাগে তাকে বিভক্ত করা যায়। সেই পঞ্চ-মহাভূত হল মাটি, জল, বাতাস, আগুন ও আকাশ। এই পঞ্চমহাভূতই এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উৎস।

অসুর মত বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচন করেই থেকে থাকেনি। স্পষ্ট ভাষায় একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে এই যে,

বৈচিত্র্যময় দৃশ্যমান জগৎ তাই একমাত্র সত্য। আমরা আমাদের চারপাশের যে সব বস্তুরাজিকে যেমনভাবে দেখছি ঠিক তেমন করেই দৃষ্টির বাহিরে রয়েছে। তারা যে দৃষ্টির বাহিরে বহির্জগতে সত্যরূপে বর্তমান তার পরিচয় পাই আমরা লৌকিক ব্যবহারে। দৃশ্যগোচর বস্তুরাজির তো আমরা খালিচোখে অস্তিত্ব উপলব্ধি করিই এমনকি আপাত অদৃশ্য বস্তুরাজিও লোক ব্যবহারের মাধ্যমে সত্য বলে উপলব্ধি করি। তারও বেশ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ এই উপনিষদগুলোতেই রয়েছে। [৪] সঃ যথা সৈন্ধবখিল্যঃ উদকে প্রাস্তঃ উদকম্ এব অনু বিলীয়তে, ন হ অস্য উৎগ্রহণায় ইব স্যাৎ। যতঃ যতঃ তু আদদীত লবনম্ এব এবম্। এক টুকরো লবণ জলে ফেললে তা সঙ্গে সঙ্গেই জলে বিলীন হয়। আর লবণের টুকরোটিকে কোনমতে জল থেকে তুলে নেওয়া যায় না। কিন্তু ওই পাত্রের অবস্থিত জলের যে কোন জায়গা থেকেই জল নিয়ে মুখে দেওয়া যাক না কেন তার লবনাক্ত স্বাদই পাওয়া যায়। অতএব এই লবনাক্ত জলের স্বাদে প্রমাণিত যে লবন এখানে বিদ্যমান। অথচ খালি চোখে আমরা এই লবন দেখতে পাই না। কিন্তু দেখতে না পেলে কি হবে লোক ব্যবহারে জানতে পারছি যে তার অস্তিত্ব বর্তমান এবং মূর্তিমান সত্যরূপে অবস্থান করছে। তেমনি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমও অনুরূপভাবে অস্তিত্বশীল, তা যে কোনভাবেই থাকুক, দৃষ্টিগোচর অবস্থায়, কি অদৃশ্য অবস্থায়। এইভাবে অসুর-মত আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করছে যে এই দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ ইহলোকই একমাত্র সত্য। এই জগতের বাহিরে অন্যকোন জগৎ নেই। কঠ উপনিষদে উল্লেখ আছে[৫] অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী। ইহলোকই আছে, পরলোক বলে কোনকিছু নেই। এই নিত্য পরিবর্তনশীল চলমান বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতই ইহলোক। এই ইহলোকই সত্য। ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বাহিরে অতীন্দ্রিয় পরলোক বলে কিছু নেই। কখনো থাকতে পারে না। এই পরলোক প্রতিপাদন নিতান্তই অলীক ও মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত। এক শ্রেণীর মানুষ স্বার্থরক্ষার তাগিদে এই পরলোক আবিষ্কার করেছে। দৃষ্টি বা উপলব্ধির বাইরে অতীন্দ্রিয়লোক কি করে সত্য বা ধ্রুব হতে পারে? বরং যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর, ব্যাবহারিক পরীক্ষিত সত্য তাই ইহলোক। এই ইন্দ্রিয়গোচর ইহলোকের বাহিরে কোন কিছুর অবস্থান কল্পনা করার অর্থ মানুষকে প্রবঞ্চনা করা। মিথ্যা স্তোকের আড়ালে বিপথে পরিচালিত করা। ধ্যান লোক, নিদিধ্যাসন মার্গ ইত্যাদির প্রহেলিকা তৈরী করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। বিষয় জগত থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে আনার অপকৌশল হলো এই পরলোক তত্ত্ব, অধ্যাত্ম সাধনা;

অমৃত লোক, আনন্দলোকের নিদান। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জগতের সকল বস্তুরাজিকে সফল ব্যবহারের দ্বারা সত্য বলে জানে। তারা জগতের বস্তুরাজিকে দৃষ্টিদ্বারা প্রত্যক্ষ করে, শব্দ দ্বারা শোনে, ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ অনুভব করে, রসনায় স্বাদ অনুভব করে, ঘ্রাণে গন্ধ অনুভব করে। অতএব তাদের কাছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরীক্ষিত জগৎ সত্য।

এখন প্রশ্ন এই জগতের সত্যতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। কিন্তু অপার অনন্ত মহাবিশ্বের অধিকাংশ দৃষ্টিলোকের বাইরে। তাকে কি করে ব্যাবহারিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে জানা যাবে। এই অসীম অনন্ত মহাকাশ তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে? তাই বা কি করে জানা যাবে? এই সব প্রশ্ন সেই যুগেও বস্তুবাদী চিন্তার নায়কদের পীড়িত করত। কিন্তু, সে যুগে তো আজকের মত বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি ঘটে নি। তাই সেই যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির নিরিখে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তৎকালীন চিন্তানায়কগণ। সেই যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলতে কুটীর শিল্পের বিকাশ। তাই ঋষি উদ্দালক কুটীর শিল্পের উৎপাদিত বস্তুরাজির উদাহরণ তুলে ধরে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে বিষয়টিকে বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন। ঘট, লোহার বস্তু ও স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদির উদাহরণ তুলে ধরে উদ্দালক বলেছেন[৬] যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। মৃত্তিকা নির্মিত বস্তু হলো ঘট। যেমন মৃৎপাত্র ঘট জানলেই জানা যায় যে তা মৃত্তিকা নির্মিত। আর মৃৎপিণ্ড জানলেই যেমন মৃত্তিকা নির্মিত ভিন্ন ভিন্ন সকল বস্তুকেই জানা যায়। ভিন্ন ভিন্ন নামে হলেও সকলেই কিন্তু মৃৎপাত্র। বাক্যে প্রকাশিত কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম। আসলে সকলেই মৃন্ময় বস্তু। একটিকে অপরটির থেকে শুধু সফল ব্যবহারের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘট, পট, সরা ইত্যাদি প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন কার্য সহায়ক বলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিহ্নিত। সবই মৃত্তিকা নির্মিত, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য। তেমনই এই মহাবিশ্ব যা আপাতত সফল ব্যবহারের বাহিরে বর্তমান তাও যে মহাভূত সম্ভূত তা মহাবিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুরাজির যে কোনটিকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করা সম্ভব। এই মহাবিশ্বের অন্তরালে তাই আদিসূত্র হিসেবে মহাভূতই সত্য। এই মহাভূত পূর্বেই উল্লেখ করেছি পঞ্চবিধ। এইভাবে সফল ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অসীম অনন্ত অপার মহাবিশ্বের সম্পর্কেও উপলব্ধি সম্ভব। এই মহাবিশ্বের যে কোন কিছুই এই পঞ্চ মহাভূত সম্ভূত। এই জগৎই একমাত্র

সত্য। তাই পরলোক মিথ্যা। অতীন্দ্রিয় লোকের প্রচার হলো কিছু স্বার্থপর মানুষের নিছকই বিলাস কল্পনা। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো। ওদের সামনে একটা বিভ্রান্তির জগৎ তৈরী করা। শুধু পরলোকের অনাবিল সুখের কথা ভেবে ইহলোকের দুঃখ কষ্টকে ভুলে থাকা। ইহলোকের যন্ত্রণা যাতে ক্ষোভ বিক্ষোভ বিদ্রোহে রূপান্তরিত না হয় তারই প্রাণান্তকর প্রয়াসই হলো এই পরলোক কল্পনা ও তার প্রচার।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যা জানা গেল তাতে বাস্তবতা প্রতিপাদন সমস্যা যতখানি না দেব-মতের, ততখানি অসুর মতের নয়। দেব-মতের পক্ষে দুটি বিশেষ ধরণের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। প্রথমত এই দৃশ্যমান জগতকে মিথ্যা প্রমাণ করা দ্বিতীয়ত অতীন্দ্রিয়লোক অর্থাৎ পরলোকের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু অসুর মতের এ সবের কোন প্রয়োজনই নেই। কেন না তারা সাধারণের অভিজ্ঞতার দৃশ্যমান জগতকেই সত্য রূপে দৃঢ় ধারণা পোষণ করে। শুধু তাই নয় তার তত্ত্বগত বিশ্লেষণও সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করে। তাদের যেমন সাধারণের অভিজ্ঞতার জগতের মিথ্যা প্রমাণ করার সমস্যা নেই তেমনই বাস্তবতার প্রতিপাদন সমস্যাও কোনভাবে পীড়িত করে না। ফলে দেব-মতের প্রবক্তাদের দেখা যায় উভয় প্রকার সমস্যাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।

দেব-মতের মূল কথা হলো ব্রহ্ম বা ব্রহ্মলোকই একমাত্র সত্য। এই ব্রহ্মলোকই পরলোক। এই ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা। এই ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নেই। সকলই মিথ্যা। কঠ উপনিষদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে[৭] নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এখানে কোন নানা নেই। কোন বহুত্ব নেই। এই আপাত বৈচিত্র ও বহুত্ব মিথ্যা। মায়া বা ভান মাত্র। এই সকলই ঈশ্বর আচ্ছাদিত। তাই বলা হয়েছে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। এখন উৎসাহী পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে এই জগৎ সৃষ্টি সত্য, ব্রহ্ম-ইচ্ছা থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি। কিন্তু ব্রহ্ম নিজে সৃষ্টি করেন নি মায়া ও ঈশ্বরের সাহায্যেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যেভাবেই হোক এই জগৎ যদি সৃষ্ট হয়! আর জগৎ সৃষ্টি যদি সত্য হয় তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় এ কথা বলা যাবে না। দেব-মতের পক্ষে চিন্তানায়কগণ বলবেন তা কেন? জগৎটাই তো মায়া, ভান, অসৎ। আমরা ভুল করে অসৎকে সৎ বলে মনে করি।

অসৎকে সৎ বলে মনে করতে পারি কিন্তু যথার্থ জ্ঞান লাভের পর প্রতীয়মান সৎ মিথ্যা বলেই প্রতিপন্ন হয়। উপনিষদ সাহিত্যে কিভাবে এই বিষয়টিকে তুলে

ধরা হয়েছে তা আমরা এখানে তুলে ধরব।[৮] বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ইন্দ্রে, মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়ঃ, অয়ম্ বৈ দশ, চ সহস্রাণি বহুনি চ অনন্তানি চ। তৎ এতৎ ব্রহ্ম অপূর্বম্ অনপরম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্। অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, সর্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্। একই ইন্দ্র, পরমেশ্বর, মায়া শক্তির দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন। এই মায়া শক্তি এক হলেও বুদ্ধি ভেদ বশতঃ বহুরূপে প্রতিভাত হয়। তাই শত শত জীব, ইন্দ্রিয় সকল-সংযোজিত অনুভূত হয়। আসলে এই আত্মাই পরমেশ্বর, এই আত্মাই ইন্দ্রিয়বৃন্দ, ইনিই দশ ও বহু সহস্র, বহু ও অনন্ত। এই আত্মাই ব্রহ্ম, কারণ রহিত, কার্যরহিত, অন্তর রহিত, অবাহ্য। এই সকল প্রকার অনুভবকারী আত্মাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই অনুশাসন।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও উল্লেখিত আছে[৯]—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্। তস্য অবয়ব-ভূতৈঃ ব্যাপ্তং সর্বং ইদং জগৎ॥ মায়াকেই প্রকৃতি বলে জানবে। আর মায়ার অধিষ্ঠাতাই মহেশ্বব। তাঁরই অবয়ব রূপে কল্পিত বস্তু দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত। এক কথায় প্রকৃতিই মায়া, আর সেই প্রকৃতির প্রবর্তক ব্রহ্মই এখানে মহেশ্বর। প্রকৃতি সম্বন্ধ বিশেষ বলেই মায়াবী বলা হয়েছে। অতএব জগৎ হলো চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই মায়া কল্পিত অবয়ব স্বরূপ। অতএব আত্মা বা ব্রহ্ম এক হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সকলই তাঁকে আপনা থেকেই অসংখ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেই বলা হয়েছে[১০]—অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বং এতৎ তস্মিন্ অন্যঃ মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ। বেদোক্ত আচার-উপাচার সকলই ব্রহ্ম উৎপন্ন। ব্রহ্ম উৎপন্ন মায়াশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বরই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আর সেই সৃষ্ট জগতে জীব মায়ার দ্বারাই আবদ্ধ হয়ে থাকে। ব্রহ্মের দিক থেকে মায়া হল ভান সৃষ্টি করার শক্তি। এই শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের বিচার হয় না। কিন্তু ব্রহ্মের প্রতারিত হওয়ার কোন সুযোগই নেই। মায়াবী যেমন মায়ার দ্বারা বিচিত্র বস্তু সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে অবাক করে দেয় অথচ মায়াবী নিজে সেখানে বিচিত্র জিনিস দেখে না। মায়াবী নিজেও জানে যে তার কোন মায়াশক্তি নেই। ব্রহ্মও অনুরূপভাবে মায়ার দ্বারা জগতের ভান সৃষ্টি করলে ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন। জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞর কাছে ব্রহ্ম মায়াশক্তি রহিত। কিন্তু বহির্মুখী ব্যক্তিসকল সেই আত্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না।

এই বিষয়ই কঠ উপনিষদে উল্লিখিত।[১১] পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি ন অন্তরাত্মন্। আসলে স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গুলোকে বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে জীব আত্মা বহির্ভূত বহির্বিষয় সমূহই দেখে

অন্তরে অবস্থিত আত্মাকে দেখতে পায় না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক অর্থাৎ বাহ্য বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে সরিয়ে এনে স্ব-স্বরূপ আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে। এই ইন্দ্রিয়গুলো বাহিরের দিকে খোলা থাকলেও ভেতরের দিক থেকে বন্ধ। ফলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনকালে কোনভাবেই অন্তরাত্মার জ্ঞান সম্ভব নয়। অবিবেকী সাধারণ মানুষ অন্তরাত্মার সন্ধান না পেয়ে অসার সংসার-লোককেই সার বলে মনে করে। কিন্তু বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়দের বহির্মুখী গতিকে অন্তর্মুখী করে তোলেন। তখন তাঁর কাছে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। তিনি তখন সরাসরি অন্তরাত্মাকে দেখতে পান।

উপনিষদে এই বিষয়েরও স্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান। কিভাবে এই প্রক্রিয়া সম্ভব তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে কঠ উপনিষদে।[১২] যচ্ছেৎ বাঙ মনসী প্রাজ্ঞঃ তৎ জ্ঞানে আত্মনি। জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তৎ যচ্ছেৎ শান্তে আত্মনি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য সহ সকল ইন্দ্রিয়কে মনে স্থাপন করবেন এবং মনকে প্রকাশ উন্মুখ বুদ্ধিতে স্থাপন করবেন, যার বুদ্ধিকে প্রথমজ মহতত্ত্বে অর্থাৎ মহান আত্মাতে স্থাপন করবেন। পরিশেষে মহান আত্মাকে শান্ত পরমাত্মাকে অর্থাৎ সর্বক্রিয়া-রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করবেন। এইভাবে ইন্দ্রিয় দিগকে অন্তর্মুখ করে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হয়। আর এই অন্তর্দৃষ্টি সত্যের আলোক উদ্ভাস ঘটায়। তখন যে জগৎ সত্য, বাস্তব অস্তিত্বশীল মনে হতো, সেই জগতেই মিথ্যা, মায়া, ভান মাত্র বলে ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে এই জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। রূপে রূপে প্রতিরূপ। সকল দেহে সকল রূপে একই আত্মা বর্তমান। আমাদের দৃষ্ট সকল রূপ ব্রহ্মের জ্ঞানে নিহিত। তাঁর জ্ঞানে নিহিত রূপ সমূহই জীবের নিকট প্রতিরূপ আকারে প্রকাশিত হয়। এইভাবে সাধারণ জীব তার ইন্দ্রিয় মনের ক্রিয়ার দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করে তা প্রতিরূপাত্মক প্রাতিভাসিক। ফলে জীব বস্তুরূপের আসল রূপটি দেখতেই পায় না। এই জীব সকল তাই ব্রহ্মরূপ থেকে বঞ্চিত।

এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করলেও ঐ সকল রূপে তিনি কখনোই আবদ্ধ নন। তিনি অন্তর বাহির সবেতেই বর্তমান। তিনি অবিকৃত অরূপ, তিনি সর্বগত এবং সর্বাতীত[১৩]—তেষাম্ অসৌ বিরজঃ ব্রহ্মলোকঃ যেষু জিহ্মম্ অনৃতং ন, মায়া চ, ইতি। যাঁদের মধ্যে কুটিলতা, অসত্য ও মিথ্যাচার নেই তাঁরাই কেবলমাত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এখন প্রশ্ন এই ব্রহ্মলোক কি? এর উত্তরে উপনিষদে

পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে, এই ব্রহ্মলোকই অতীন্দ্রিয়লোক, পরলোক। এই সকল কিছুর অতীত অতীন্দ্রিয়লোকই চূড়ান্ত সত্য। আর এই প্রতিরূপ সর্বস্ব জগৎ মিথ্যা, ভান মাত্র, মায়া। কিন্তু এই জগৎ বা মায়া ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয়। মায়া ব্রহ্ম থেকে ভিন্নও নয় আর অভিন্নও নয়। কিন্তু মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে অসীম ব্রহ্মের প্রকাশ সসীম জগতের ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার স্বীকার করলে ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তাই মায়া সৎ ও অসৎ দুইই। মায়া অনির্বচনীয়। জগৎ রূপে প্রকাশিত মায়া কিন্তু চঞ্চল, পরিণামী। ব্রহ্ম অচঞ্চল ও অপরিণামী। ব্রহ্ম স্বতঃ অচল হয়েও যেন চলেন। বাইরে যে চঞ্চল চলমান প্রকৃতির লীলা তাই ব্রহ্ম। আবার যে অচঞ্চল সত্তাকে আশ্রয় করে লীলা চলছে তাও ব্রহ্ম। এইভাবে চাঞ্চল্য অচলতা, গতি ও স্থিতি লীলা ও লীলার আশ্রয় দুইই ব্রহ্মে লীন। ব্রহ্ম তাই একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতীত। এই ব্রহ্ম সম্পর্কে ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে[১৪]—তৎ এজতি, তৎ ন এজতি, তৎ দূরে, তৎ উ অন্তিকে। তৎ অস্য সর্বস্ব অন্তঃ, উ তৎ অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ। ব্রহ্ম চলেন, চলেনও না, দূরে আবার নিকটেও সমস্ত জগতের ভিতরে, বাইরেও। এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা পরমাত্মা বা ব্রহ্মর সম্পর্কে জানলাম। এখন প্রশ্ন ব্রহ্মলোক কি?

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল দেবমত অনুযায়ী এই বৈচিত্র্যময় জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মের ভান মাত্র। প্রবঞ্চনাময়। আর যা প্রবঞ্চনাময় তা কখনো চূড়ান্ত বিচারে সত্য হতে পারে না। অতএব যা কিছু ইন্দ্রিয়সর্বস্ব তা পরিত্যাজ্য। ইন্দ্রিয় সকলই বিভ্রান্তির উৎস। এই জগৎ যে মিথ্যা, ভানমাত্র তা ইন্দ্রিয় প্রমাণিত। এইভাবে দেবমত অনুযায়ী ইন্দ্রিয়লোক হল ইহলোক। এই ইহলোক সবৈব মিথ্যা ও পরিত্যাজ্য। এখন প্রশ্ন ইহলোক যদি মিথ্যা হয় তো সত্য কি? এর উত্তরে দেবমত অনুসারী চিন্তানায়কগণ স্পষ্ট করেই বলেছেন, অতীন্দ্রিয় পরলোকই একমাত্র সত্য। এখন প্রশ্ন এই একমাত্র সত্য পরলোকই বা কি? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের কঠ উপনিষদের উদ্ধৃতি তুলে ধরতে হবে।

শুধু কঠ উপনিষদ কেন একই উদ্ধৃতিই সমানভাবে মুণ্ডক উপনিষদ ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে রয়েছে। [১৫] ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তম এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বম্ ইদম্ বিভাতি। সেই অতীন্দ্রিয় পরলোক হলো এমনই এক স্থান যেখানে

সূর্য তার দীপ্তি ছড়াবার জন্য হাজির নেই। না আছে দীপ্তি ছড়াবার জন্য চন্দ্র তারকা। চকিত চমক ছড়ানোর জন্য বিদ্যুৎও নেই। আর যেখানে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-বিদ্যুৎই নেই সেখানে অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাবে? আসলে দীপ্যমান মাত্র যা কিছুই তো তাঁর দীপ্তিতেই দীপ্যমান। জ্যোতিষ্মাণ সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি ইত্যাদি ইহলোক সম্পদ তো ব্রহ্ম দীপ্তিতেই দীপ্ত। অতএব এসবই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের কাছে নিষ্প্রভ। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি ব্রহ্ম দীপ্তিতে বিভাসিত হয়ে জগতের বস্তুরাজিকে প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু এরা কি করে আত্মভূত ব্রহ্মকে প্রকাশ করবে? কেননা এদের কোন নিজস্ব জ্যোতি নেই। এদের কোন স্বতন্ত্র প্রকাশ শক্তি নেই। ব্রহ্মশক্তিতেই এরা বলীয়ান। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে পরলোক কি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত? তার উত্তরে বলা হয়, তা কেন, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মের নিজের দীপ্তিতেই তো ব্রহ্মলোক বা পরলোক দীপ্ত। আর এই দীপ্তি সবার কাছে দীপ্ত নয়। কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছেই পরলোক জ্যোতির্লোক হিসেবে পরিগণিত। সাধারণ মানুষ অবিদ্যা পীড়িত। তাদের কাছে ব্রহ্মলোক বা পরলোক কখনো প্রতিভাত হয় না। কেননা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির ব্রহ্মকে প্রকাশ করার শক্তি নেই। তাই এ পরলোক বা ব্রহ্মলোক সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

কেন উপনিষদে ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বলা আছে যে[১৬]—ন তত্র চক্ষুঃ গচ্ছতি, ন বাক্ গচ্ছতি, নো মনঃ, ন বিদ্মঃ, ন বিজনীমঃ। এই পরলোক অতীন্দ্রিয়। কোন ইন্দ্রিয় কখনোই ধারে কাছে পৌঁছোতে পারে না। কারণ সেখানে চক্ষু যায় না, কথা পৌঁছোয় না, মন ও যায় না। এইভাবে পরলোক ইন্দ্রিয় মনের অগোচর। এখন প্রশ্ন যদি কোন ইন্দ্রিয়ই কখনো ওখানে পৌঁছোয় না একথা সত্য হয় তো ব্রহ্মলোক জানার উপায় কি? এর উত্তর আরো স্পষ্ট করে পেতে হলে আমাদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথা তুলে ধরতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে একমাত্র শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, মুমুক্ষু জ্ঞানী ব্যক্তিই নিজের আত্মাতেই এই পরমাত্মাকে দর্শন করতে সমর্থ হন। কেবলমাত্র তাঁর কাছেই ব্রহ্মলোক প্রতিভাত হয়। সর্বভূতে আত্মরূপ দেখেন। তিনি নিষ্পাপ, বিগতকাম সন্দেহ রহিত হয়েই ব্রহ্মজ্ঞ হন। আর ব্রহ্মজ্ঞের কাছে ইহলোক সহ সকলকিছুই মিথ্যা। কেবলমাত্র পরলোকই একমাত্র সত্য। এই পরলোকই ব্রহ্মলোক।

বাস্তবতার প্রতিপাদন সমস্যা এইভাবে আমাদের পরস্পর বিরোধী দ্বৈত তত্ত্ব উপস্থিত করেছে সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যে। প্রথমত ইহলোক তত্ত্ব ও দ্বিতীয়ত

৮

পরলোক তত্ত্ব। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টই বলা হয়েছে —পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ। পুরুষের দুই স্থান যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোক। কিন্তু এই সহাবস্থান তত্ত্ব সাময়িক। চূড়ান্ত স্তরে পরলোককেই চূড়ান্ত সত্যরূপে স্থান দেওয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু এত করেও পরস্পর বিরোধী তত্ত্বকে মিলিয়ে কোন মহার্ঘ কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। পরস্পব দুই তত্ত্ব দুই মেরুতেই আজও অবস্থান করছে। যারা দেহকেই মহনীয় মনে করে, এই জীবনকে দুর্লভ মনে করে, জগতের যাবতীয় বস্তুরাজিকে সত্য বলে গ্রহণ করে তার প্রাপ্তির প্রযাসে উন্মুখ থাকে তারা ভূতবাদী। শুধু তাই নয় তারা সফল ব্যবহারের দ্বারা বিশ্বাস করে যে কেবলমাত্র দৃষ্ট জগতই বর্তমান। অন্য কোন লোক-এর কোন অস্তিত্বই নেই। পরলোকের কথা অলীক কল্পনা ভিন্ন কিছুই নয়। এরাই ইহলোকের তত্ত্বের প্রবক্তা।

অপরপক্ষে যারা মনে করেন অশরীর আত্মাই মহনীয, এই জীবন এক পরম অভিশাপ। জ্বালা-যন্ত্রণাময় এই জীবন নশ্বর। এখান থেকে মুক্তিই পুরুষের একমাত্র কাম্য বস্তু। এই মুক্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতেই সম্ভব। এই দৃষ্ট জগৎ মিথ্যা। যাবতীয় জগৎ বৈচিত্র্য প্রবঞ্চনাময়। এই জগৎ সবৈব পরিত্যজ্য। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধনাই পুরুষের একমাত্র মহার্ঘ প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। কেননা ব্রহ্মলোক বা পরলোকই অমৃত।

এইভাবে আমরা দেখেছি যে ইহলোক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ অসুরমত অনুসারী, ভূতবাদী। আর পরলোক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ দেবমতের অনুসারী, ব্রহ্মবাদী, আত্মবাদী। ফলে বাস্তবতার প্রতিপাদনে আমরা যে পরস্পরবিরোধী বিপরীত তত্ত্ব পেলাম তা যথাক্রমে ভূতবাদ বনাম আত্মবাদ বা ভাববাদ।

একাদশ অধ্যায়

সৃষ্টিতত্ত্ব

এই বিশ্ব হলো এক মহৎ সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে দেখে মানুষের বিস্ময়ের অন্ত নেই। এই সৃষ্টির রহস্য মানুষকে অনুসন্ধানী করে তুলেছে। আর বংশ পরম্পরায় যে প্রশ্ন তাড়া করে ফিরেছে তা হলো কোথা থেকে কিভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো। এইভাবে বিশ্বরহস্য অনুধাবন করার যে আকুতি তৎকালীন মানুষের চিন্তায় ছড়িয়েছিল তার সংগ্রহই হলো বেদ। ঋগ্বেদের বিখ্যাত মন্ত্র যা সৃষ্টির গান বলে চিহ্নিত তা হলো 'কে বা কারা বলতে পারে, কখন কিভাবে এই সৃষ্টি সম্ভব হলো। এমন কি ঈশ্বরদের ও তখনো আবির্ভাব হয় নি। তাহলে কে এই সৃষ্টি সম্পর্কিত সত্য ব্যাখ্যা করতে পারে? কখন এই পৃথিবীর সৃষ্টি হলো, কিংবা এই সৃষ্টির পেছনে কার অদৃশ্য হাত বর্তমান। ঈশ্বরের না প্রকৃতির? এইভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রথম ঋগ্বেদে ঠাঁই পেয়েছিল। এই বিপরীতভাব যুক্ত জগৎ বৈচিত্র্য যেমন প্রাণ, জড়, জীবন-মৃত্যু, ভালো-মন্দ কিভাবে কোথা থেকে সম্ভব হয়েছিল?

ঋগ্বেদের সূচনাপর্বে এই যে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল তারই পরিবর্ধন সূচীমুখ পেল উপনিষদে। কিন্তু এই পরিবর্ধন দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল সামাজিক সংগ্রামের অনিবার্য ফল হিসেবে। তৎকালীন যে সামাজিক সংগ্রামের চিত্র পাওয়া যায় তা হলো দেব আর অসুরের সংগ্রাম। আর সমগ্র বৈদিক সাহিত্যই সেই দেবাসুর সংগ্রামের চিত্র। উপনিষদ হলো সেই সংগ্রামের চরম পরিণতি। চরম পরিণতি এই জন্য বলছি যে ঋগ্বেদের সৃষ্টির গানই উপনিষদ যুগে সমাজ-কাঠামোর দ্বন্দ্ব সর্বস্ব হয়ে উপরিকাঠামোর দ্বন্দ্বে পরিণতি পায়। অর্থাৎ সমাজ দ্বন্দ্ব ভাবজগৎকে ও দ্বন্দ্বমুখর করে তোলে। ফলে ঋগ্বেদের যা ছিল ছন্দোবদ্ধ উদাত্ত সংগীত তাই উপনিষদে বাক্যবন্ধ হয়ে পরস্পর বিরোধী ভাবাদর্শে দ্বন্দ্বমুখর হয়ে ওঠে। কার্যত দেখা যায় সৃষ্টিতত্ত্বকে ঘিরে সম্পূর্ণত বিপরীত মতবাদ উপনিষদে আত্মপ্রকাশ করে।

ঋগ্বেদের প্রশ্নই শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে ফিরে এসেছে আরো স্পষ্ট ও সূচীমুখ হয়ে।[১] কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। ব্রহ্মই

কি জগৎ সৃষ্টির কারণ? আমরা কোথা থেকে জন্মেছি, কার দ্বারা জীবন ধারণ করে আছি। অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? উপনিষদ চিন্তাবিদগণ একত্র সমবেত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করছেন। কেন না সমাজে তখন পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। যার ফলে দেখি পরবর্তী উদ্ধৃতিতেই সেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বিতর্কিত মতবাদের পরিচয় পাই।—কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত, প্রকৃতি পুরুষ ইত্যাদি এদের যে কোন একটি জগৎ সৃষ্টির কারণ কিনা চিন্তা করা দরকার। এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করছে উপনিষদ যুগে সৃষ্টিতত্ত্বকে ঘিরে পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালের নিয়মে এই সব বিতর্কিত মতবাদ ক্রমশই হারিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরস্পর বিবদমান দুই তত্ত্বে বেঁচে থাকে। এই বিবদমান দুই তত্ত্ব সামাজিক শাসন অনুযায়ী দেবমত ও অসুর মত হিসেবে চিহ্নিত। কেন না সামাজিক দিক থেকেই এই দুই শ্রেণীই পরস্পর বিরোধী। দেবমতই আত্মবিবর্তবাদ বা ভাববাদ আর অসুরমত হল ভূতবাদ। আত্মবিবর্ত-বাদের বা ভাববাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য আর ভূতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন উদ্দালক।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের মত প্রশ্ন উপনিষদে ও সমানভাবে সেই ঋগ বৈদিক প্রশ্ন সমানভাবে উপস্থিত।[২] কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। কোথা থেকে এই সকল প্রাণী জন্মলাভ করে? আর উত্তর হিসেবে যা তুলে ধরা হয়েছে তা কার্যত প্রাচীন ধারণাই। কি সেই ধারণা।[৩] আদিত্য হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চ, তস্মান মূর্তিরেব রয়িঃ। সূর্যই প্রাণ, অন্নই চন্দ্রমা, মূর্ত এবং অমূর্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল কিছুই অন্ন, অমূর্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকে পৃথক মূর্ত রূপ অর্থাৎ স্থূল পদার্থই অন্ন। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই উদ্ধৃতি। এখানে আদিম বিশ্বাসকেই হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্যই জগতের উৎস। উপনিষদেই অন্যত্র সূর্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে—বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, বিশ্বের চক্ষু হিসেবে। সূর্যই জীবনের প্রতীক। কেন না সূর্য উদিত হলে চতুর্দিক প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে ওঠে। চন্দ্রমার সঙ্গে রাত্রির সম্পর্ক থাকায় অর্থাৎ সূর্য অন্য গোলার্ধে গেলে রাত্রি নেমে আসে। তখন রাত্রিকালে সকল প্রাণীই নিদ্রা যায়। প্রাণচঞ্চল পৃথিবী জড় প্রকৃতির আকার ধারণ করে। তাই চন্দ্র জড়ের প্রতীক। তাই সূর্যকে এখানে প্রাণ, চন্দ্রকে এখানে অন্ন অর্থাৎ জড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জড় বস্তু সমূহের আবার দুটি রূপ—সূক্ষ্ম ও স্থূল। প্রত্যেক

সৃষ্ট বস্তুই মূর্ত অর্থাৎ মূর্তিস্বরূপ, রূপবাণ। যাকে আমরা সূক্ষ্ম বা অমূর্ত বলি তার ও রূপ বর্তমান, তবে সেই মূর্তি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে তার রূপ আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে সব সময় উপলব্ধি করতে পারি না। এই উদ্ধৃতি এইভাবে আমাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত স্বাভাবিক আদিম ধারণাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই আদিম ধারণাই ছান্দোগ্য উপনিষদে যুগোপযোগী উন্নত ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে অগ্রবর্তী চিন্তায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সষ্ঠ অধ্যায়েব তৃতীয় খণ্ডের প্রথম তিনটি শ্লোকে যে আদিম ধারণাব অগ্রবর্তী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, আর তা যে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি বিজ্ঞানকেন্দ্রিক তা আলোচনা থেকেই উপলব্ধি ঘটবে।[৪] তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজম্ জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্ ইতি। তাবৎ ভূতপদার্থের উৎপত্তির তিনটি কারণ বর্তমান। যথাক্রমে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। জগতের যতকিছু সৃষ্টি তা এই তিন প্রকার কারণসম্ভূত যেমন ডিম থেকে যার জন্ম হয় তারা অণ্ডজ, জীবযোনি থেকে জাতদের বলা হয় জীবজ অর্থাৎ যারা স্তন্যপায়ী। আর যারা বৃক্ষাদি থেকে জাত তাদের বলা হয় উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিজ্জ বলতে আবার বীজ বা অঙ্কুর থেকে জাতকে ও বুঝিয়ে থাকে। প্রত্যক্ষের বিষয় এই তিন প্রকার প্রাণী পক্ষী, পশু ও বৃক্ষ আবার মহাভূতবর্গ থেকে এসেছে।

মহাভূতবর্গ থেকে সকলেই যে উদ্ভূত এই তত্ত্ব নিয়ে ও সেই যুগে দু প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। কারো কাবো মতে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎরূপে বর্তমান ছিল। একপ্রকার ব্যাখ্যা হল সেই সৎ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। আর অপর ব্যাখ্যা হল সেই অসৎ থেকেই জগতের সৃষ্টি। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখি একই পরিমণ্ডলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দু দুটি সম্প্রদায়কে দু প্রকার ব্যাখ্যা সহ নিজস্ব দর্শন উপলব্ধি গড়ে তুলতে। যথাক্রমে সাংখ্য যোগ সৎকার্যবাদ এবং ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্যবাদ। এই উভয়প্রকার মতবাদই কার্যত ভূত-প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আমরা এখন ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকেই উদ্ধৃতি তুলে ধরে দেখানোর চেষ্টা করব।[৫] সৎ এব সোম্য! ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম এব অদ্বিতীয়ম্। তৎ হ একে আহুঃ অসৎ এব ইদম্ অগ্রে অসীৎ। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়ত। কারো কারো মতে সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ রূপে বর্তমান ছিল। আবাব কারো কারো মতে এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎ রূপে বর্তমান ছিল। সেই অসৎ থেকেই সৎ জাত। সৎ না অসৎ সৃষ্টির পূর্বে কোন অবস্থা বিরাজ করছিল তা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তার উল্লেখই যে বর্তমান তা

নয় সেই বিতর্কের অবতারণা ও উপনিষদেই রয়েছে। অসৎ থেকে কি করে সৎ জাত হতে পারে। যা নেই তার উপস্থিতি চিন্তা করা তো নিরর্থক। আবার বিপরীত পক্ষেব যুক্তি হলো যা আছে তার আবার সৃষ্টি হতে পারে কি করে? ফলে অসৎ থেকেই সৎ এর সৃষ্টি সম্ভব। এই দ্বন্দ্ব উপনিষদ যুগ ছাড়িয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় দর্শনেও বর্তমান। আবার তেমনি দেখি বৌদ্ধ দর্শনে তার সমন্বয়ী চিন্তার উন্মেষ। তা হলো সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সৎ এবং অসৎ উভয় অবস্থাতেই বর্তমান ছিল। শুধু সৎ অবস্থাব প্রকৃতি আর অসৎ অবস্থার প্রকৃতি কার্যত ভিন্ন। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থাৎ সৎ ও অসৎ রূপে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদেই আবার রয়েছে যে সৃষ্টির পূর্বে মহাভূত ছিল ত্রিবিধ। এই তিনপ্রকাব মহাভূত যথাক্রমে তেজ, জল ও অন্ন। এই তিন প্রকার মহাভূত যথাক্রমে তিন প্রকার দেবতা রূপে চিহ্নিত। হয়তো মনে হতে পারে এই বাহ্য এই তিন মহাভূতকে দেবতারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে দেবতা শব্দের শ্রুতি অর্থ গ্রহণ করা উচিত। প্রথম তিন দেবতার কথা যে বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখিত তারা আসলে মহাভূতই। আর দেবতা শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থেই তার তাৎপর্য নিহিত। ইতিপূর্বে সেই অর্থেব উল্লেখ করেছি বলে এখানে আর পুনবায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদেব উদ্ধৃতিটি এবার তুলে ধরি। "সা ইয়ম দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি। তাসাম ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম করবাণি ইতি। সৎ বা অসৎ যাইই হোক না কেন সেই দেবতা তিন দেবতাতে রূপান্তরিত হলেন। এই তিন দেবতা যথাক্রমে তেজ জল ও অন্ন। আর এই তিন দেবতা একে অপরের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিক্রিয়াকে সম্ভব করে বললেন। এই ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়াটি কি? এর উত্তর ও উপনিষদেই বর্তমান। এই ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক মহাভূতকে প্রধান রূপে গ্রহণ করে অপর অপ্রধান দুটিকে তার সঙ্গে সংমিশ্রিত করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি এই রকম—তেজ দু ভাগের এক ভাগ+জল চার ভাগের একভাগ+পৃথিবী চার ভাগের একভাগ আবার তেমনি পৃথিবী বা অন্নকে প্রধান করে যথাক্রমে পৃথিবী দু ভাগের একভাগ+তেজ চার ভাগের এক ভাগ+জল চার ভাগের এক ভাগ। আবার জলকে প্রধান করে যথাক্রমে জল দু ভাগের এক ভাগ+তেজ চার ভাগের এক ভাগ+অন্ন বা পৃথিবী চার ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি। এইভাবে এই ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়ায় তিন

মহাভূত থেকেই এই বিশ্বের সৃষ্টি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যখন বলা হচ্ছে যে এই ব্রহ্মাণ্ডে তিন মহাভূত যথাক্রমে জল, তেজ ও পৃথিবী উদ্ভূত, সেই উপনিষদ যুগেই আবার প্রশ্ন উপনিষদে বলা হয়েছে এই জগৎ পঞ্চ মহাভূত উদ্ভূত। প্রশ্ন উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরি[7] পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপঃ চ আপোমাত্রা চ, তেজঃ চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশঃ চ আকাশমাত্রা চ । পৃথিবী ও গন্ধতন্মাত্রা, জল ও রসতন্মাত্রা, তেজ ও রূপতন্মাত্রা, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ ও শব্দতন্মাত্রা ইত্যাদি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত থেকেই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় এই জগতের উৎপত্তি। আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা উপলব্ধি করি তা হলো এই পঞ্চভূতের স্থূল রূপ। কিন্তু এই স্থূল রূপের অন্তরালে তাদের এক একটি সূক্ষ্মরূপ আছে। এই সূক্ষ্মরূপকেই এখানে তন্মাত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এই সূক্ষ্মরূপই স্থূলরূপে বিবর্তিত হয়। আর এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া ও ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়ার অনুরূপ। কিন্তু ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়ায় থেকে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া যে প্রগতির পরিচায়ক তার উদাহরণ হলো এখানে পঞ্চভূতের অবয়ব ও গুণাবয়ব একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চমহাভূতের যে স্থূল জড়রূপ অর্থাৎ বস্তুরূপ তা সূক্ষ্মরূপের থেকে পৃথক। সূক্ষ্মরূপ হল জড়বস্তুর গুণ। যেমন পৃথিবীর বিশিষ্ট গুণ হল গন্ধ, জলের বিশিষ্ট গুণ রস, বায়ুর বিশিষ্ট গুণ স্পর্শ, তেজের বিশিষ্ট গুণ রূপ ও আকাশের বিশিষ্ট গুণ শব্দ ইত্যাদি। মৈত্রী উপনিষদে আরো সরাসরি ভূতবাদকে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে[8] অথ পঞ্চ-মহাভূতানি ভূতশব্দে নোচ্যন্তে; অথ তেষাং যৎ সমুদয়ং তৎ শরীরমিত্যুক্তম্। অথ যোহ খলুবাব শরীর ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্। পঞ্চমহাভূতই ভূতশব্দে পরিজ্ঞাত। এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ই শরীর। এই পঞ্চমহাভূত উদ্ভূত উপবস্তু চৈতন্যময় শরীরই ভূতাত্মা। এইভাবে এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, যে কোন সৃষ্টির আদি উৎস কিন্তু ভূতই। কারণ শরীর বিশ্লেষণ করলে ভূতই অবশিষ্ট থাকে। সেইভূত পাঁচ প্রকার আকাশ, মাটি, জল, বাতাস ও আগুন। এরা একসঙ্গে মিলিত হয়েই যে কোন প্রকার সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কিসের ভিত্তিতে মিলিত হয়? কেই বা তাদেরকে সংমিশ্রিত করে? এর উত্তর ও উপনিষদেই রয়েছে এরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর স্বভাব অনুযায়ীই সংমিশ্রিত হয়। তার জন্য কোন বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হয় না। তবু ও প্রশ্ন উঠতে পারে মহাভূতের মিলনে যে কোন প্রকার সৃষ্টি না হয় স্বীকার করা

গেল কিন্তু জীবন বা চেতনা ও কি এই মহাভূত সৃষ্ট? এর উত্তর ও এই উপরের উদ্ধৃতিতেই বর্তমান। এই পঞ্চমহাভূত সমূহই যে শরীর গঠন করে সেই শরীরেই এক সময় চৈতন্য বা জীবনের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে চেতনা হল পঞ্চমহাভূত সম্ভূত উপবস্তু। এখানে এই উদ্ধৃতিতে ভূতচৈতন্যবাদেরই কথা তুলে ধরা হয়েছে। অতএব দেহের অতিরিক্ত চৈতন্যের কোন অবস্থান নেই। দেহসম্বন্ধরূপেই আত্মা বা চৈতন্যের ইন্দ্রিয়গোচর হয়।

তবু ও প্রশ্ন জাগতে পারে এই যে জীব ও জড় জগৎ মহাভূত উদ্ভূত তার প্রমাণ কি? অর্থাৎ এই যে জীব ও জড় জগৎ পঞ্চমহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার সমর্থনে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কি? না কি অনুমান নির্ভর, কেবলই কল্পনাবিলাস। এই প্রশ্নের উত্তর ও যথাযথভাবে উপনিষদেই বর্তমান। ঋষি উদ্দালক এর উদ্ধৃতি ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।[৯] যথা সৌমেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্তেব সত্যম্। হে সৌম্য যেমন একটি মৃৎপাত্র দেখে সকল কিছুই যে মৃত্তিকাময় জ্ঞাত হয়, মৃন্ময় বস্তু মৃৎপাত্রে যে মৃত্তিকারই বিকার বাক্যবন্ধে ধরে রাখা কেবল একটি নাম। আসলে সকল কিছুর মূলে মৃত্তিকাই সত্য। বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য যে কোন একটি মৃৎপাত্র নেওয়া যাক, যেমন ঘট। মাটির তৈরী ঘটকে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে এই ঘটের উপাদান মাটিই। মাটিই সত্য। ঘট হলো মাটির ভিন্ন রূপ। একেই বলে মৃত্তিকার বিকার, নামরূপ। ঠিক সেই রকমই লোহা নির্মিত বস্তু নরুন ও সোনার তৈরী গহনা সকল ক্ষেত্রেই লোহা ও সোনা হলো আদি উপাদান। যথাক্রমে লোহা ও সোনাই সত্য। মাটির তৈরী ইট, লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি, সোনার তৈরী গহনাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে মাটি, লোহা ও সোনাই সার। এই ভাবে তৈরী কোন বস্তুর যে কোন অংশ বিশ্লেষণ করলে যেমন তার আদি অবিকৃত রূপ জানা যায় তেমনই জীব ও জড় জগতের যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলেই তার আদি ও অবিকৃত সত্তা জানা সম্ভব। তাহলে জগৎ বৈচিত্রের যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা এই বস্তুর আদিরূপ খুঁজে পেতে পারব। আর তা যে সম্ভব সেই সম্পর্কিত স্বীকৃতি বিপক্ষীয় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্বীকৃতিতেই রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ এখানে আমরা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধৃতিটি হুবহু এখানে তুলে ধরেছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে

আত্মতত্ত্ব বিরোধী মতবাদ বলতে বাধ্য হন।—[১০] স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকম্ এব অনুবিলীয়তে ন হ অস্য স্যাৎ উদগ্রহণায় ইব। যতঃ যতঃ তু আদদীত লবনম্ এব, এবম্ বৈ অরে, ইদং মহদ্ভুতম অনন্তম্ অপারং, বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে বিপরীত তত্ত্ব ভূতবাদ তুলে ধরতে পারি। ভূতবাদ অনুযায়ী যেমন লবনখণ্ড জলে ফেললে তা সঙ্গে সঙ্গেই জলে বিলীন হয়ে যায়, অথচ লবনখণ্ডটিকে জলে আর কোনভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই লবনখণ্ড কোথায় গেল? জলে জলাকার হয়ে গেল। কেউই তখন চেষ্টা করলে ও কোনভাবে লবনখণ্ডটিকে কখনো তুলে নিতে পারে না। অথচ লবন সেখানে বর্তমান। অর্থাৎ সেইজলেই দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। আমরা খালি চোখে তা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা দেখতে না পেলে ও লবন আছে। প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে উক্ত জলের যে কোন স্থান থেকেই জল তুলে তার আস্বাদ গ্রহণ করা হোক না কেন তার লবনাক্ত স্বাদই পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, এই মহাবিশ্বের আদি সত্তা হল মহাভূত। এই মহাভূত অনন্ত অপার। এমনকি বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ চৈতন্য ও এই মহাভূত সম্ভূত। এইভাবে মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তুরাজি জড় ও চেতন মহাভূত থেকে উত্থিত হয়ে আবার মহাভূতেই বিলীন হয়ে যায়। এই মহাভূতে বিলীন হওয়াই মৃত্যুরূপে চিহ্নিত। এই মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না।

ভূতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই বক্তব্য উপস্থিত করলেও সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এমন সুন্দর বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণ সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা যায় না। এই বৈচিত্র্যময় জগৎ হলো কার্য। এর কারণ কি? এ নিয়ে সেই সুপ্রাচীন কাল ঋগ্‌বৈদিক যুগ থেকে যার ইতিহাস পাওয়া যায় সেই ইতিহাসে কত মত, কত বিতর্ক স্থান পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত উপনিষদ যুগে এসে তা বিপরীতমুখী দুই মতবাদে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। এই পরস্পর বিরোধী দুই মতবাদ যথাক্রমে ভূতবাদ ও আত্মবাদ।

ভূতবাদের স্পষ্ট উক্তি এই জগৎ বৈচিত্র ভূতময়। এই ভূতজগৎ সত্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আর কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। জড় ও জীবজগৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত উপলব্ধ সত্য হলো বিনা কারণে কোন একটি ঘটনাও দেখা যায় না। যে কোন ঘটনারই কারণ বর্তমান। বৈচিত্র্যময় মহাবিশ্বও একটি ঘটনা। ফলে তারও কারণ বর্তমান। এখন প্রশ্ন এই মহাবিশ্বের মূল রহস্য বা আদি কারণ কি?

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিবাদী মতবাদ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে জগতের যাবতীয় বস্তুই ভূত উপাদানে গঠিত। সকল ভূতময় বস্তুই আদি মহাভূত থেকে এসেছে। আদি মহাভূত অনন্ত, অপার। এই মহাভূতকে কোন প্রকার গণ্ডী টেনে বোঝানো যায় না। এই মহাভূত থেকে যেমন জড়ের উৎপত্তি হয়েছে তেমনই জীবনেরও উৎপত্তি ঘটেছে। কিভাবে এই উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে তারও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। যথাক্রমে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণের মাধ্যমে। ত্রিবৃৎকরণ প্রক্রিয়া অনেক বেশী প্রাচীন, পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া সে দিক থেকে অনেকখানি নবীন। এই অনন্ত, অপার মহাভূতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চবিধ কণাসমূহে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পঞ্চবিধ কণাসমূহ যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পাঁচ মহাভূতের সম্মিলনই যে কোন সৃষ্টির মূল রহস্য আর এই পঞ্চমহাভূত স্বভাব নিয়মেই মিলিত হয়। ফলে এই বৈচিত্রময় জগৎ সৃষ্টির হেতু হল ভূতস্বভাব। এইভাবে ভূতবাদ অনুযায়ী স্বভাব নিয়মেই জগৎ বৈচিত্রের উৎপত্তি ঘটে। আবার স্বভাব নিয়মেই এদের বিলুপ্ত হয়। ভূতবাদ অনুযায়ী উৎপত্তি-স্থিতি-লয় স্বভাববশতই। শুধু যে জড়বস্তু সমূহের উৎপত্তি হয় মহাভূত থেকে তা নয় এমনকি চৈতন্যও মহাভূত উদ্ভূত। চৈতন্য শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন উপবস্তু। শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য থাকে। যখন শরীরের বিলুপ্তি ঘটে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়। ফলে মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না। দেহ অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। অতীন্দ্রিয় আত্মা কোনদিন সম্ভবই নয়। তেমনই জগৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টির ব্যাপারে অতীন্দ্রিয় কোন শক্তি বা ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। ঈশ্বর, ব্রহ্মণ বা অতীন্দ্রিয় আত্মা, পরমাত্মা অলীক কল্পনার সৃষ্টি। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে কোনকিছু নেই, কোনদিন ছিলও না। জন্মান্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট ইত্যাদি শব্দের কোন তাৎপর্য বাস্তব জগতে নেই। ঈশ্বরের মতই এ সকলকিছু অলীক কল্পনা। এইভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব ভূতবাদ অনুযায়ী ভূতই আদি, ভূতই সর্বশেষ কথা। ভূত ভিন্ন কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ভূতবাদের বিপরীত মতবাদই হলো আত্মবাদ। সমগ্র উপনিষদে ভূতবাদ সম্পর্কে আলোচনা কোনরকমে নামমাত্র পরিসরে থাকলেও আত্মবাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান। বলতে গেলে উপনিষদের ছত্রে ছত্রে কোন না কোনভাবে আত্মবাদের কথাই নানাভাবে রয়েছে। সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নে সব কটি উপনিষদেই একটি কথাই বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে তা হলো, সৃষ্টির আদিতে কেবল আত্মাই ছিল। আর কোন কিছুই ছিল না। বৃহদারণ্যক

উপনিষদে বলা হয়েছে, যা সবকটি উপনিষদেরও মূল কথা,[১১]—আত্মা এবম্ ইদম অগ্রে আসীৎ। সৃষ্টির পূর্বে সকল কিছুই আত্মাতেই বর্তমান ছিল। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে[১২]—আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। সৃষ্টির পূর্বে এই মহাবিশ্ব একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। এমনকি নিমেষ মাত্র ক্রিয়াশীল কোন কিছুও উপস্থিত ছিল না। এক কথায় সৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বৈচিত্র্য কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাতেই বর্তমান ছিল।

এখন প্রশ্ন সৃষ্টি পূর্ববর্তী অবস্থা তাহলে কেমন ছিল। তার উত্তরও আমরা উপনিষদ থেকেই পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে[১৩]—না এব ইহ কিম্চন অগ্রে আসীৎ, মৃত্যুনা এব ইদম্ আবৃতম্ আসীৎ। অশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুঃ। পূর্বে এই সংসার বলে কোন কিছুই ছিল না। ঘন অন্ধকার মৃত্যুর দ্বারা এই সমগ্র ভূমণ্ডল আবৃত ছিল। কিন্তু এই অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠতে মৃত্যুই সংকল্প করল যে আমি আত্মবান হব। তখন তিনি নিজেই নিজের আরাধনা করতে শুরু করলেন। সেখান থেকেই প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই একথা উল্লিখিত—মৃত্যুস্তন্মনোহকুরুত আত্মবী স্যাম ইতি। সঃ অর্চন্ অচরৎ। ঠিক অনুরূপ কথাই ঐতরেয় উপনিষদে বর্তমান। সেখানে বলা হয়েছে[১৪]—স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। সেই সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সত্তাই চিন্তা করলেন যে আমি প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি করব। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে যে আত্মা চিন্তা করলেন যে আমি এক আছি বহু হবো।[১৫] স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। তিনি সঙ্গীর ইচ্ছা করলেন। এই রূপে দ্বিতীয় হলেন। এইভাবে এক আত্মাই বহু হলেন। অর্থাৎ নানান রূপে প্রকাশিত হলেন। এখন প্রশ্ন কিভাবে এই এক আত্মা নানারূপে প্রকাশিত হলেন? তার কোন ব্যাখ্যা রয়েছে কি? এক্ষেত্রে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা উপনিষদ সাহিত্যে নেই। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিতে লোকায়ত ব্যাখ্যাকে সহিয়ে নিয়ে যে অভিনব ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন তাই হলো আত্মবিবর্তবাদ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে[১৬] তস্মাদ্বা এ তস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশৎ বায়ুঃ। বায়োঃ অগ্নিঃ। অগ্নেঃ আপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। সেই আত্মা থেকেই আকাশ উৎপন্ন হলো। আকাশ থেকে বায়ু। বায়ু থেকে অগ্নি। অগ্নি থেকে জল। জল থেকে পৃথিবী। এই ব্যাখ্যাটি চিত্তাকর্ষক, কেননা লোকায়ত ব্যাখ্যা মাটি, জল, আকাশ, অগ্নি, বায়ু এই পাঁচ মহাভূতই জগতের সৃষ্টির উৎস

বলে সাধারণে পরিব্যাপ্ত। সেই ব্যাখ্যাকে প্রায় সবটাই বজায় রেখে কেবল প্রথমে একটি বিষয় জুড়ে দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে আত্মা থেকেই সকল কিছু বিবর্তিত হয়ে বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছে। সেই বিষয়টি আর কিছু নয় আত্মা। অর্থাৎ দেখানো, আত্মাই সকল কিছুর মূল। কেবল যে উপনিষদে সৃষ্টি সম্পর্কিত এই ব্যাখ্যাই রয়েছে তা নয়। সাধারণের জীবনের ঘটনা থেকে ও ব্যাখ্যা উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা বংশগতির জৈবিক ব্যাখ্যা। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।—সঃ ইমম্ এব আত্মানম্ দ্বেধা অপাতয়ৎ। ততঃ পতি চ পত্নী চ অভবতাম্।...সা উ হ ইয়ম ঈক্ষাম চক্রে কথম্ নু মা আত্মনঃ এব জনয়িত্বা সংভবতি। হন্ত! তিরঃ অসানি ইতি। সা গৌঃ অভবৎ, ঋষভঃ ইতরঃ, তাম সমভবৎ এব। তিনি নিজেকে দু ভাগে ভাগ করলেন। এ ভাবে পতি ও পত্নীর সৃষ্টি হল। সেই স্ত্রী চিন্তা করতে থাকলেন তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তিনিই আবার আমাতে কি প্রকারে উপগত হবেন। এইভাবে তিনি অদৃশ্য হলেন। তারপর তিনি গাইগরুতে রূপান্তরিত হলেন। তখন অন্যে রূপান্তরিত হলে বৃষতে। তখন উভয়ে উপগত হলেন। এইভাবেই ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেঁড়া এমনকি পিঁপড়ে পর্যন্ত যতপ্রকার মিথুন আছে সেই সমস্ত কিছুই তিনি একইভাবে সৃষ্টি করলেন। আর এইভাবে একে একে জীবন ও জগৎ সৃষ্টি হল। এমনিধারা ব্যাখ্যা সব কটি উপনিষদেই কোন না কোনভাবে স্থান পেয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই সাধাবণেব ধারণায় জগৎ কে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন না তা না হলে এই অভিনব সৃষ্টিতত্ত্ব জনমানসে বিশ্বাস যোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে না। তাই তাঁরা কৌশল হিসেবে লোকায়ত ব্যাখ্যাকেই পাথেয় করে লোকবিযুক্ত কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্ব উপস্থিত করেছেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই প্রায় অধিকাংশ[১৭] উপনিষদেই বিশ্বকে সৃষ্টি এবং আত্মাকে স্রষ্টা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক আত্মাই ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত। সকল শরীরেই একই আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে[১৮] আত্মৈবেদং সর্বমিতি। সকল কিছুই যে আত্মাময় তা জানবে। সকল প্রাণীজগৎ থেকে শুরু করে যে বস্তুজগৎ সবেতেই আত্মার অধিষ্ঠান। এই আত্মাই পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম। অতএব এই জগৎ আত্মাময় বলতে ব্রহ্মময়ই বোঝাচ্ছে। উপনিষদগুলিতে আত্মা ও ব্রহ্মকে একাকার করে দেখানোর প্রচেষ্টা প্রায়ই লক্ষ্যণীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে এই জগৎ

ব্রহ্মময়'। এখানে বোঝানো হয়েছে ব্রহ্ম ও আত্মা একাকার। একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হবে। —সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। এই বিশ্ব ব্রহ্মময়। ব্রহ্মকে এখানে তজ্জলান বলা হয়েছে। 'তৎ' অর্থে তিনি। 'জ' অর্থে জগতের জন্ম দেন। 'লি' অর্থে তাঁর মধ্যেই জগৎ লয় পায়। আর 'অন' অর্থে তিনিই জগৎ ধারণ করেন। এখন আত্মা বা ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহার কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঈশ উপনিষদে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে[১৯] ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এই চলমান জগৎ পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানে ঈশ অর্থে ঈশ্বর প্রভু মঙ্গলকর্তা বোঝানো হয়েছে। তেমনি বাস্যম্ শব্দের ও বিভিন্ন অর্থ এখানে গৃহীত। যথাক্রমে আচ্ছাদনীয়, পরিধেয় এবং বাসযোগ্য অর্থে গৃহীত। ব্রহ্ম এই বিশ্বকে আচ্ছাদন করে আছেন। বিশ্ব হল ব্রহ্মের পরিচ্ছদ। এই বিশ্ব ব্রহ্মের বাসের জন্য। প্রথম অর্থে এই ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে ব্রহ্ম বিশ্বের মধ্যেই অনুস্যূত। জগৎ কথাটার মধ্যেই মিথ্যাভাব বর্তমান। যা এক মুহূর্তের জন্য ও স্থির নয়, চঞ্চল চলমান, সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে তার নামই জগৎ। কিন্তু এই অনিত্য চরাচর বিকারী বস্তু সমূহ এক অচল সত্তার আশ্রয়ে অবশ্যই অভিব্যক্ত। কারণ কোন চঞ্চল গতিসর্বস্ব প্রবাহই অচঞ্চল স্থির সত্তার আশ্রয় ভিন্ন সম্ভবই নয়। এই অচঞ্চল স্থির সত্তাই পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম, সর্বেশ্বর। সকল জীব ও জড়র আশ্রয়, আচ্ছাদন। এক কথায় তিনি সকল বস্তুর অন্তরে বাস করছেন। সকল বস্তু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীনে। পরি-চালনাধীনে বর্তমান। সকল কিছুতেই এই আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর দর্শনই মুক্তি। অবিদ্যা প্রসূত শোক তাপ মোহ আদি সংসার ধর্ম থেকে মুক্তি। এই উপলব্ধির আসল তাৎপর্য হলো যখন কারো সমগ্র জগতকেই স্বরূপত ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি ঘটে। এই সত্য উপলব্ধিই জগতের সত্যতারূপ ভ্রম দূর করবে। জগৎ কার্যত মিথ্যা হলে ও সত্য স্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে থাকে বলেই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আত্মা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অবিদ্যাদোষে আত্মার জ্ঞান হয় না। তাদের কাছে অমর, অজর আত্মা আবৃত থাকে। কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুকে আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দর্শন করেন তিনি আত্মপর ভেদ যুক্ত হন। ঈশ উপনিষদেই বলা হয়েছে[২০] যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি, সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। অতার্কিক আত্মজ্ঞানীই কেবল সৃষ্টি বিষয়ক এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাঁর কাছে অব্যক্ত থেকে স্থাবর কোনকিছুই আত্মার

অতিরিক্তরূপে উপস্থিত হয় না। সর্বভূতে তিনি নির্বিশেষ আত্মরূপ দর্শন করেন। তাঁর কাছেই কেবল এই আত্মবিবর্ত তত্ত্ব স্বরূপত উন্মোচিত হয়। এই তত্ত্ব যুক্তিতর্কে নয় কেবল শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের ভিত্তিতেই উপলব্ধি করা যায়।

এইভাবে আমরা দেখলাম যে সৃষ্টিতত্ত্বকে ঘিরে ও সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যে বিপরীতের দ্বন্দ্বই বর্তমান। আমরা উপনিষদ থেকে পরস্পর বিরোধী দুইতত্ত্ব পেলাম। একদিকে ভূতবাদ অপরদিকে আত্মবিবর্তবাদ বা ভাববাদ। অথচ এ পর্যন্ত যে প্রচার তাতে উপনিষদে এক অদ্বৈত তত্ত্বই নানাভাবে আলোচিত। এতদিনের এই প্রচেষ্টা যে ভুল আজ তা প্রমাণিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

মোক্ষ

মোক্ষ বা মুক্তিকে ঘিরে ও অনুরূপ পরস্পর বিরোধী মতবাদ উপনিষদে প্রচলিত। একদিকে অসুর মত অপরদিকে সুর মত বা দেব মত। অসুর মত অনুযায়ী ইহলোকই সত্য। পরলোক বলে কিছু নেই। অতএব মোক্ষ বা মুক্তিকে জড়িয়ে অতিলৌকিক কোন ব্যাপার থাকতেই পারে না। মোক্ষ বা মুক্তি চিন্তা ও একান্তই লৌকিক। এই ইহলোক সুখ-দুঃখ যন্ত্রণার সমাবেশ সর্বস্ব। প্রতিটি বস্তুতেই সুখ-দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে। তাই কোন ব্যক্তির পক্ষে কখনোই অনাবিল সুখ ভোগ সম্ভবই হয় না। দুঃখই জীবনযাপনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তখন জীবন মাত্রেই যন্ত্রণাময় মনে হয়। সেই দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি চায়। এই মুক্তিই মোক্ষ। অতএব দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি অনাবিল সুখ ভোগই মোক্ষ।

অপরপক্ষে সুর মত বা দেব মত সম্পূর্ণ বিপরীত। দেব মতে ইহলোক বলে কার্যত কিছু নেই। এই ইহলোক মিথ্যা বা মায়া মাত্র। পরলোকই একমাত্র সত্য। এই পরলোকই জ্যোতির্লোক। ইহলোক তমস লোক, অন্ধকারই এখানে একমাত্র গতি। এই ইহলোক সকল প্রকার যন্ত্রণার উৎস। সকল প্রকার অজ্ঞান বা অবিদ্যাই ইহলোকের পাথেয়। তাই অজ্ঞান সর্বস্ব মানুষ ইহলোককেই একমাত্র লোক ভেবে শোক-তাপ-যন্ত্রণার চক্রে পতিত হয়ে বার বারই ফিরে ফিরে আসে। এই ইহলোকে জন্মগ্রহণ মানেই পাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। জীবন মাত্রেই অভিশাপ পাপভোগের প্রক্রিয়া। তাই জীবন বা শরীর গ্রহণ মানেই নরক যন্ত্রণা তাই এখান থেকে মৃত্যুই অমৃত। মৃত্যুকালে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা সকল প্রকার পাপকে ত্যাগ করেন। তখনই পরলোকগতি সম্ভব হয়। এই পরলোক প্রাপ্তিই মুক্তি। জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি। এই বন্ধন মুক্তিই মোক্ষ।

যত সহজে আমরা মোক্ষ সম্পর্কে এই পরস্পর বিরোধী মত এখানে উল্লেখ করলাম তত সহজসিদ্ধ আকারে কিন্তু উপনিষদে মোক্ষতত্ত্ব আলোচিত হয়নি। বরং বলা যেতে পারে বৈদিক ধারানুসারী তৎকালীন চিন্তানায়কগণ মোক্ষ নিয়ে খুব কমই চিন্তা করতেন। ঋগ্-বৈদিক যুগে তো মোক্ষ কথাটির উল্লেখই নেই। বরং ইহলোকে ইহজীবনের প্রতি সকল প্রকার অনুরাগই শতকামনার মাধ্যমে বার

বার প্রনিধ্বনিত হয়েছে। ঋগ্ বেদে তাই দেখা যায় সম্পদ কামনাই প্রধান। কারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট কেবলমাত্র অতিরিক্ত সম্পদই লাঘব করতে পারে। তাই মোক্ষ বলতে যদি কোন প্রকার চিন্তা প্রচলিত থেকে থাকতো তো তা সুখ দুঃখ এড়িয়ে সুখ ভোগকেই কোন না কোনভাবে সূচীত করতো। যাই হোক মোক্ষ কথাটির উল্লেখ ও তার অভিনব অর্থ কেবল উপনিষদ যুগে এসেই স্পষ্ট করে পাই। আর উপনিষদ পরবর্তী ধারাস্রোতে দেখি মোক্ষই পরম পুরুষার্থ রূপে চিহ্নিত। আর সকল পরবর্তী চিন্তাবিদই এই অর্থ প্রতিবাদন করতে উপনিষদকেই সূত্র নির্দেশ বলে জাহির করায় চেষ্টা করেছেন। এমনকি উপনিষদেও মোক্ষ সম্পর্কে কোনরূপ অত্যুৎসাহ চোখে পড়ে না। সমগ্র প্রাচীন উপনিষদ খুঁজে মোক্ষ শব্দ পরিবাহী চিন্তাগুলিকে একত্রিত করলেও দেখা যাবে সেখানে কোন অদ্বৈত তত্ত্ব নেই। বরং পরস্পর বিরোধী দ্বৈত মতই কোন না কোনভাবে প্রতিপাদিত। আর তা যে রূঢ় সত্য আলোচনাতেই দেখা যাবে। আমরা দেখতে পাব একদিকে লৌকিক মতবাদ অপরদিকে অতিলৌকিক মতবাদ বা পারলৌকিক মতবাদ পরস্পর পরস্পরে মত সংঘর্ষ করেই এগিয়ে চলেছিল। আমরা এখন তথ্যসহ তারই আলোচনা করব।

মোক্ষ সম্পর্কিত লোকায়ত মত উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত বোধ তুলে ধরতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে মোক্ষ শব্দটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ফলে কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি বিরোধী যে প্রজা সংস্কৃতি সেখানে তার উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ উদ্বৃত্তভোগী শ্রেণীই কষ্টকল্পনায় একদিন এই মোক্ষ সম্পর্কিত তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। ফলে সাধারণে এর প্রভাব তখনি তখনি সম্ভব হয়নি। কারণ প্রতিপক্ষ দর্শন চিন্তায় এই সম্পর্কিত চিন্তার অবকাশই নেই। চিরমুক্তি বা মোক্ষর ধারণা যে কষ্টকল্পনা তাব প্রমাণ তাদের মুখ্য জগৎ তত্ত্বেই বর্তমান। সেই জগৎ তত্ত্ব হলো—অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী। দৃশ্যমান ইহলোকই কেবল বর্তমান। এই ইহলোকের বাহিরে অতীন্দ্রিয়লোক বা পরলোক নেই। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণময় পৃথিবীই জীবনের সূতিকাগার আবার এই পৃথিবীই জীবনের অন্তিমশয্যা। পৃথিবীতে জীবন আমাদের চোখে দেখা শস্যের মত জন্মায় আবার শস্যের মতই জীর্ণ হয়ে পৃথিবীতেই বিলীন হয়।[১] শস্যম্ ইব মর্ত্যঃ পচতে শস্যম্ ইব অজায়তে পুনঃ। মরণশীল যা কিছুই শস্যের মত জন্মায়, আবার শস্যেরই মত জীর্ণ হয়ে ভূতে বিলীন হয়। ভূত থেকেই পুনরায় জন্মায়। জন্ম-মৃত্যুর কেউই ব্যতিক্রম ঘটাতে

সক্ষম নয়। ফলে মৃত্যুর পর মুক্তি বা মোক্ষ হাস্যকর যুক্তি। এই ইহলোক বা পৃথিবী ছাড়া অন্যকোন লোক নেই যা পরলোক বলে চিহ্নিত হবে।

মুক্তি বা মোক্ষ বলতে বরং বলা যাবে যে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি বা মোক্ষ। এই পৃথিবীতে সকল কিছুতেই সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি বিরাজ করে। মানুষের পরম কর্তব্য হলো দুঃখ এড়িয়ে কি করে বেশি সুখ আহরণ করা যায়। কারণ জন্ম মাত্রেই মৃত্যুর গতির দ্বারা নির্ধারিত। কোনভাবেই এই মৃত্যুকে যখন এড়ানো যায় না তখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই সুখ অন্বেষণ পরম কর্তব্য হওয়া উচিত। কারণ এই সুখ লাভই মানুষকে কাজে প্রবৃত্ত করায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে[২] যদা বৈ সুখম্ লভতে অথ করোতি। ন অসুখম্ লব্ধা করোতি। কাজ করার প্রবৃত্তি জাগে তখন যখন কাজের পেছনে সুখের হাতছানি থাকে। যে কাজের পেছনে সুখ নেই সেই কাজ করতে কোন মানুষই চায় না। সুখ তখনই আসে যখন মানুষের আকাঙ্খা চরিতার্থ হয়। যে কাজ মানুষের আকাঙ্খা চরিতার্থ করে সেই কাজই মানুষ করতে উদ্যত হয়। ফলে মানুষের সুখ বোধই মোক্ষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে—কঃ হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রাণাৎ, যৎ এষঃ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাৎ। হৃদয় আকাশে যদি সুখ ভোগের আনন্দ না থাকতো তবে কেই বা এই প্রাণধারণ রূপ নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় মগ্ন থাকতো। ফলে সুখভোগ ও আনন্দানুভূতি মোক্ষলাভের চরম কথা। আর এই সুখভোগ ও আনন্দানুভূতি আনন্দকর কোন কিছু প্রাপ্তি ব্যতিরেকে হয় না। এই প্রাপ্তি ব্যাপারটা সর্বাংশেই লৌকিক। ফলে অতিলৌকিক সুখ বা আনন্দ ব্যাপারটাই অলীক কল্পনা। মিথ্যা প্রবঞ্চনা। লৌকিক বস্তু থেকে সুখলাভের কোন প্রকার সম্ভাবনা থাকলেই মানুষের মনে সেই বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা জাগে। তখন মানুষ সেই বস্তু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। আকাশকুসুম লাভের কেউ চেষ্টা করে না। মনে মনে সুখের কথা ভাবলাম আর সুখ এসে গেল একথা হাস্যকর। কখনো হয় না। অতিলৌকিক অবস্তু আসলে অলীক কল্পনা। অলীক কল্পনায় মানুষ কখনোই কাজে প্রবৃত্ত হয় না। এইভাবে মানুষ সুখলাভের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করে। কারণ যন্ত্রণা বা দুঃখ কোন মানুষই চায় না। যেখানে যত সুখ আছে তার পরিপূর্ণ প্রাপ্তিই মানুষের প্রধান লক্ষ্য। আর পৃথিবীর বুকে এই সুখলাভের ইচ্ছায় মানুষ চিরকাল সুস্থ সবলরূপে বেঁচে থাকার আকাঙ্খা করে। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যুর সঙ্গেই চেতনার বিলুপ্তি ঘটে।

মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি। অতএব দীর্ঘ জীবন

কামনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একথা উপনিষদেও ধ্বনিত হয়েছে। ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে[৩] কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এই সংসারে প্রাণ প্রিয় কর্ম সম্পন্ন করেই মানুষ শত বৎসর বেঁচে থাকার ইচ্ছা করবে। কেননা এই পৃথিবী সর্ব ভূতের মধু। সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুরাজি পরস্পরের উপকারের উৎস। একে অপরের সন্তুষ্টি উৎপাদন করেই পৃথিবীর বস্তুরাজি ধন্য হয়। অসংখ্য মৌমাছি যেমন তিলে তিলে মধু সঞ্চয় করে সকলের সুখ তরান্বিত করে তেমনই অসংখ্য বস্তুরাজি নিজের নিজের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে সকলের সুখ বিধান করেই তৃপ্তি পায়। এই পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, নদ-নদী-সমুদ্র সকলই নিজের নিজের স্বভাব নিয়মেই সকলের সুখ উৎপাদনের নিমিত্তই অনন্তকাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই রয়েছে—ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বানি ভূতানি মধু। অতএব ইহলোক মানুষের আকাঙ্খা। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে তাই কোন মানুষ যেতে চায় না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই বেঁচে থাকার উদগ্র আশা করে। তাই সকল মানুষেরই এই পৃথিবীই লক্ষ্য। এই পৃথিবীর মধু উপভোগই মোক্ষ। দুঃখ এড়িয়ে রূপ-রস-গন্ধে যেখানে যত সুখ বিরাজ করছে তার প্রাপ্তিতেই আনন্দ। সেই যন্ত্রণা মুক্ত আনন্দানুভূতিই মুক্তি। সেই মুক্তিই মোক্ষ। আর তা কেবলমাত্র এই পৃথিবীতেই সম্ভব।

উপরোক্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিকে একসঙ্গে সংগ্রথিত করে ব্যাখ্যা করলেই মুক্তি বা মোক্ষ সম্পর্কে দেবমত বিরোধী অসুর মত পাওয়া যায়। সে মতবাদের মূল কথা হলো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাস্তব ও সত্য। সুখ-দুঃখ, আলো অন্ধকার, আশা-নিরাশা সকল কিছুরই উৎস এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর বুকে জীবন এক মহৎ সৃষ্টি। জীবনকে ঘিরেই যত চাঞ্চল্য। এই যে নদ-নদী প্রবাহিত, এই ফুলপল্লবে শোভিত বৃক্ষরাজি, মন্দ্রিত আকাশ বাতাস, সকলই যেন জীবনকে সুখী করার জন্য। কিন্তু সেই সুখ অনাবিল নয়। দুঃখ বিজড়িত। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাই দুঃখ এড়িয়ে সেই সুখ পরিপূর্ণ মাত্রায় লাভ করা। অতএব সুখলাভই জীবনকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। যেখানে যন্ত্রণা, উপর্যুপরি দুঃখ-কষ্ট সেখানে মানুষ যায় না। সেই ধরনের কর্মে উদ্দীপনা পায় না। তার থেকে বরং শতহস্ত দূরে থাকতে চেষ্টা করে। জীবনের অবধারিত পরিণতি মৃত্যু। শস্যাদির মত ভূতাদি থেকে উৎপন্ন হয়ে পুনরায় ভূতাদিতেই বিলীন হয়। ফলে জীবন যে কোনভাবেই হোক না কেন সীমারেখায় সীমিত। এই সীমিত জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবহারই

মূল লক্ষ্য। কেননা ইহলোক ছাড়া পরলোক নেই। এই জীবন ছাড়া পুনর্জন্ম নেই। অবধারিত মৃত্যু ছাড়িয়ে অমৃত নেই। মৃত্যুতেই চেতনাসহ সকল কিছুরই অবলুপ্তি। অতএব জীবনই অমৃত। মুক্তি বা মোক্ষ এখানেই ইহলোকে সম্ভব। আর সম্ভব এই পৃথিবীর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে। অজ্ঞেয় রহস্যাবৃত প্রকৃতিকে জেনে তার সফল ব্যবহারেই মানুষের পরম সুখ তরান্বিত হতে পারে। সেই পরম সুখানুভূতিই অমৃত। সেই অনাবিল সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগই পরম শান্তির। সেখানেই মুক্তি বা মোক্ষ।

এই মতবাদ একান্তই লৌকিক। বস্তুগত পৃথিবীতেই যেহেতু তার সকল অভিব্যক্তি নিহিত তাই লৌকিক মতবাদ বস্তুসর্বস্ব মতবাদ। আর তা বস্তুবাদ নামেই অভিহিত। আর বস্তুবাদ এই লৌকিক মতবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

অপরপক্ষে দেবমত অতিলৌকিক মতবাদ বা পারলৌকিক মতবাদ হিসাবে খ্যাত। যার মূল তাৎপর্য হলো ইহলোক বলে কোনকিছু নেই। পরলোকই একমাত্র সত্য। আমাদের দৃশ্যমান ইহলোক একপ্রকার বঞ্চনা—মিথ্যা প্রতীতি। আসলে ইহলোক বলে কিছু নেই। এই তত্ত্ব সাধারণে সহজভাবে প্রচার করা অসম্ভব কেননা লৌকিক বিশ্বাস সম্পূর্ণতই ভিন্ন। জনচিত্ত বিপক্ষে গেলে কাকে নিয়েই বা এই মতবাদ গড়ে উঠবে। তাই দেবমত প্রবক্তাগণ অত্যন্ত সংযত মানসিকতায় সহিয়ে সহিয়ে লৌকিক মতবাদকে কেটে ছেঁটে সর্বাংশে গৃহীত কিছু রেখে ঢেকে মূল মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। আর এই প্রচেষ্টা কিভাবে সম্ভব হয়েছে তার উপলব্ধির জন্য আমরা উপনিষদগুলি থেকেই উদ্ধৃতি তুলে ধরে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে[৪]—তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ, পরলোকস্থানং চ। মানুষ মাত্রেই দুই স্থান নির্দিষ্ট। ইহলোক ও পরলোক। ইহলোক মৃত্যুময়, যন্ত্রণার নাগপাশে আবদ্ধ। এখানে রোগ-শোক-দুঃখ-তাপ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে জীবনকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। এককথায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই পাপ। পূর্বজন্মকৃত পাপের অনিবার্য ফলশ্রুতিই এই জীবন। শরীর গ্রহণ মাত্রেই সেই পাপের খাঁচায় আবদ্ধ হওয়া। আর মৃত্যুই সেই পাপ থেকে মুক্তি। মৃত্যুতে এই আত্মা মুক্ত হয়ে পরলোক গমণ করে। তাই মৃত্যুই অমৃত। পরলোকের প্রবেশ দ্বার। এই পরলোকে আত্মা স্বয়ং জ্যোতি হন। [৫]অত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ম্‌জ্যোতিঃ ভবতি। আত্মা নিজের

আলোতেই উদ্ভাসিত হন। অতএব এই দুই স্থান যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোক যে কোন মানুষেরই গতি। মানুষ তার কর্মধারা অনুযায়ী লোকগতিকে ত্বরান্বিত করে। সুকর্মের দ্বারা উর্দ্ধগতি বা পরলোক লাভের পথ উন্মুক্ত করে অথবা কুকর্মের দ্বারা ইহলোকের অবস্থানকে দীর্ঘায়ত করে। এখন সুকর্মই বা কি? কুকর্মই বা কি? কুকর্ম সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এ কথার অর্থ উপলব্ধি করতে গেলে পুনরায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেই উদ্ধৃতি তুলে ধরতে হয়।—স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্‌মভিঃ সংসৃজ্যতে। উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ পাপ্‌মনো বিজহাতি। এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে। পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করে শরীরলাভ করলেই পাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। শরীর ধারণ সময়ে দেহের ইন্দ্রিয় সকল যত রকমের অনিষ্ট সম্ভব তার সঙ্গে যুক্ত হয়। অতএব জন্মগ্রহণের সঙ্গেই তো কুকর্ম সহচর। কুকর্মগুলো কি কি? যেমন ছিমছাম জীবন-যাপন। সুখী জীবনের বাসনা। দীর্ঘ জীবন কামনা ইত্যাদি। আর এই সব কুকর্ম কেবলমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই বিমুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন তাহলে সুকর্ম কি কি? ছিমছাম জীবন যাপনের প্রতি বিতৃষ্ণা। কামনা বাসনার দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যান-নিদিধ্যাসন মননের মাধ্যমে পরমাত্মার জন্য নিবেদিত প্রাণ হওয়া ইত্যাদি। এক কথায় জপ-তপ-আরাধনাই সুকর্ম। এই সুকর্মই মানুষকে ইহলোক থেকে চিরমুক্তি ঘটাতে সক্ষম। এই চিরমুক্তি সম্ভব পরলোক প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই। এখন প্রশ্ন ইহলোক ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল কিন্তু পরলোক সম্পর্কে তো কোন ধারণাই নেই। পরলোক ব্যাপারটাই বা কি তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

এই পরলোক সম্পর্কেও একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে উপনিষদে।[৬] ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং ভবতি। এই পরলোক এমনই এক স্থানে যেখানে সূর্য কখনো কিরণ দেয় না, এমনকি চন্দ্র তারকাও দীপ্তি পায় না। এমনকি আমরা যে বিদ্যুৎ ঝলক দেখে থাকি সেই বিদ্যুৎ ঝলকও সেখানে নেই। অতএব কোন প্রকার অগ্নিরই সেখানে অবস্থান নেই। ফলে অগ্নি কি করে সেখানে দীপ্তি পাবে? এখানে স্পষ্ট করেই বোঝানো হয়েছে যে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, অগ্নি ইত্যাদি দীপ্যমান বস্তুসমূহ ইহলোক সর্বস্ব। এই গ্রহ-তারা জগতের যাবতীয় বস্তুর দিকে উদ্ভাসিত করে। সেই সব সূর্য-চন্দ্র-তারা রাজি কি করে পরলোক উদ্ভাসিত করবে? এখন প্রশ্ন তাহলে পরলোক কি? তা কি ঘন অন্ধকারে আবৃত? এর কোন স্পষ্ট উত্তর না থাকলেও যে ইংগীত সেখানে আছে তা হলো কোন প্রকার

দীপ্তি যদি কিছু থেকে থাকে তো সেই দীপ্তি হলো পরমাত্মার জ্যোতি। এই পরমাত্মা স্বয়ং জ্যোতি। পরলোকের যা কিছুই তাঁরই দীপ্তিতে দীপ্যমান। অর্থাৎ আত্মা সেখানে স্বয়ং জ্যোতি হওয়ায় আপন উদ্ভাসিত আলোকে সকল কিছুই আলোকময় করে তোলেন। ফলে এখানে সকল কিছুই আত্মাময়। আত্মাই এখানে প্রথম এবং আত্মাই এখানে চুড়ান্ত কথা। এখন প্রশ্ন আত্মার জ্যোতিতে পরলোক জ্যোতির্ময় কিন্তু কোন আত্মার কথা এখানে বলা হয়েছে? আমরা যে স-শরীর আত্মাকে জানি, চিনি, সেই আত্মা কি? না কি অন্য কোন আত্মা?

এই প্রশ্নের উত্তর ও উপনিষদে রয়েছে। কঠ উপনিষদেই বলা হয়েছে[৭] অণোঃ অনীয়ান্ মহতঃ মহীয়ান। এই আত্মা অণু পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু থেকেও সূক্ষ্মতর, আকাশ ইত্যাদি মহৎ পদার্থ থেকেও মহত্তর। অর্থাৎ এই আত্মা অণু থেকেও অণুতম, মহৎ থেকেও মহত্তম, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতম কোন কিছু। এখন প্রশ্ন এই কোন কিছুটা কি? কি তার আকার প্রকার? এই প্রশ্নেরও কোন সঠিক উত্তর দেওয়া নেই। তবে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার এই আত্মা স-শরীর নয় অ-শরীর। স-শরীর আত্মা সীমিত, মরণশীল, শরীর প্রভাবিত। প্রিয় ও অপ্রিয় তাড়িত। কিন্তু এই আত্মা অ-শরীর, অসীম, অনন্ত। প্রিয় ও অপ্রিয় কোন কিছুই কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। এই অ-শরীর আত্মাই মহনীয়। জপ-তপ আরাধনার মাধ্যমে এই আত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়। এই আত্মসাধনাই পরলোকে প্রবেশের সিঁড়ি। এই আত্মার উপলব্ধি বেদ পাঠে হয় না। অসংযত বুদ্ধি, বিচারশক্তি কিংবা যুক্তি তর্কের দ্বারা ও উপলব্ধি করা যায় না। বহু লোকের কাছ থেকে শুনে শুনেও এই আত্মার উপলব্ধি করা যায় না। এই সকল উপায় কেবল আত্মার পরোক্ষ জ্ঞান দেয়। অপরোক্ষ অনুভূতি এ সবের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন তবে কি এই পরমাত্মার উপলব্ধি একান্তই অসম্ভব। এর উত্তরে উপনিষদে বলা হয়েছে[৮] দৃশ্যতে তু অগ্র্যা বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়াৎ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। সকলের কাছে এই পরমাত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন না। কেবল সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে নিজের আত্মারূপে দর্শন করেন। এই সূক্ষ্ম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অতি মানস সত্তা সম্পন্ন। মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা জনিত মালিন্য থেকে মুক্ত। এইভাবে কেবল স্বচ্ছ নির্মল ও সত্যদৃষ্টিক্ষম ব্যক্তির কাছেই আত্মা দৃষ্ট হন। এই আত্মা অনন্ত। সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই আত্মাই ভূমা। যাতে অন্যকিছু দেখা যায় না। অন্যকিছু শোনা যায় না। অন্য কিছু জানা যায় না। তিনিই

ভূমা, অসীম, অনন্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান। তার বিপরীতে আর যাতে অন্য কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায় তাই সসীম, অন্ত, নিকৃষ্ট, অল্প। যা অসীম-অনন্ত তাই অমৃত। যা স্বল্প তাই মরণশীল, মৃত। অতএব যা ভূমা তাইই সুখ। অল্পে সুখ নেই, ভূমাই সুখ। উপনিষদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে—[৯] যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাই অনাবিল আনন্দ, অনন্ত সুখের উৎস। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিই অনন্ত সুখের উৎস। সেখানেই চরম মুক্তি বা মোক্ষ। তাই বলা হয়েছে[১০] যো বৈ ভূমা তৎ অমৃতম্। এইভাবে দেখানো হয়েছে যে যা ভূমা, অনন্ত, অসীম তাই অমৃত।

এখন প্রশ্ন এই মোক্ষ বা মুক্তি কিভাবে সম্ভব? এ বিষয়ে আমরা উপনিষদে দেবায়ন ও পিত্রায়ন পথের উল্লেখ দেখেছি। তবে পিত্রায়ন পথের প্রশ্নই আসে না কেননা মুক্তির খোঁজ সেখানে নেই। কেবল দেবায়নের পথেই এই মুক্তি সম্ভব। দেবায়ন পথ অনুযায়ী ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তপস্যার মাধ্যমে যিনি ব্রহ্ম সাধনা করেন তাঁর পক্ষেই কেবল কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চিরমুক্তি ঘটে। পুনর্জন্মের যন্ত্রণা আর কোনকালেই তাকে সহ্য করতে হয় না। ফলে শ্রদ্ধা-ভক্তির দেবায়ন পথই মুক্তির পথ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দেবায়ন পথের ক্রম পর্যায় উপনিষদে চিহ্নিত করা আছে। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে[১১] তপসা চীয়তে ব্রহ্ম। তপস্যা বা মননাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্ম উপচিত হন। শ্রদ্ধামিশ্রিত মননে ব্রহ্ম জ্ঞানের অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধি হয়। যখন কোন ব্যক্তি পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে চায় তখনই তার মধ্যে ব্রহ্মের বিকাশ সম্ভব। মুণ্ডক উপনিষদেই অন্যত্র বলা হয়েছে[১২] প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তলক্ষ্যমুচ্যতে। মুমুক্ষ ব্যক্তির নিকট প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারই ধনু। আত্মাই শর, আর ব্রহ্মই লক্ষ্য। সাধারণ মানুষ অহং বোধে নিজেকে পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু সংসারে আসক্ত চিত্ত হলেও সে পরমাত্মাই। তারও গতি পরমাত্মার দিকে। এখানে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর তারতম্য করা হয়েছে। মুমুক্ষু ব্যক্তি যতখানি লক্ষ্যাভিমুখী অজ্ঞানী ব্যক্তি ততখানি নয়। তাই অজ্ঞানী ব্যক্তির কাল থাকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। স্বীয় ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মায় প্রবেশ করা সকল জীবেরই লক্ষ্য। যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত হয়ে শরের মত তন্ময় সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়। তখন আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়। সকল প্রকার জ্ঞান ও কর্ম ব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্ম থেকে পৃথক স্বতন্ত্র জীবরূপে তাঁর কোন কর্ম ও অনুভূতি থাকে না। এককথায় তখন ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন হয়। জীবাত্মাই তখন দ্রষ্টা,

স্পর্শকর্তা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্তা, আস্বাদনকর্তা, মননকর্তা, বোদ্ধা, কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানাত্মা হন। প্রশ্ন উপনিষদে বলা হয়েছে—স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। সেই মুক্ত জীবাত্মাই সর্বজ্ঞ ও সর্ব স্বরূপ হন। তিনি সকল কিছুর জ্ঞাতা ও সকল বস্তুতেই প্রবেশ করেন। মুক্ত আত্মা নিজেকে ব্রহ্মের একাত্মরূপে অনুভব করে যেমন আমিই অন্ন, আমিই অন্নভোক্তা, আমিই কর্তা, আমিই কর্ম। আমিই মূর্ত ও অমূর্ত পৃথিবীর প্রথম উৎপন্ন এবং ধ্বংসকর্তাও। আমিই স্বয়ং জ্যোতি স্বর্ণ, আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে রয়েছে[১৩] অহম্ অন্নম্ ...অহম্ অন্নাদঃ...অহমস্মি প্রথমজা ঋতা...অমৃতস্য নাভায়ি...স্বর্ণ জ্যোতীঃ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে অতিলৌকিক যে মতবাদ পাই তা হলো ইহলোক নয় পরলোকই মোক্ষ বা মুক্তি। পরলোকেই দিব্য আনন্দ, অনন্ত প্রশান্তি। বিপরীতে ইহলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিষাদময়। পরলোক আনন্দময়, আলোকময়। সাধারণ মানুষ ইহলোককেই প্রার্থনা করে। কেন না তারা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিজ শরীর, ইন্দ্রিয় ভিন্ন কোন কিছুকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতায় জানে যে ইহলোক বঞ্চনাসর্বস্ব যন্ত্রণাময়। জীবন মানেই পাপের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। সাধারণ মানুষ কামনা বাসনার দাস হয়ে জীবন যাপন করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি এই চঞ্চল জগৎ বৈচিত্রের অন্তরালে অচঞ্চল পরম পুরুষকে উপলব্ধি করেন। জগতের উপর তাঁর কোন প্রকার আসক্তি থাকে না। সকলকিছুকেই পরমাত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করে সচ্চিদানন্দ হন। সকল কিছুতেই পরম আনন্দময় সত্তা পরমাত্মাকে দর্শন করেন, এখানেই মোক্ষ, এখানেই মুক্তি। এখানে মুক্ত আত্মা নিজেকেই পরমাত্মা, সকলকিছুর স্রষ্টা 'আমিই ব্রহ্ম' বলে ঘোষণা করে। অতএব মুক্তি বলতে এখানে অনন্ত ও অসীমের উপলব্ধি বোঝাচ্ছে। দিব্য আনন্দের অনুভূতি। মুক্তিই দিব্যানন্দ।

উপনিষদেই দেখা যায় এই মোক্ষকে ঘিরে পরলোকবাদীদেরও পরস্পর বিসম্বাদ করতে। প্রথমোক্ত মতবাদ অনুযায়ী মোক্ষ বা মুক্তি বলতে ঈশ্বরের সমকক্ষ হওয়া। ঈশ্বরের মতো হওয়া। আর দ্বিতীয়োক্ত মতবাদ অনুযায়ী মোক্ষ বা মুক্তি বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়া। অবশ্য উভয়েই পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী। অতি-লৌকিক মতবাদের প্রবক্তা। তবে এই পরস্পর বিসম্বাদ কেন? ইতিপূর্বে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। যা কিছু অলীক কল্পনাশ্রয়ী তাকে তো কোন আঙ্গিকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে কোন নির্দিষ্ট পথ অভিমুখী করাও সুকঠিন। তাই

ফলশ্রুতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। বিভিন্নমুখী ধারায় একই বিষয়কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই ভিন্নমুখী চিন্তার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা যে হয় নি তা নয় কিন্তু ভিন্নমুখী চিন্তা মুছে ফেলা কখনোই সম্ভব হয় নি। তাই একই বেদান্ত চিন্তাকে দেখা যায় অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করতে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে একটি বিষয়ে একমত যে মোক্ষ বা মুক্তি মানে বিশুদ্ধ শূন্যে বিলীন হওয়া নয়। পরলোকে প্রবেশ করা। এইভাবে যে পরলোকের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা সঠিক অর্থে যে কী তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলেও তাকে দিব্য আনন্দ ও স্বপ্রকাশিত জ্যোতিলোক বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই আনন্দ অবশ্যই অলৌকিক, ব্রহ্মানন্দ। লৌকিক আনন্দের মত বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ থেকে জাত নয়। ব্রহ্মানন্দ স্বাভাবিক, স্বপ্রকাশ বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ রহিত। তেমনি পরলোক আবার স্বপ্রকাশিত জ্যোতিলোক। আত্মা এখানে স্বয়ং জ্যোতি। এখানে সূর্য চন্দ্র তারকাদের কোন প্রয়োজন হয় না। এই পরলোকই ব্রহ্মলোক, জ্যোতিলোক।

এই মোক্ষ সম্পর্কিত অতিলৌকিক মতবাদই পরবর্তীকালে ভাববাদ হিসেবে পরিচিত। এই মতবাদের মোক্ষ সম্পর্কিত মূল লক্ষ্য হল অহংকারের অবদমন ও বৈরাগ্যের সাধন। এই বৈরাগ্যসাধনের তিনটি উপায় ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ ও বাণপ্রস্থ। এগুলি আশ্রম নামে অভিহিত। আশ্রম কথাটির সঙ্গে শ্রম বিষয়টি জড়িত। শ্রম সাধ্য প্রচেষ্টায় ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত হলেই সন্ন্যাস পর্যায় আসে। তখন চূড়ান্ত বৈরাগ্য সম্ভব হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—তস্মাৎ এবম্ বিৎ শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানম্ পশ্যতি। তখন মুমুক্ষু ব্যক্তি শান্ত দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে নিজের আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করে। এইভাবে বৈরাগ্য হলো মোক্ষ লাভের পূর্ব শর্ত। এরপর বৃহদারণ্যকে দ্বিতীয় স্তর হিসেবে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। উপযুক্ত গুরুর নিকট বসে শাস্ত্র শোনা হল শ্রবণ। কিন্তু শুধু শ্রবনে কোন গুরুত্ব নেই যদি না তা মনন করা যায়। মনন ও মূল্যহীন যদি তা নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত না হওয়া যায়। তখনই ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করে 'আমিই ব্রহ্ম'। তখনই সে বন্ধন মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ হয়। এইই হোল মুক্তি, মোক্ষ।

এইভাবে অতিলৌকিক মতবাদ বা ভাববাদ যে মোক্ষতত্ত্ব উপস্থিত করেছে পরবর্তীকালে সকল ভাববাদী সম্প্রদায়ই তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের নিজের সম্প্রদায়

অনুযায়ী পরলোক সম্পর্কিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে। এই অতিলৌকিক মতবাদ অনুযায়ী এই পরিদৃশ্যমান ইহলোক যা জগৎ বলে খ্যাত তা নিতান্তই মিথ্যা, অসৎ। ভ্রমজ্ঞানে, অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ ইহলোককেই একমাত্র সৎ বা অস্তিত্বশীল হিসেবে বর্ণনা করে। আসলে ইহলোক নয় পরলোকই একমাত্র সত্য ও অস্তিত্বশীল। মানুষের চরম লক্ষ্য হলো এই পরলোক। এই পরলোকই জ্যোতিলোক। পরমানন্দের আশ্রয়স্থল। সেই পরলোকসাধনাই মানুষের ধ্যান, জ্ঞান হওয়া উচিৎ। পরলোক প্রাপ্তিই চরম মুক্তি, অনাবিল আনন্দ। পুনর্জন্ম আদি সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বন্দ্বের পরিণতি ঃ ভূতবাদ বনাম আত্মসম্ভূতবাদ

উপনিষদ সাহিত্য পরিক্রমায় দেখা গেল সমগ্র উপনিষদ চরম পরিণতি লাভ করেছে দুই বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বে। এই বিপরীতের দ্বন্দ্ব হলো ভূতবাদ বনাম আত্মসম্ভূতবাদ। বৈদিক সাহিত্য শুরুর বিশ্বজিজ্ঞাসা অন্তভাগ উপনিষদে এসে আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণতিলাভ করে। সেই আত্মজিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বমুখর হয়ে ওঠে, পারস্পরিক দ্বন্দ্বে পরিণতি লাভ করে দেহাত্মবাদ ও আত্মবাদ। দেহাত্মবাদ অনুযায়ী চৈতন্য যুক্ত শরীরকে মহনীয় করলেই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। শরীর পরিচর্যাই শ্রেয়োলাভের পথ। ষোলকলা হলো শরীর। এই ষোলকলাযুক্ত শরীরে সমগ্র সৃষ্টিই বিজড়িত। শরীর রহস্যই সৃষ্টি রহস্যের পথ উন্মুক্ত করবে। অপরপক্ষে আত্মবাদ অনুযায়ী অশরীর আত্মাই অমৃত, শ্রেয়োলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। শরীর মাত্রেই শোক-তাপ যুক্ত, মৃত্যু কবলিত। কিন্তু শোক-তাপ-মৃত্যু কোনভাবেই অশরীর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। অশরীর আত্মাই মহনীয়।

উপনিষদে দেহাত্মবাদ উদ্দালক-বিরোচনকে ঘিরে বিবর্তিত হয়েছে। এই দেহাত্মবাদ অনুযায়ী চৈতন্যময় শরীরই আত্মা। দেহ অতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। ভৌতিক উপাদান থেকে যেমন শরীর সৃষ্ট হয় তেমনই উপবস্তু হিসেবে আত্মার ও সৃষ্টি হয়। এ কথা প্রমাণিত সত্য কেননা আত্মা বা চৈতন্যর উপস্থিতি ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ ভৌতিক উপাদানগুলি অবিকৃত থাকে। এখান থেকেই প্রমাণিত যে আত্মা ভূত সম্ভূত। ভূত উপাদানই এইভাবে সকল প্রকার সৃষ্টির উৎস। আর এই ভাবে দেহাত্মবাদ ভূতবাদে এসে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে।

অপরপক্ষে আত্মবাদ যাজ্ঞবল্ক্য-সনৎকুমার প্রতিনিধিত্বে বিবর্তিত হয়েছে। আত্মবাদ অনুযায়ী আত্মাই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য। এই আত্মা কখনোই শরীর সর্বস্ব হতে পারে না। কারণ শরীর জন্ম-মৃত্যু কবলিত। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আত্মা অনদ্ভূত, অনাদি, অনন্ত। দ্বৈত মাত্রেই বিভ্রান্তকারী। আত্মা অদ্বৈত। সকল কিছুই আত্মাময় ভাবিত হলে বিভ্রান্তির কোন সুযোগই

থাকে না। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই আত্মসম্ভূত। এইভাবে আত্মবাদ শেষ পর্যন্ত আত্মসম্ভূত মতবাদে এসে পরিণতি লাভ করেছে।

প্রধান প্রধান সব কটি উপনিষদেই ভূতবাদ কোন না কোন ভাবে উল্লিখিত। তার যাথার্থ প্রতিপালনে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেই যাত্রা শুরু করব। উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য বিতর্কই বৃহদারণ্যক উপনিষদের কেন্দ্রবিন্দু। উদ্দালক ভূতবাদের প্রবক্তা আর যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবাদের প্রবক্তা। বিতর্ক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন উদ্দালককে এক সময় নীরব হয়ে যেতে দেখা যায়। সে কি অনর্থক বিতণ্ডায় যোগ না দেওয়ার জন্য নীরবতা, না রাজশক্তির রোষরূপ অবহিত হয়ে কৌশল হিসেবে নীরবতা পালন করা তা সমাজ ইতিহাসের গবেষকদের গবেষণার কাজ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখানো হয়েছে যে যাজ্ঞবল্ক্য জয়মাল্যগলায় পরে প্রভূত সম্পদ নিয়ে গৃহে ফিরেই তাঁর বিষয় আসক্তিতে বৈরাগ্য প্রকাশ ঘটে তা তিনি দুই স্ত্রীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চান। কিন্তু কাত্যায়নী এই প্রস্তাবে মৌন থাকলেও মৈত্রেয়ী প্রশ্ন তোলেন, এই সম্পত্তিতে তুমি যে কারণে বৈরাগ্য প্রকাশ করছ সেই কারণে আমার ও বৈরাগ্য জন্মানো উচিত। কি প্রকারে তোমার বৈরাগ্য জন্মেছে সেই কারণ আমাকে অবহিত করাও। তোমার কথামত অমৃত সমান আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় রত হন। আর এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় দেখা যায় যে তিনি মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব বিরোধী ভূতবাদের বক্তব্য একসময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। এখানে তিনি উদ্দালকের যুক্তিকে হুবহু তুলে ধরেছেন। সেই উদ্ধৃতি পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। হয়তো পুনরুক্তি হবে তবু তারই উল্লেখ এখানে না করে পারছি না।[১] স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকম্ এব অনুবিলীয়তে ন হ অস্য উদ্‌গ্রহণায় ইব স্যাৎ। যতঃ যতঃ তু আদদীত লবনম্ এব, এবম্ বৈ অরে ইদং মহৎ ভূতম্ অনন্তম্ অপারম্। বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি। যেমন একখণ্ড লবন জলে ফেললে তা সঙ্গে সঙ্গে জলে বিলীন হয়ে যায় তাকে তখন কোনভাবে পৃথক করা যায় না। অথচ পাত্রের যে কোন স্থান থেকে জল নিয়ে আস্বাদন করলে তার লবনাক্ত স্বাদ পাওয়া যায় তেমনই এই অনন্ত অপার মহাভূত। এমনকি বিজ্ঞানময় চৈতন্য ও ভৌতিক উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার সেই ভূতেই বিলীন হয়। মৃত্যুতেই সকলকিছুর পরিসমাপ্তি, মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না। এখানে ভূতবাদের কথা বলা হয়েছে। এই জন্য অনন্ত

মহাভূত থেকে উদ্ভূত। বিনাশকালে আবার অনন্ত মহাভূতেই বিলীন হয়। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। পরমাত্মা বা পরলোক এর প্রশ্ন অতএব আসে না। এই মতবাদ প্রকাশ্যতই ভূতবাদ।

এই ভূতবাদ যে উদ্দালক প্রবর্তিত মতবাদ তা আমরা সমগ্র উপনিষদ সাহিত্য পর্যালোচনা করে পাই। যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধৃতি যে উদ্দালক উক্ত বক্তব্য তার সমর্থনে আমরা এখানে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুত্র শ্বেতকেতুকে আত্মতত্ত্ব বোঝাতে উদ্দালকই বললেন[২] লবনম্ এতৎ উদকে অবধায় অথ মা প্রাতঃ উপসীদথাঃ ইতি। সঃ হ তথা চকার। তম্ হ উবাচ। যৎ দোষাঃ লবনম্ উদকে অবাধাঃ অঙ্গ তৎ আহর ইতি। উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, আত্মতত্ত্ব বুঝতে হলে তোমাকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। নাও এই লবণখণ্ড নিয়ে যাও। জলপূর্ণ পাত্রে ফেল। পরদিন সকালে আমার কাছে এসো। শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ মত কাজ করে পরদিন সকালে এলেন। পিতা তখন শ্বেতকেতুকে বললেন, রাত্রে যে লবণখণ্ড জলে ফেলেছিলে তা নিয়ে এসো। শ্বেতকেতু পাত্রটি নিয়ে এলে উপদেশ দিলেন পাত্রের উপরের দিক থেকে, মাঝখান থেকে এবং নীচের দিক থেকে জল নিয়ে আচমন কর। শ্বেতকেতু তাই করলেন। উদ্দালক জিজ্ঞাসা করলেন কেমন স্বাদ জলের। শ্বেতকেতু বললেন সর্বত্রই লবণাক্ত স্বাদ। এবার উদ্দালক বললেন পাত্রের জল ফেলে দিয়ে পুনরায় এসো। শ্বেতকেতু তাই করল। উদ্দালক এবার বললেন, দেখলে তো লবণ পাত্রের জলের সব জায়গা জুড়েই বিরাজ করছে। এইভাবে জলে দ্রবীভূত লবণ যেমন জলের সবখানেই মিশে থাকে, জল থেকে লবণকে আলাদা করা যায় না সেহ মুহুর্তে তেমনি তুমি দেখতে না পেলেও সৎ স্বরূপ আত্মা রয়েছে দেহমধ্যে। শরীরেই তার অবস্থান।—অত্র বাব কিল সৎ সৌম্য, ন নিভালয়সে অত্র এব কিল ইতি। এই শরীরেই সৎ স্বরূপ আত্মা সর্বদাই বর্তমান, অথচ তুমি তাকে দেখতে পাও না।

এহ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মার স্বরূপ উদ্দালক পুত্রকে বোঝাতে সক্ষম হন। যেমন জলে বিলীন লবণকে চোখে দেখা যায় না বটে, স্পর্শ করে জানা যায় না বটে, কিন্তু উপায়ান্তরে অর্থাৎ অন্য উপায়ে অবশ্যই জানা যায়, অবশ্য সেই উপায় কোন অতিলৌকিক উপায় নয় সেও ইন্দ্রিয় সর্বস্ব উপায়েই যেমন জিহ্বার সাহায্যে তেমনই আত্মাকে ইন্দ্রিয় উপলব্ধিতেই জানা যায়। আবার যেমন লবণ জলে পরিব্যাপ্ত ঠিক তেমনই জগতের মূল কারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান জগতের

সকল প্রকার বস্তুর মধ্যেই বর্তমান। আর তার উপস্থিতি কোন না কোন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা যায়। ঋষি উদ্দালক এই তত্ত্বকে পুনরায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই পুত্রকে বুঝিয়েছেন। তিনি বস্তুজগতের বস্তুকে বিশ্লেষণ করেই দেখিয়েছেন যে জগতের যে কোন বস্তুই ভূতময়। ভৌতিক উপাদানে গঠিত। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার জন্য উদ্দালক ব্যাবহারিক জগতের প্রয়োজন সাধক বস্তু মৃৎপাত্র, স্বর্ণালঙ্কার ও লৌহ নির্মিত অস্ত্র নরুণের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে উদ্ধৃতিটি পুনরায় তুলে ধরছি।[৩] যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্তেব সত্যম্। যে কোন একটি মৃত্তিকা নির্মিত পাত্রকে নেওয়া যাক। যেমন ঘট। ঘটকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঘটের সর্বাংশই মৃত্তিকাময়। যেমন একটি মৃৎপিণ্ড জানলেই সকল মৃন্ময় বস্তুই জানা যায় ঠিক তেমনই জগতের যে কোন জীব বা জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে তার অবিকৃত সত্তা কি হতে পারে তার উপলব্ধি ঘটে। এখানে ঘট কি? ঘট মৃত্তিকার বিকার বা নামরূপ। মূল মৃত্তিকার অংশ হলো ঘট। তেমনই জীব ও জড় জগতের আদি ও অবিকৃত সত্তা হল মহাবস্তু বা মহাভূত। এই মহাভূত থেকেই বিচিত্রময় জগৎ এসেছে। জগতের যে কোন বস্তু বিশ্লেষণ করলেই তা প্রমাণিত হয়। উদ্দালক এইভাবে পর পর কয়েকটি উদাহরণ দেখিয়ে তাঁর ভূতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখন প্রশ্ন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে আত্মবাদ রপ্ত করাতে গিয়ে বিপরীত আত্মতত্ত্ব উল্লেখ করতে গেলেন কেন? মৈত্রেয়ীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান।[৪] সা হ উবাচ মৈত্রেয়ী অত্র এব মা ভগবান অমূমুহৎ ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি। মৈত্রেয়ী বললেন, মৃত্যুর পর চেতনা থাকে না এই তত্ত্বকথা বলে আমাকে বিভ্রান্ত করলেন। জাগতিক মোহ জাগানোর পক্ষে এই যুক্তিই তো যথেষ্ট। তবে তুমি যে বৈরাগ্য নিয়ে কথা বল তা তো সংশয়াতিত নয়? এই বক্তব্য শুধু যে মৈত্রেয়ীকে বিভ্রান্ত করেছে তাই নয় স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যকেও অনুরূপ ব্যতিব্যস্ত করেছে। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন থেকেই এই অবস্থান অনুমেয়।

যাজ্ঞবল্ক্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে মৈত্রেয়ীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন[৫]—সঃ হ উবাচ ন বৈ অরে। অহম্ মোহম্ ব্রবীমি। অলম্ বৈ অরে! ইদং বিজ্ঞানায়। সঙ্গে সঙ্গেই যাজ্ঞবল্ক্য বললেন না না, তোমার মধ্যে মোহ জাগানোর জন্য আমি মোহজনক কথা বলছি না। বিশেষ রূপে আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যই এই বিপরীত দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছি। এখন প্রশ্ন দৃষ্টান্ত হিসেবে হলেও প্রতিপক্ষ

উদ্দালকের মুখের বক্তব্যকেই বা উল্লেখ করতে গেলেন কেন ? তা কি এই জন্যই যে তর্ক যতই নিন্দনীয় হোক না কেন তর্কের প্রয়োজনীয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমান। বিশেষ করে প্রতিবাদী যুক্তি ভিন্ন কোন যুক্তিই ক্ষুরধার হয় না। বাক্যকে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যই বাকোবাক্যের প্রয়োজন। অথচ উপনিষদেই অন্যত্র বাকোবাক্য নিন্দা করা হয়েছে। তাহলে কি প্রয়োজনে স্বীকার আর অপ্রয়োজনে অস্বীকার। এই নীতিই যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। যে কোন কারণেই হোক যাজ্ঞবল্ক্য স্বস্বার্থ প্রতিপাদনে হলেও বিপরীত তত্ত্বকে তুলে ধরে ঐতিহাসিক ভূমিকাই পালন করেছেন।

এখন প্রশ্ন আদিও অবিকৃত মহাভূত কি করে জীব ও জড় জগতের উদ্ভব সম্ভব করে তোলে ? এর উত্তর মৈত্রী উপনিষদে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ভূতময় পৃথিবীর যে কোন প্রকার বস্তু বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই মহাভূতের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে। যে কোন ভূতপদার্থকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ভূতপদার্থ পাঁচ প্রকার। আর প্রতিটি ভূতপদার্থই মহাভূতের অংশ। অতএব মহাভূতও পঞ্চবিধ।—অথ পঞ্চ মহাভূতানি ভূতশব্দে নোচ্যন্তে; অথ তেষাং যৎ সমুদয়ং তৎ শরীরমিত্যুক্তম্। অথ যোহ খলুবাব শরীর ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্। পাঁচ প্রকার মহাভূতই ভূতশব্দে পরিজ্ঞাত। এই পঞ্চ মহাভূতের সমাহারই শরীর। চৈতন্যময় এই শরীরই ভূতাত্মা। অর্থাৎ শরীরে যে চৈতন্য তা পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট উপবস্তু। এই পঞ্চ মহাভূত হলো যথাক্রমে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অগ্নি ও জল। এই পাঁচ প্রকার উপাদান যে কোন বস্তুরই আদি জীব ও জড় জগতের যে কোন বস্তুকেই বিশ্লেষণ করলে এই পাঁচ প্রকার ভৌতিক উপাদান পাওয়া যাবে। এই পঞ্চ মহাভূতের জ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ পরীক্ষিত সত্য। এইভাবে ভূতবাদের মূল কথা হলো—অভিজ্ঞতা লব্ধ পঞ্চবিধ ভৌতিক উপাদান সমন্বিত মহাভূতই সত্য। এই মহাভূত অনন্ত ও অপার। এখান থেকেই জগতের উৎপত্তি। আবার এই মহাভূতেই সকল কিছু বিলীন হয়। এই জীব ও জড় জগতের সৃষ্টির কারণ হিসেবে অতএব কোন অতীন্দ্রিয় অতিলৌকিক সত্তার কল্পনা নিরর্থক। কেননা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা কারণ অকারণ উপলব্ধি করতে পারি। অলৌকিক কল্পনার তাই অবকাশ কোথায় ?

এই ভূতবাদের বিপরীত তত্ত্ব হলো আত্মসম্ভূতবাদ। আত্মসম্ভূতবাদ অনুযায়ী আদিতে শুধু আত্মা ছিল। আর কোন কিছুরই কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না।[৬]

আত্মা এব ইদম অগ্র আসীৎ। আত্মা ব্যাতিরেকে এই জগৎ-সংসার বলে কিছু ছিল না। এখন প্রশ্ন তাহলে তখন পৃথিবী কি অবস্থায় ছিল বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাও স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে মৃত্যু দ্বারা সকল কিছুই আবৃত ছিল। কিন্তু এই অবস্থায় থেকে আত্মা হাঁপিয়ে উঠলেন। তখন চিন্তা করলেন, এই অবস্থা আর নয়, আমি এক আছি বহু হবো। আর যেই চিন্তা সেই অনুযায়ী তিনি দ্বিতীয় হলেন। আবার দ্বিতীয় থেকে হলেন তৃতীয় এইভাবে বহু। এ নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বেই রেখেছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে একটু লৌকিক করে এই ব্যাখ্যা সংযোজিত।[৭] তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ : সম্ভূতঃ আকাশদ্বায়ুঃ বায়োরাগ্নিঃ। আগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। সেই আত্মা থেকেই আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। আকাশ থেকে বায়ু। বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি। এইভাবে এই বিশ্ব হল সৃষ্টি আত্মা হলো স্রষ্টা। এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কিন্তু এই আত্মা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হলেও আত্মাকে শরীরের সঙ্গে একইরূপে দেখা সংগত নয়। কারণ আত্মা কখনোই শরীর হতে পারে না। শরীরমাত্রই জন্মমৃত্যু কবলিত। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আত্মা অনদ্ভূত, অনাদি, অনন্ত। আত্মা অদ্বৈত। যা কিছু দ্বৈত তাই বিভ্রান্তকারী। কিন্তু যখনই সকল কিছু আত্মাময় ভাবিত হয় তখন বিভ্রান্তির কোন সুযোগ থাকে না।[৮] যত্র তু অস্য সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ। তৎ কেন কম্ জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কম্ রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃনুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কম্ স্পৃশ্যে, তৎ কেন কম বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। যেখানেই দ্বৈতভাব রয়েছে সেখানে একে অপরকে দেখে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কথপোকথন করে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, স্পর্শ করে এবং জানে। কিন্তু সবই যখন অদ্বৈত, একাত্ম হয়ে যায় তখন কি দিয়ে কে কাকে দেখবে, আঘ্রাণ করবে আস্বাদন করবে এবং জানবে? অর্থাৎ আত্মাতেই যখন সকল কিছু লীন তখন পৃথক কোন সত্তার উপলব্ধি ঘটতে পারে না। এই আত্মাই একমাত্র সৎ, একমাত্র সত্য। তার অতিরিক্ত সকল কিছুই মিথ্যা। কিন্তু অজ্ঞানপ্রভাবিত মানুষ শরীরকেই আত্মা বলে ভুল করে। লোকায়ত মতে আত্মাই দেহ, আত্মাই মন, আত্মাই প্রাণ ইত্যাদি। কিন্তু যা সত্য চূড়ান্ত সৎ তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভিন্নতামাত্রই স্ববিরোধী। যা স্ববিরোধী তা কখনো আদি কারণ বা তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। রূপ

মাত্রই স্ববিরোধী। ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। আত্মা কখনোই নামরূপের স্বরূপ হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন তাহলে আত্মা কি? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মা সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় 'নেতি নেতি' এই প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করেছেন। 'নেতি নেতি' হলো নঞর্থক বর্ণনা। এটা নয় ওটা নয় ইত্যাদি। গার্গীকে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যায় যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন তিনি স্থূল নন, অনু নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, স্নেহবস্তু নন, ছায়া নন, তমঃ নন বায়ু নন, আকাশ নন ইত্যাদি। তাহলে আত্মা কি?[৯] স এষ নেতি নেত্যাত্মাহ গৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—শীর্যো ন হি শীর্যতেহসঙ্গো ন হি সহ্যতেহাসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। যাকে নেতি নেতি বলা হয় তিনিই সেই আত্মা। তিনি অগ্রহনীয় কারণ তিনি গৃহীত হন না। তিনি অক্ষয় কারণ তাঁর ক্ষয় নাই। তিনি অসঙ্গ, কারণ তাঁর আসক্তি নেই। তিনি বদ্ধ নন, অতএব তাঁর ব্যথা নেই। বিনাশ নেই।

ঠিক অনুরূপ নঞর্থক বর্ণনা কঠ উপনিষদে ও বর্তমান।[১০] অশব্দমস্পর্শম্ রূপমব্যয়ম্ তথারসম্ নিত্যম্ গন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য। আত্মা হলেন তিনি যিনি অশব্দ। অস্পর্শ অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য মহতত্ত্ব থেকে শ্রেষ্ঠ। আত্মার এই নঙর্থক ব্যাখ্যায় এক জায়গায় এসে থামতে হয়। কারণ নঙর্থক বর্ণনা তো অনন্ত হতে পারে না তাহলে তো তা নঞর্থক দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। আত্মা কখনোই তেমন কোন দুষ্ট হতে পারেন না। ফলে অনিবার্যভাবেই যা সত্য তা হলো যে আত্মার এই নঙর্থক ব্যাখ্যায় অবশ্যই এক জায়গায় এসে থামতে হয়। সেই থামার জায়গাটি হলো—যে এটা নয়, ওটা নয় বলে সকল কিছুকেই অস্বীকার করা যায় কিন্তু এই যে আমি যে চিন্তা করছে একে কি কোনভাবে অস্বীকার করা যায়? নিশ্চয়ই যায় না। এই স্বাক্ষাৎ জ্ঞান চেতন সত্তাই আত্মা। তাহলে আত্মা কি? এর একটিই উত্তর উপনিষদ জুড়ে যা রয়েছে তা হলো[১১] যো হয়ং বিজ্ঞানময়। আত্মা হলেন তিনি যিনি বিজ্ঞান ময়। এইভাবে উপনিষদ সাহিত্যে আত্মাকে ঘিরে যে নঙর্থক বর্ণনা চলছিল তার ইতি ঘটিয়ে আত্মসম্ভুতবাদীরা সদর্থক সিদ্ধান্তে এলেন যে আত্মা চেতন সত্তা। চেতনাময়। সৃষ্টির পূর্বে আদিতে এই আত্মা ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়রূপে সর্বদা বিরাজ করতেন। প্রায় সব কটি উপনিষদেই এই কথাটিই বার বার ধ্বনিত হয়েছে[১২] অবসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। আদিতে কেবল আত্মাই এক ও অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ-

করছিল। কঠ উপনিষদে আরো স্পষ্ট করেই বলা আছে যে আদিতে এই আত্মা ছাড়া কোনকিছুই ছিল না।[১৩] নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এখানে এক আত্মা ভিন্ন কোন নানা ছিল না। জগৎ সংসার কোন কিছুই ছিল না। এই যে সমাজ সংসার, জগৎ বৈচিত্র্য সকল কিছুই আত্মাতেই লীন ছিল। একাকিত্ব পীড়াদায়ক হওয়ায় এক সময় এক আত্মাই চিন্তা করলেন বহু হবো। এইভাবে ক্রমশ এক আত্মাই বহু হয়েছেন। এই আত্মার অস্তিত্ব সর্বদাই সকল কিছুতে বিরাজ করছে। তাই আত্মসম্ভূতবাদ অনুযায়ী—আত্মৈবেদং সর্বম্। সকল কিছুই আত্মাময় জেনো। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্থ সাধারণ মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সকল কিছুতে যে আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান তা বুঝতে সক্ষম হয় না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে আত্মা স্বরূপেই প্রকাশিত। কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিই সকল কিছুতেই আত্মাকে উপলব্ধি করেন।

এই আত্মজ্ঞানই হলো পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আত্মসম্ভূতবাদ অনুযায়ী এক আত্মাকে জানলেই সকল প্রকার দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। ঈশ উপনিষদে স্পষ্ট করেই বলা আছে—যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি। যে বা যিনি সর্বভূতে নির্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন তাঁর কাছেই কেবল আত্মতত্ত্ব স্বরূপে উন্মোচিত হয়। তিনি নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মারূপে উপলব্ধি করেন। তখন তাঁর কাছে আত্মার ভেদ থাকে না। এই আত্ম উপলব্ধিই জগতের সত্যতা রূপ ভ্রম দূর করে।

আত্মা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অবিদ্যাদোষে লোক সাধারণের আত্মার জ্ঞান হয় না। তাদের কাছে অজর, অমর আত্মা আবৃত থাকে। কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুকে আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দর্শন করেন তিনিই আত্মদর্শী। তিনিই একমাত্র জানেন এই আত্মার জন্মও নেই বিনাশও নেই। এই আত্মা সকল কিছুর কারণ হলেও তিনি নিজে কোন কিছুর সৃষ্টির মাধ্যম নন। আত্মা কোন কিছুকে জন্ম দেয় না। তাঁর ইচ্ছাতে ভান সৃষ্টি হয়। এই ভানই জগৎ বৈচিত্র। ফলে তিনি নিজে থেকে কোন কিছু করেন না। তিনি সর্বদাই একরূপ। নিরাকার। তাঁর হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই। এই আত্মা অপরিবর্তনীয়. শাশ্বত পুরাতন অথচ চির নবীন। তিনি সর্বত্র বিরাজিত।

শরীর মধ্যস্ত আত্মায়ও তিনি বিরাজমান। কিন্তু শরীর দ্বারা কোনভাবে আশ্লিষ্ট নন। তিনি শরীর অতিরিক্ত। তাই শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। কঠ উপনিষদ থেকে এখানে একটি স্পষ্ট উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। সেখানে

বলা আছে[১৪]—ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। এই আত্মা কোন কারণ সম্ভূতও নয় এমনকি আত্মা থেকেও কোনকিছু উৎপন্ন হয় নি। এই আত্মা অজর অমর, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর কোনভাবে নিহত হলেও তাঁর বিনাশ কখনোই হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, এই অজর অমর আত্মাই অন্তর্যামী। এই আত্মাই অমৃত।[১৫] আত্মান্তর্যামী অমৃতঃ। এই আত্মাকে আমরা দেখি না কিন্তু তিনি দ্রষ্টা। তিনি অশ্রুত কিন্তু শ্রোতা। তাঁকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি সকলের মনন কর্তা। তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা।

এইভাবে আত্মসম্ভূতবাদ অনুযায়ী আত্মাই সকল কিছুর মূল উৎস। কিন্তু আত্মা নিজে অকারণ কারণ, অমূল মূল। এই আত্মা অজোভাগ। দেবরাজ ইন্দ্র এই আত্মতত্ত্বই দেবলোকে প্রচার করেছিলেন। এই আত্মসম্ভূতবাদই স্থূর উপনিষদরূপে চিহ্নিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ

এই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য কি ? এই নিয়েও উপনিষদে পরস্পর বিরোধী মতবাদ বর্তমান। এই পরস্পর বিরোধী মতবাদ যথাক্রমে ভূতবাদ ও আত্মসম্ভূতবাদ। কিন্তু কেবলমাত্র এই দুই বিপরীত মতবাদ যে উপনিষদে উল্লেখিত, তা নয়। নানান বিরুদ্ধমত এক সময় প্রচলিত ছিল। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে এমনি নানান মতবাদ উল্লিখিত।[১] কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। কালবাদ, স্বভাববাদ, নিয়তিবাদ, যদৃচ্ছাবাদ, ভূতবাদ, প্রকৃতি বা প্রধানবাদ, পুরুষ বা আত্মবাদ ইত্যাদি। কিন্তু একে একে এই সব মতবাদ শেষ পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী দুই মতবাদে এসে পরিণতি লাভ করে একদিকে ভূতবাদ ও অপরদিকে আত্মসম্ভূতবাদ। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি ভূতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন উদ্দালক আর আত্মসম্ভূতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য।

ভূতবাদ ইতিপূর্বেই আলোচিত। যার মূলকথা হল এই বিশ্বচরাচর অপার, অনন্ত মহাভূত উদ্ভূত। চেতন ও অচেতন, জীব ও জড় জগৎ এই মহাভূত থেকে উত্থিত হয়ে পরিশেষে এই মহাভূতেই বিলীন হয়। এখন প্রশ্ন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে মহাভূত উদ্ভূত তার প্রমাণ কি ? এ কি কেবলই অনুমান না কষ্টকল্পনা ? এর উত্তর ও উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্তমান। ঋষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে ভূতবাদ বোঝাতে গিয়ে বস্তু জগতের বস্তুকে বিশ্লেষণ করেই দেখিয়েছেন যে জগতের বস্তুমাত্রেই ভূতময়। তিনি ঘট অর্থাৎ মৃৎ পাত্র, থেকে শুরু করে স্বর্ণালঙ্কার, লৌহ নির্মিত বস্তু সকল কিছুকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এ সকলই ভৌতিক উপাদানে গঠিত। আর এইভাবে প্রমাণ করেছেন যে যেকোন মৃৎপাত্র বিশ্লেষণ করে যেমন তার অবিকৃত সত্তা মৃৎপিণ্ডের উপলব্ধি ঘটে, তেমন সকল বস্তুবিষয়ের অন্তরালে বিশ্লেষণের পর্যায়ে তার অবিকৃত সত্তার উপলব্ধি ঘটে। মৃৎপিণ্ড জানলে যেমন সকল মৃন্ময় বস্তুই জানা যায় তেমনই আদি উপাদানের উপলব্ধি ঘটলেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে মহাভূত ও জানা যাবে। ফলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে মহাভূত উদ্ভূত তা কোন অনুমান বা কষ্টকল্পনা নয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত সত্য। এমন কি শুধু অচেতন জড় নয়, এমন কি চেতন

জীব ও এই মহাভূত উদ্ভূত। এই মহাভূত পঞ্চবিধ। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অগ্নি ও জল। এরাই একত্র মিলিত হয়ে বিশ্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এই সকল ভূত উপাদানের সমুদয়ই হল শরীর। মৈত্রী উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাষায়ই বলা হয়েছে—অথ যোহ খলুবাব শরীর ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্। অর্থাৎ পাঁচ প্রকার ভূত উপাদানে যে শরীর গঠিত, আর সেই শরীরে যে চৈতন্যের আগম হয় তাও অনুরূপভাবে ভূত উদ্ভূত। এই জীব শরীরই ভূতাত্মা। অর্থাৎ আত্মা বা চেতন সত্তাও মহাভূত থেকে কোন না কোনভাবে উদ্ভূত। তা পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্যই বলা হয়েছে ভূতাত্মা। ভূতাত্মা কথার অর্থ ভূত থেকে উদ্ভূত আত্মা। অর্থাৎ ভূতাত্মা কথার স্পষ্ট নির্দেশ হল ভূত চৈতন্যবাদ। উপনিষদ পরবর্তী যুগে এই ভূতচৈতন্যবাদ সম্পর্কে আমরা সবিশেষ অবগত হই যখন চার্বাক দার্শনিকগণ সাধারণের ব্যবহারিক জগতের উদাহরণ তুলে ধরে ভূতচৈতন্যবাদের সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর চিন্তার অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। বিশেষ করে যখন পান, সুপুরী, চুন ও মদশক্তির উদাহরণ তুলে ধরেন। এইভাবে ভূতবাদ প্রমাণ করে যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলেই তার আদি উপাদান যে পঞ্চ মহাভূত তার উপলব্ধি ঘটবে। আর এই মহাভূতের জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

উপনিষদে বর্ণিত এই ভূতবাদ অত্যন্ত প্রারম্ভিক আকারে হলে ও আজকের বিকশিত বস্তুবাদের সঙ্গে তুলনীয়। ইংরেজী মেটিরিয়ালিজম কথার প্রচলিত বাংলা হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদের মূল কথা হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস হল বস্তু বা ম্যাটার। বস্তুই যে শুধু জড় জগতের উৎস তাই নয় জীব জগতের উৎস ও। অতএব বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তু আগে, চেতনা, বস্তু উদ্ভূত উপবস্তু। আজকের বিকশিত বস্তুবাদের সঙ্গে কোনভাবে তুলনা করা না গেলে ও বস্তুবাদের যে সূত্র অর্থ অন্তত সেই অর্থ অনুযায়ী ভূতবাদকে অবশ্যই বস্তুবাদ বলে চিহ্নিত করা যাবে। কেন না ভূতবাদের সূত্রকথা ও হল একই।[২] ইদং মহদ্ভূতমনন্তপারং বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যোঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অপার, অনন্ত মহাভূত। মহাভূত বলতে এখানে যে অনন্ত বস্তুপুঞ্জ তাকেই বোঝানো হচ্ছে। যে বস্তুপুঞ্জ জড় ও চেতনের সমন্বয়। এই জড় ও চেতন সমন্বিত মহাবিশ্ব মহাভূত থেকেই উদ্ভূত। জড় প্রকৃতি যেমন মহাভূত থেকে সৃষ্ট তেমনই চেতন শরীর ও মহাভূত থেকে সৃষ্ট। চেতনা শরীরকে আশ্রয় করেই থাকে। শরীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চেতনার উদ্ভব হয়। শরীরের

বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চেতনার ও বিলুপ্তি ঘটে। অতএব চেতনা মাত্রেই মূর্ত্ত চেতনা। বিমূর্ত্ত চেতনা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। এখানে ভূতবাদ অনুযায়ী ভূতপদার্থই আদি অকৃত্রিম একমাত্র উপাদান। চেতনা ভূত উদ্ভূত উপবস্তু। আগে ভূত পরে ভূতাত্মা। ফলে উপনিষদের বিপরীত মত সংঘর্ষের ভূতবাদ অবশ্যই বস্তুবাদ।

তাছাড়া বস্তুবাদ অস্তিত্বশীল বস্তুপ্রকৃতিকেই একমাত্র স্বীকৃতি দেয়। ভূতবাদ অনুযায়ী ইহলোকই একমাত্র সত্য, পরলোক বলে কোন কিছুর অস্তিত্বকেই কখনোই স্বীকার করে না। উপনিষদের স্পষ্ট ঘোষণা[৩] অয়ং লোকঃ, নাস্তি পর ইতি মানী। অতএব পরলোককে জড়িয়ে যা কিছু যেমন পুনর্জন্ম। স্বর্গপ্রাপ্তি, পরমেশ্বর ইত্যাদি ভিত্তিহীন কল্পনা ভূতবাদে চরম নিন্দিত। বস্তুবাদ অনুযায়ীও অনুরূপভাবে যুক্তিহীন উদ্ভট কল্পনা সবৈব বর্জনীয়। বস্তুবাদে জন্মান্তরবাদ. স্বর্গ, ঈশ্বর ইত্যাদির কোন স্থান নেই। এইভাবে ভূতবাদ সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভূত উপাদানকে চিহ্নিত করে অতীন্দ্রিয় অতিলৌকিক সত্তার কল্পনা নিরর্থক ঘোষণা করে বস্তুবাদের ভিত গড়ে তুলেছে ভারতীয় দর্শনে। শুধু যে বস্তুবাদের ভিতই গডে তুলেছে তাই নয় সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তির অবতারণা করে বিপক্ষীয় মতবাদকে খণ্ডনও করেছে।

ভূতবাদের বিপরীত তত্ত্ব হল আত্মসম্ভূতবাদ। আত্মসম্ভূতবাদ অনুযায়ী আদিতে শুধু আত্মা ছিল।[৪] আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ। এই আত্মা বলতে এখানে নিরাকার বিশুদ্ধ চৈতন্য বলা হয়েছে। এককথায় নিরাকার চিন্তা বা চেতনাই আদিতে বর্তমান ছিল। এই জগত সংসার বলে কোন কিছুই ছিল না। মৃত্যুদ্বারা সকলই আবৃত ছিল। তখন আত্মা চিন্তা করল যে আমি এক আছি বহু হব।[৫] তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরাগ্নিঃ। আগ্নেরাপঃ। আদ্ভ্য পৃথিবী। সেই আত্মা থেকেই আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি। এইভাবে এই বিশ্ব হল সৃষ্টি। আত্মন্ হল স্রষ্টা। এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। সকল দেহে একই আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থান করছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মাই ব্রহ্ম। যদিও আত্মা ও ব্রহ্মকে নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক বর্তমান কিন্তু উপনিষদে যে আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে একইভূত করার চেষ্টা ছিল, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে[৬]—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

তজ্জলানিতি। এই বিশ্ব ব্রহ্মময়। ব্রহ্মকে এখানে 'তজ্জলান' বলা হয়েছে। 'তৎ' অর্থে তিনি, 'জ' অর্থে জগতের জন্ম দেন, 'লি' অর্থে তাঁর মধ্যেই জগত লয় পায়। আর 'অন' অর্থে তিনিই জগত ধারণ করেন। এখানে আত্মন্ বা ব্রহ্মণকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহার কর্ত্তারূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঈশ উপনিষদেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে[৭]—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। পৃথিবীতে যা কিছুই, অনিত্য চরাচর অর্থাৎ বিকারী বস্তু সমূহ পরমাত্মার দ্বারা আচ্ছাদিত। এই জগৎ গতিশীল, চলমান কিন্তু অচল সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। এই অচঞ্চল স্থির সত্তা ভিন্ন জগতের চঞ্চল প্রবাহ সম্ভবই হত না। এই অচঞ্চল সত্তাই আত্মা, ঈশ্বর। তিনিই সমগ্র জগতকে আচ্ছাদন করে আছেন। সকল বস্তুর অন্তরে তিনিই বাস করছেন। সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। সর্বভূতে এই আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বরদর্শনই পরিজ্ঞান বা মুক্তি। এই উপলব্ধি হল—সমগ্র জগতই স্বরূপত ব্রহ্ম। এই সত্য উপলব্ধির ফলে জগতের সত্যতারূপ ভ্রম দূরীভূত হবে। আত্মা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অবিদ্যাদোষে আত্মার জ্ঞান হয় না। তাদের কাছে অজর, অমর আত্মা আবৃত থাকে। এইভাবে যিনি সমুদয় বস্তুকে আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দর্শন করেন তিনি আত্মার ভেদমুক্ত হন।[৮] যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। পরাবিদ্যার অধিকারী জ্ঞানী নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মারূপে উপলব্ধি করেন। তখন তাঁর কাছে আত্মার ভেদ থাকে না। নিন্দা বা স্তুতিকে তিনি সমান জ্ঞান করেন। তাঁর কাছে অব্যক্ত থেকে স্থাবর কোনকিছুই আত্মার অতিরিক্তরূপে উপস্থিত হয় না। সকলই আত্মবিবর্তরূপে উপলব্ধি হয়। আত্মা ভিন্ন কোন পৃথক সত্তা নেই। এইভাবে তিনি সর্বভূতে নির্বিশেষ আত্মভাব দর্শন করেন। তাঁর কাছেই কেবল আত্মসম্ভূততত্ত্ব উন্মোচিত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই জগৎ যে আত্মারই অখণ্ড প্রকাশ তার কি কোন প্রমাণ আছে? অর্থাৎ আত্মাই যে আদি কারণ তার সমর্থনে কি কোন বিশ্লেষিত তথ্য আছে? এর উত্তরে উপনিষদের ঋষিগণ বলেন কোন প্রকার যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে কখনোই উপলব্ধি করা যায় না। কেবলমাত্র অচলা বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার মাধ্যমেই এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। কঠ উপনিষদে স্পষ্ট নির্দেশ করা আছে যে[৯]—নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। তর্কের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা

কথনোই সম্ভব নয়। অতার্কিক আত্মজ্ঞানীই কেবল সৃষ্টিবিষয়ক এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

এইভাবে আত্মসম্ভূতবাদ যে সৃষ্টিতত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যা করেছে তা একান্তই বিশ্বাস নির্ভর। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগতকে এখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। একমাত্র অতীন্দ্রিয় পরলোকই সত্য। ইহলোক মিথ্যা। কারণ ইহলোক নামরূপ সর্বস্ব। যাই নামরূপ তাই স্ববিরোধী। যা স্ববিরোধী তা কথনোই চূড়ান্ত সত্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে না। অতীন্দ্রিয় পরলোক নামরূপ রহিত। তাই স্ববিরোধী হওয়ার কোন অবকাশই নেই। আসলে সৃষ্টির ব্যাপারটাই বঞ্চনাময়। মিথ্যাদৃষ্টি। অবিদ্যা প্রভাবিত মানুষ আত্মার প্রকাশকে সৃষ্টিরূপে মিথ্যা দর্শন করে। চূড়ান্ত সত্যতার দিক থেকে সকলই মিথ্যা। এই যথার্থ সত্য কেবল আত্মজ্ঞানীর নিকটই উদ্ভাষিত।

এই আত্মসম্ভূতবাদই পরবর্তীকালে দর্শন চিন্তার ইতিহাসে ভাববাদ বলে চিহ্নিত। আত্মসম্ভূতবাদ অনুযায়ী আদিতে কেবল আত্মাই ছিল। মূর্ত আত্মা নয় বিমূর্ত আত্মরূপে অবস্থান করছিল। এই বিমূর্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে চিহ্নিত। বিশুদ্ধ চৈতন্য অর্থে নিরাকার চিন্তা। এই নিরাকার চিন্তা বা চেতনারই আরেক নাম ভাব বা ধারণা। তাই আত্মসম্ভূতবাদ কালে কালে ভাববাদ রূপে চিহ্নিত। সমগ্র ভাববাদের যে ইতিহাস তাতে সকল বিদ্বানই সৃষ্টির আদি উৎস হিসেবে কোন না কোন ভাবে আত্মা, চিন্তা, ধারণা, মন বা ভাবকেই চিহ্নিত করেছেন। উপনিষদের আত্মসম্ভূতবাদ সম্পূর্ণরূপে যেহেতু তারই কোন একটিকেই উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছে তাই স্পষ্টরূপেই ভাববাদের আঙ্গিকবাহী। উপনিষদ কথিত ভাববাদ কোন অংশেই পাশ্চাত্যদর্শনের প্রচারিত বার্কলে, ব্রাডলে, হেগেল কথিত ভাববাদের থেকে ভিন্ন নয়। এই যাজ্ঞবল্ক্য প্রদর্শিত পথ ধরেই শঙ্কর পরবর্তীকালে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন বা চূড়ান্ত ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপনিষদ ও ভারতীয় দর্শন

উপনিষদ সম্পর্কে আমাদের এতকাল বোঝানো হয়েছে যে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যই উপনিষদের সারবস্তু। একথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সকল তত্ত্বই আত্মতত্ত্বে এসে লীন হয়ে গেছে। অথচ এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে সমগ্র উপনিষদই বিপরীত মত সংঘর্ষের দ্বন্দ্বসর্বস্ব বিকাশ। একদিকে ভূতবাদ অপরদিকে আত্মসম্ভূতবাদ যথাক্রমে বস্তুবাদ ও ভাববাদ নিরন্তর বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই পরিপুষ্টিলাভ করেছে। অবশ্য এই উপরিকাঠামোর দ্বন্দ্ব আসলে পরিকাঠামোর দ্বন্দ্বেরই বিকাশমান দিক। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যদি ও তা আর একবার স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই। সমাজ কাঠামোয় যে সংঘর্ষ ছিল তা উপনিষদ সাহিত্যেও উল্লেখিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি।

দ্বয়া হ বা প্রাজাপত্যা দেবাঃ চ অসুরাঃ চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষু অস্পর্ধন্ত। তে হ দেবাঃ উচুঃ—হন্ত যজ্ঞে উদ্গীথেন অসুরান্ অত্যায়াম ইতি। প্রজাপতির দুই সন্তান দেবতা ও অসুর। দেবতারা অল্পসংখ্যক। অসুরেরা অধিক সংখ্যক। লোক অধিকারের জন্য অর্থাৎ পৃথিবীতে আধিপত্য লাভ করার জন্য তাঁরা পরস্পর সংঘর্ষে রত ছিলেন। এরপর দেবতারা বললেন শুধু আধিপত্যলাভের সংঘর্ষে জয়ী হওয়া নয় স্থায়ী কর্তৃত্বের জন্য উদগীথ দ্বারা ও অসুরদের অতিক্রম করব। এই উদ্ধৃতিতে দেবতার গোপন ইচ্ছা প্রকাশিত। শুধু ভূমি ও লোকের অধিকারের সংঘর্ষে শক্তির ভারসাম্য বদল ঘটানো যেতে পারে কিন্তু লোকমানসকে জয় করা কখনোই সম্ভব নয়।

অসুরেরা এ বিষয়ে পারদর্শী ওরা জনচিত্তজয়ী কথায় লোক সাধারণকে বশ করে ফেলে। ফলে চিরস্থায়ী শাসন বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই পশুশক্তি কোনদিনই শক্তির একমাত্র উৎস হতে পারে না। তার সঙ্গে মনোজগৎ জয়ের কায়দা ও রপ্ত করতে হবে। এই চিন্তা থেকেই দেবতারা তাঁদের নিজস্ব মতবাদ গড়ে তোলার দিকে তৎপর হন। সেকথার প্রমাণ এই উদ্ধৃতি থেকেই পাঠক সাধারণ উপলব্ধি করতে পারছেন। এইভাবে আমরা প্রমাণ পাই একদিন কিভাবে আর্য-

সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেবতা-দানব, সুর-অসুরের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়। এখন প্রশ্ন এই দেবতাও দানব, সুর ও অসুরেরা কারা? এদের আসল পরিচয়ই বা কি? এই বিষয়টিও স্পষ্ট উপলব্ধির জন্য আমরা স্বামী গম্ভীরানন্দের ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরব!

তিনি তাঁর উপনিষদ গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন "বৃঃ ১/২/৩ এর প্রথম টীকায় বলা হইয়াছে যে, অশ্বমেধ কর্ম বা উপাসনার ফলে যজমান প্রজাপতিত্বলাভ করেন। মূলের "হ" অব্যয়টি বর্তমান প্রজাপতির পূর্বজন্মের কথাই স্মরণ করাইতেছে। এইজন্মে যখন প্রজাপতির ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞান ও কর্মে শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত থাকিয়া দ্যুতিমান হইয়াছিল তখন তাহারাই দেবশব্দবাচ্য ছিল। ঐ ইন্দ্রিয়বর্গ ই আবার যখন স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা লব্ধ ও দৃষ্ট প্রয়োজন কর্ম ও জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারাই অসুর পদবাচ্য ছিল। "সুর" হইতে ভিন্ন যাহারা, কিংবা সমস্ত "অসু" বা জীবনে রমণ বা আনন্দ করে যাহারা, তাহারা অসুর। সুতরাং একই ইন্দ্রিয় উপাধিভেদে "সুর" বা "অসুর' হইতে পারে। ইহারা যজমানাবস্থ প্রজাপতি সন্তানস্থানীয়।" প্রবৃত্তির উদ্ভব বা অভিভাবই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যখন শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবল হয় তখন ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরাভূত হয়—ইহাই দেবগণের বিজয়। আবার যখন দৈবী প্রবৃত্তি আসুরী প্রবৃত্তির দ্বারা পরাভূত হয়, তখন উহাই অসুরদের জয়।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না দেবতাদের মতবাদের ভিত্তি কি এবং অসুরদের মতবাদের ভিত্তিই বা কি? দেবতাদের মতবাদের ভিত্তি স্পষ্ট করেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে শাস্ত্র আর অসুরদের মতবাদের ভিত্তি হিসেবে বলা হয়েছে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বর্গ নির্দিষ্ট দৃষ্ট জ্ঞান ও কর্ম। ইহজীবনের আনন্দই অসুর মতবাদের ভিত্তি আর শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থতাই দেবতাদের মতবাদের ভিত্তি। শুধু তাই নয় গম্ভীরানন্দ আর্য সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুর ও অসুরদের অবস্থানও সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে বলেছেন যে দেবতারা কনিষ্ঠ বলতে বোঝানো হয়েছে "দেবগণ অল্প সংখ্যক" আর অসুরেরা জ্যেষ্ঠ বলতে বোঝানো হয়েছে "অসুরগণ বহু সংখ্যক"। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য পাঠকমাত্রের অবশ্যই অনুমেয় যে দেবতার জনভিত্তি কম ছিল তুলনায় অসুরদের জনভিত্তি ছিল অনেক বেশী। আর তা যে বেশীই ছিল তা উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ থেকেই ধরা পড়ে। বিশেষ করে যখন দেবতারা বলছেন এবার উদ্গীথের দ্বারা ও অসুরদিগকে অতিক্রম করব। এ কথার অর্থ এ পর্যন্ত সংস্কৃতির

জগৎ অসুরদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবার সেই সংস্কৃতির জগতে ও আমরা আধিপত্য বিস্তার করব। এই ঘোষণার যে বাস্তব ভিত্তি রয়েছে তা আমরা উপনিষদ পর্যায়েই পাই। এরপর দেখা যায় রাজসভা থেকেই বড় বড় দার্শনিক বিতর্কসভার আয়োজন করতে। এমনকি এও দেখা যায় এই সব বিতর্ক সভায় রাজন্যপুষ্ট পণ্ডিতদের আস্ফালন করতে ও। এর পরিচয় আমরা জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ ও নারদ-সনৎ কুমার সংবাদের মাধ্যমেই পাই। আর এই সব থেকেই প্রমাণিত সমগ্র উপনিষদ সাহিত্যই বিপরীত মত সংঘর্ষের উপাখ্যান। অথচ এতদিন এই স্বীকৃত সত্যকে নানাভাবে আবৃত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সত্য কখনোই চাপা থাকে না, থাকতে পারে না। তা ক্রমশঃ দিবালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ই।

উপনিষদে এইভাবে যে বিপরীত তত্ত্ব ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেছে তার কোনরূপ চর্চা আমরা এতদিন দেখিনি বলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দর্শনের ছাত্র পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি অদ্বৈত আত্মতত্ত্বই উপনিষদ নিঃসৃত মতবাদ। কিন্তু আজ আর এ কথা সকলকে বিশ্বাস করানো কঠিন। কেন না চর্চায় মননে সঠিক তথ্য ক্রমশই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। এমনকি অতীতে ও যে এই সত্য ভারতীয় মনীষার কাছে উদ্ভাসিত ছিল তার প্রমাণ ও আমরা পাই পরবর্তী ভারতীয় দর্শনের চর্চা থেকে। এই উপনিষদকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় দর্শন স্পষ্টতই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাজরোষ তৎকালীন মনীষাকে ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য করে। তাই নানান শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বিপরীত মতবাদ ক্রমশই পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু শাসকশ্রেণীর উত্তরোত্তর চাপে তার স্বাভাবিক বিকাশ ক্রমশই রুদ্ধ হতে থাকে। তাছাড়া প্রতিপক্ষ রাজন্যপুষ্ট সংস্কৃতি পরিস্থিতিব সঙ্গে খাপ খাইয়ে সংখ্যালঘিষ্ট সংস্কৃতিকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর চাপিয়ে দিয়ে যুগ যুগ ধরে জন সংস্কৃতির মর্যাদালাভ-এ সমর্থ হয়েছে। তাই ভারতীয় দর্শন বলতেই জনগণ অধ্যাত্মবাদ অনুসারী ভাববাদী দর্শন বলেই বুঝে থাকেন। যদি ও অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ এক নয় কিন্তু জনসাধারণ এক অর্থেই বুঝে আসছেন। আর ভাববাদী সম্প্রদায় এই ধোঁয়াসা ভাব বজায় রেখেছেন সংগত কারণেই। কারণ অধ্যাত্মবাদের পথ ধরেই একদিন ভাববাদের উন্মেষ ঘটবে। মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে না তখন কোনটা কি? এইভাবে দেখি উপনিষদ পরবর্তী দর্শন মূলতঃ দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। আমরা এখন তাই নিয়েই আলোচনা করব।

উপনিষদ যুগে এসেই শ্রেণী দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ ধারণ করে। সমাজকাঠামোর রাজন্যপ্রভাব সংস্কৃতি জগতেও এসে পড়ে। আর ঠিক এই সময়ই রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতাযুক্ত বেদান্ত দর্শনের আবির্ভাব। বেদান্ত কথার অর্থ বেদের অন্তভাগ যার অর্থ বৈদিক বিচার বিশ্লেষণের উপসংহার হলো বেদান্ত। মহর্ষি বাদরায়ণই প্রথম ছড়ানো ছিটোনো উপনিষদগুলিকে একত্র করে একটি যুক্তি সংবদ্ধ দর্শন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। 'বেদান্তসূত্রই' তার অন্যতম প্রয়াস। এই বেদান্ত সূত্রে বাদরায়ণ পূর্বপক্ষ হিসেবে লোকায়ত, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদকে বেছে নিয়ে উত্তরপক্ষ হিসেবে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেন। কেনই বা বাদরায়ণ এইভাবে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ নির্বাচন করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই বিপরীতের দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। আর এ কথাই প্রমাণ করে উপনিষদের মত সংঘর্ষ পরবর্তী দর্শন সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। গৌড়পাদের কারিকায় দেখি এই মত সংঘর্ষ এক নতুন মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর এসে সেই অনুচ্চার্য মতবাদকে একটি সংবদ্ধ দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেন। শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নামই অদ্বৈত বেদান্ত।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই অদ্বৈত বেদান্তই চূড়ান্তভাববাদ বলে চিহ্নিত হলেও পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সহযোগী সম্প্রদায়ের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যাকেও সমানভাবে খণ্ডন করতে হয়েছে। যেমনটি আমরা শঙ্করদের শিবিরে দেখি তেমনটিই দেখি পূর্বপক্ষ শিবিরেও। তাই আমরা একই সঙ্গে লোকায়ত, সাংখ্য, ন্যায়বৈশেষিক, বৌদ্ধ-জৈন ও মীমাংসকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে দেখলেও সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ভাববাদ বিরোধিতা ও ভূতবাদের বিকাশ সম্ভব করে তোলা। যার ফলে আমরা দেখি বাদরায়ণ যেখানে অত্যন্ত সংরক্ষিত ব্যাখ্যায় সূত্রাকারে পূর্বপক্ষদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন শঙ্কর সেখানে দীর্ঘ সময় ও ক্ষুরধার যুক্তি প্রয়োগ করে পূর্বপক্ষ খণ্ডনে ব্যাপৃত থেকেছেন। এখন প্রশ্ন কেন এই বিরোধিতা? কেন এই পূর্বপক্ষ খণ্ডন? সে কি এইজন্য নয় যে জনমানসকে কোন না কোনভাবে পূর্বপক্ষীয় আচ্ছন্ন চিন্তা থেকে মুক্ত করা? বাদরায়ণ থেকে শঙ্কর সকলেই স্বীকার করেছেন তাঁরা উপনিষদের থেকে নিঃসৃত ভাবধারাই অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করছেন। আর একথাই প্রমাণ করে সমগ্র ভারতীয় দর্শন এই উপনিষদ উক্ত দ্বৈত মত সংঘর্ষের চূড়ান্ত পরিণতি। কারণ কি বাদরায়ণ কি গৌড়পাদ, কি শঙ্কর সকলেই পূর্বপক্ষ হিসেবে যে মত উপস্থাপিত করেছেন তাই প্রমাণ করছে মত সংঘর্ষের নজির। পূর্বপক্ষ আর উত্তরপক্ষ বিতর্ক এই মত সংঘর্ষেরই চরম পরিণতি।

একথা সুবিদিত যে বেদান্ত দর্শন বেদ-উপনিষদ অনুসারী। এখন প্রশ্ন পূর্বপক্ষীয় দার্শনিক মতগুলি কি স্বয়ম্ভু স্বয়ং সম্পূর্ণ এক একটি মতবাদ? একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নিজস্ব দর্শন চিন্তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে প্রকাশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল ঐক্য বর্তমান। আর তা যদি না হতো তাহলে একই আঙ্গিকে শঙ্কর বা বাদরায়ণ কেন সব কটি দর্শন সম্প্রদায়কে আলোচনা করতে গেলেন? এমন কি আমরাও যদি বিচার বিশ্লেষণ করি তো দেখতে পাব যে লোকায়ত থেকে শুরু করে সব কটি দার্শনিক সম্প্রদায়ই যে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা হলো বস্তুবাদ। একথা বলাই বাহুল্য যে প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করেছে যেমন লোকায়ত ও বৌদ্ধ বস্তুবাদ, সাংখ্য প্রধানবাদ ও ন্যায়-বৈশিষিক জৈন পরমাণুবাদ ইত্যাদি। কিন্তু কেন এই আপাতভিন্নতা তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু যে আঙ্গিকেই হোক না কেন তা উপনিষদ উক্ত ভূতবাদকেই কোন না কোন ভাবে পুষ্ট করে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে উপনিষদের মূল দুটি ধারা দু'ভাবে পরিবর্ধিত হতে হতে পরস্পর বিরোধী দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদ ও ভাববাদে চরম পরিণতি লাভ করেছে। উপনিষদীয় ভূতবাদই বিকশিত হয়েছে বস্তুবাদে, আর উপনিষদীয় আত্মবাদই বিকশিত হয়েছে ভাববাদে। অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় অধ্যাত্মবাদের পথ পরিক্রমায় শেষ পর্যন্ত ভাববাদে খুঁজে পেল চূড়ান্ত আশ্রয় আর উপনিষদীয় ভূতবাদ লোকায়ত সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ-জৈন, মীমাংসা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে খুঁজে পেল আপাত আশ্রয়। আর এইভাবে ছিল বলেই আজকের গবেষণায় ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের অবস্থান নির্ণয়ে দিগন্ত খুলে যাচ্ছে।

কিন্তু স্বতই আশ্চর্যের যা তা হলো ভারতীয় দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসে কেন যে কোন চিন্তানায়ক উপনিষদে বস্তুবাদ নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য চর্চা করেন নি তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট ভারতীয় দর্শনে ও বস্তুবাদ উপনিষদীয় উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে লোকায়ত পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় আঁকা বাঁকা পথে ঠিকই তার আসন চিহ্নিত করে নিয়েছে। অবশ্য তার জন্য অনেক রক্ত-অশ্রু-ঘাম ঝরেছে। কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদতে পুঁথিপত্রের বহ্নুৎসব হয়েছে। তবু বস্তুবাদ জলে সাঁতার

কাটা মাছের মত লোকসাধারণের মধ্যে সঞ্জীবনী সংগ্রহ করে লোকায়ত পথেই পরবর্তী দর্শন সম্প্রদায় তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে।

অবশ্য ভাববাদ রাজন্য পুষ্ট হয়ে অদ্বৈত বেদান্তের পথে যেভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে ঠিক তেমন কোন সুযোগ পূর্বপক্ষীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি পায় নি। ভাববাদ উপনিষদের থেকে উৎসারিত হয়ে মহাযান বৌদ্ধের পথ ধরে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে চূড়ান্ত পরিণতি খুঁজে পায়। বিপরীতে বস্তুবাদ ভূতবাদ হিসেবে উপনিষদ থেকে উৎসারিত হয়ে চার্বাক, বৌদ্ধ জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মাধ্যমে রুদ্ধ বিকাশের পথ ধরে ভাববাদের বেদীমূলে চরম আঘাত হানলেও বিকাশকামী মতবাদ হিসেবেই কোনরকমে চিহ্নিত হয়েছে। আজও পর্যন্ত বস্তুবাদ হিসেবে চরম পরিণতি লাভে সমর্থ হয় নি। অবশ্য এর জন্য আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই দায়ী। অতীতে যেটুকু স্বাধীনতাও রক্ষিত হতো পরবর্তীকালে শাসকের রক্তচক্ষু এড়িয়ে কেউই সাহস সঞ্চয় করে বস্তুবাদ চর্চায় নিষ্ঠাবান হন নি। বরং পরবর্তী মনীষাকে দেখা গেছে যেটুকু বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছে সেখানেও ঘোলা জলের আবর্ত সৃষ্টি করতে। যার ফলে স্বীকৃত সত্য হলো যেভাবে সংঘাতে সংঘর্ষে বস্তুবাদ টিকে থেকেছে তা নিয়েও কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আজো সঠিকভাবে হয় নি। আর বিরল ব্যতিক্রম কেউ সচেষ্ট থাকলেও তা নিয়ে কোন প্রচার নেই। ফলে সাধারণ মানুষ আজো পর্যন্ত যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই বর্তমান। কিন্তু ভারতবর্ষে শাসন কাঠামোয় ব্যতিক্রমী স্রোত বইতে শুরু করেছে। তার ধাক্কা সংস্কৃতি জগতেও লেগেছে। আজকের আলোচ্য গ্রন্থ তারই নিদর্শন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে সমগ্র বেদ-উপনিষদই বিপরীত মত সংঘর্ষের উপাখ্যান। মত সংঘর্ষ আসলে সমাজকাঠামোয় শাসক-শাসিত সংঘর্ষেরই চূড়ান্ত পরিণতি। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দ্বন্দ্ব ক্রমে সংস্কৃতি জগতের দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ এতদিন এই স্বীকৃত সত্যকে নানান ছলে আবৃত করে রাখা হয়েছিল। আজ শাসিত শক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। ফলে শাসিত সংস্কৃতি দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তাই সত্য ক্রমশই দিবালোকের দীপ্তি লাভ করছে। আগামীদিনে বস্তুবাদ চর্চার জয়যাত্রা অতীতের মত ব্যাহত রাখা আর বোধ হয় সম্ভব হবে না। এই গ্রন্থ প্রচেষ্টাই তার স্বীকৃত পদধ্বনি।